রবীন্দ্র-সরণী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

যাদের পড়াতে গিয়ে এই বইয়ের পরিকল্পনা মনে এসেছিল, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেইসব ছাত্রছাত্রীদের আজ এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করলাম।

নিবেদন

রবীন্দ্র-সরণী মানে রবীন্দ্র-পথ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব যে পথ অনুসরণ ক'রে, অনেকাংশে রচনা ক'রে চলে গিয়েছে—সেই পথের একটা খসড়া মানচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি বইখানায়। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা ও কর্মকে একটি তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করবার চেষ্টা করেছি। সে সূত্রটি তিনি নিজেই যুগিয়ে গিয়েছেন—"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" সীমার মধ্যেই অসীমের সঙ্গে মিলন সাধন তাঁর কাব্যে ও জীবনে হয়েছে কিনা এ তর্ক স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ সেটাই এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়। কাজেই ভূমিকায় তার আলোচনা অনাবশ্যক।

'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা আমার অন্যান্য বইতে বিস্তারিত করা হয়েছে। সেই জন্যই এই বইতে ঐ পর্যন্ত কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে—বলাকা পরবর্তী রচনাই বিস্তারিত আলোচনা করা এই গ্রন্থ রচনার লক্ষ্য।

গ্রন্থের চিন্তাসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে একটি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অলমিতি।

প্র.

রবীন্দ্র-সরণী

"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ

যুক্তবেণী

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সরাসরি দাবি করিয়াছেন যে, 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।' পরবর্তীকালে নিজের কাব্যতত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়া এই মন্তব্যকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। আবার, জীবনস্মৃতি রচনার পূর্বে যখন তিনি কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তখনও ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। সব জায়গায় ভাষা যে এক তাহা নয়, কিন্তু ভাবটা ভিন্ন নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ-বিবৃত সূত্রটিকে তাঁহার কাব্যতত্ত্বের মূলসূত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্তত আমি তাহাই ধরিয়া লইয়াছি। বর্তমান গ্রন্থ এই সূত্রটিরই আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার কাব্যরচনার একটিমাত্র পালা সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এখানে কাব্যকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে এই উক্তির অর্থ সর্বব্যাপক হইয়া উঠিবে, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি সাধারণ সূত্র পাওয়া যাইবে। আগে সাধারণভাবে বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সূত্রটির আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এবারে বিশেষভাবে বলা যাইতে পারে যে, শুধু আলোচনা নয়, রবীন্দ্রনাথের দাবিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা এই গ্রন্থের বিশেষ উদ্দেশ্য। কেননা, 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা' বলিতে মিলনসাধনের চেষ্টা বুঝাইতে পারে। পূর্বোক্ত পরীক্ষা শব্দটির সার্থকতা এখানে।

রবীন্দ্রসাহিত্য এই মিলনের চেষ্টামাত্র, না তাহাতে মিলনের চরিতার্থতাও ঘটিয়াছে বিচার করিত হইবে।

তাহা ছাড়া কাব্য-আলোচনায় সিদ্ধান্তের তেমন মূল্য নয় যেমন মূল্য ঐ আলোচনা-অংশের। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গেও ইহার সার্থকতা আছে। কাব্যশাখার শেষপ্রান্তে যে অমৃতফল তাহাকে অবহেলা না করিয়াও বলা যায় যে, কাণ্ডশাখা-পুষ্পপল্লবে বিচিত্র সমগ্র তরুটিও কম সুন্দর কম মনোগ্রাহী নয়। আবার, রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত মূল সূত্রটিতে উত্থাপিত দাবির পরিণামগত মূল্য অবহেলা না করিয়াও বলা চলে যে, সীমা ও অসীমের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটিতে বিরাজমান দুটি সত্তার মধ্যে কবিচিত্তের অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিক পরিক্রমণ যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি কৌতূহলজনক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সীমা ও অসীম শেষ পর্যন্ত যদি সমন্বিত না হইয়াই থাকে, তবে তাহাতেই বা এমন কী ক্ষতি! ঐ সমন্বয়ের পথে চলিতে গিয়া জীবনের যে অসীম ঐশ্বর্য, অসীম সৌন্দর্য ও অসীম বিস্ময় ও আনন্দ কবি কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মূল্য তো সামান্য নয়। সাধকের পক্ষে সমন্বয়ের যে মূল্যই হোক রসিকের পক্ষে মূল্যবান ঐ সৌন্দর্য, আনন্দ, বিস্ময় ও ঐশ্বর্য। সমালোচককে সাধক না হইলেও চলে, রসিক হইতেই হইবে। কবির ক্ষেত্রেও অন্যথা নয়। কবির পক্ষে সিদ্ধপুরুষ হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। সিদ্ধপুরুষ জীবনরথের অক্ষদণ্ড, সমস্ত আবর্তনের মধ্যে তিনি স্থির, সমস্ত চঞ্চলতার মধ্যে তিনি অচল, চিরভূয়মান অনিত্যের মধ্যে তিনি ধ্রুব। আর কবি হইতেছেন জীবনরথের নিত্য ঘূর্ণমান চক্রনেমি, আবর্তন-চঞ্চলতা ও ভূয়মানতার মধ্যে তিনি রত্ন কুড়াইতেছেন। সীমা ও অসীমের অসম কোটিতে

মেলবন্ধন ঘটাইতে চেষ্টা করিবার ফলে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য। তদুপরি যদি সীমা ও অসীম সমন্বিত হইয়াই থাকে, তবে তাহা অতিরিক্ত ফল। তাহার লোভ না রাখাই ভালো।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা বিশ্ববোধ। এখন, এই বিশ্ববোধ আর রবীন্দ্রনাথ-কথিত সীমা ও অসীম অর্থাৎ সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধন ভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সর্বব্যাপক। তাহা একই সঙ্গে সীমা-অসীমে সমন্বিত, ভূমা ও ভূমিতে গঠিত। মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম তাহার তিন চরম উপাদান। চতুর্থ আর কীই বা হওয়া সম্ভব। এইজন্যই তাহাকে সর্বব্যাপক বলিয়াছি। মায়াবাদী শুধু ব্রহ্ম বলিবেন, দ্বৈতবাদী শুধু জগৎ ও ব্রহ্ম বলিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এভাবে ভাগ করা চলিবে না, স্পষ্টত বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম বলিতে হইবে। কেন এমন ভাবে বলা আবশ্যক তাহা এখন বুঝাইতে পারিব না বা চেষ্টা করিব না, কেননা তাহাই বর্তমান আলোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্ববোধের মূলে যে বিশ্ব, তাহার মূল উপাদান তিনটি—মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম। তিনি যখন সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা বর্ণনা করেন তখন এই তিনের লীলা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তিনি বলিতে চান যে, স্বভাবত যিনি অসীম তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যে আনন্দরূপে ধরা দিতেছেন; স্বভাবত যিনি নির্গুণ তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন; আর স্বভাবত যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে প্রেমরূপে ধরা দিতেছেন। কেন তাঁহার এমন খেয়াল হইল কেহ বলিতে পারে না—ইহাই তাঁহার লীলা। সীমা ও অসীমের এই বিচিত্র লীলার আসর রবীন্দ্রসাহিত্য।

তাহারই স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্বে যে-তিনটি মূল উপাদানে রবীন্দ্রবিশ্ব গঠিত তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার অর্থ এই নয় যে, মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিব। নূতন বলিবার আছেই বা কী। তবে মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেভাবে স্ফুটতর হইয়া উঠিল তাহার পরিচয়দান অত্যাবশ্যক। সে আলোচনায় নামিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি একটির পর একটি তার চড়াইয়াছেন তাঁহার বীণায়; প্রথমে প্রকৃতির তারটি, তার পরে মানুষের তারটি, অবশেষে ব্রহ্মের তারটি চড়ানো হইয়াছে। আর ক্রমে বীণার সুর অধিকতর তারের ধ্বনিতে মধুরতর গম্ভীরতর হইয়াছে। সেই মধুরগম্ভীর সুর বিশ্লেষণ করিবার আগে তার-চড়ানোর ইতিহাস জানা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে কবির জীবনে মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মবোধের সূচনা, বিকাশ ও পরিবেশ বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে তথা সাহিত্যে তিনটি ভূখণ্ডের অপরিসীম প্রভাব। এই প্রভাবের সূত্র অবলম্বন করিয়াই কবিকে বুঝিতে হইবে, কাজেই তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ ভূখণ্ডে, বিশেষ কালখণ্ডে। তার পর সাধনার বেগে বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষে পৌঁছায়, জন্মগত ভূখণ্ড ও কালখণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে পৌঁছায়। যাহাদের সাধনবেগের সুকৃতি আছে তাহারাই এইরূপ ভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মূলে এই বিশেষ ভূখণ্ড ও কালখণ্ডের বোধ। এই ভূখণ্ড ও কালখণ্ডের বিশেষ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে একরকমভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে—তাহাদের প্রকৃতি অন্যরকম হইলে কবির জীবন ও কাব্যও ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিত নিঃসন্দেহ। তাই কবিকে বুঝিবার প্রস্তুতিস্বরূপ আগে এ-দুটিকে বুঝিতে হইবে। তার

পর ইহাদের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ—সর্বশেষে এ-দুটির সহিত কবির কাব্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধ। এখানে ভূখণ্ড তিনটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। কালখণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে হইতে থাকিবে।[১]

কলিকাতা

(রবীন্দ্রনাথের জন্ম সেকালের কলিকাতা শহরে। সেকালের কলিকাতা অবশ্য একালের কলিকাতা নয়—তবু ঘনতম বসতির শহর, বাংলা দেশের তো বটেই, খুব সম্ভব ভারতেরও। এ হেন শহরের আবার ঘনতম বসতি অঞ্চলে তাঁহার জন্ম। শুধু তাহাই নয়, সেকালের মহর্ষিভবন পুত্রকন্যা জামাতা-দৌহিত্র আত্মীয়স্বজন দাসদাসীতে পরিপূর্ণ বিরাট প্রাসাদ। এমন পরিবারে জাতকের মানুষের সঙ্গেই প্রথম পরিচয়; কালক্রমে সেই পরিচয় পাকা হইয়া উঠিবে, তাহার কলম মানুষের পদচিহ্নের পথটাই অনুসরণ করিতে শিখিবে—ইহাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু ঠিক উল্টা ফল ফলিল। মানুষ ও ইমারত-অট্টালিকার নিষেধ ডিঙাইয়া দূরাপসারিত খণ্ডিত ছায়ামূর্তি প্রকৃতির অমোঘ হাতছানি বালকের মনে আসিয়া প্রবেশ করিল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে প্রাসাদের যাবতীয় সমারোহের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; তবু সে ব্যবস্থা বানচাল হইয়া গেল। রাজকীয় বাধানিষেধ ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল তাহার সম্মুখে। এ ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ কাণ্ডটি ঘটিল।

১ এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি তারিখের উল্লেখ করিতেছি, মনে রাখিলে এই আলোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে।—

জন্ম ১৮৬১

স্থায়ীভাবে শিলাইদহে বাস ১৮৯১

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ১৯০১

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ১৯২১

মৃত্যু ১৯৪১

বিশ্বপ্রকৃতির দূরবিসর্পী হস্ত জনতার সন্নিবেশের মধ্যে ঢুকিয়া আপন মানুষটিকে বাছিয়া লইল। তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথের কবিমনের বিশেষ স্বরূপ যখন স্মরণ করি, 'এ নহে এ নহে'—যাহা কাছে আছে তাহাকে এড়াইয়া ডিঙাইয়া, যাহা দূর, যাহা অনুপস্থিত তাহাকে ধরিবার পাইবার আকাঙ্ক্ষা যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি যে, এমন না হইয়া উপায় ছিল না। বেড়া যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হোক তাহার সাধ্য হইল না বালককে আবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রকৃতির প্রতিশোধের অনেক আগে প্রকৃতির নির্বাচন।

এখানে মনে কৌতূহল জাগে, যদি এই বালকটি ওয়ার্ডস্বার্থের মতো প্রকৃতির অবাধ আসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিত তবে তাহার কাব্য কী রূপ পরিগ্রহ করিত। তখন কি অব্যবহিত পরিবেশকে লঙ্ঘন করিয়া, যাহা দূর, যাহা অনায়ত্ত তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হইয়া উঠিত না? রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে স্থান তাহা কি মানুষে অধিকার করিয়া বসিত? প্রকৃতি ও মানুষের স্থানবিনিময় কি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল? এখন, ইহা জল্পনামাত্র কিন্তু একেবারে বৃথা জল্পনা নয়, কেননা মানুষ ও প্রকৃতির আপেক্ষিক সম্বন্ধবিচার রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি কূটতর্কের স্থল। আলোচনার ধারায় অগ্রসর হইয়া এ তর্কের সম্মুখে আমাদের আসিতে হইবে; সম্ভব হইলে তাহার মীমাংসার চেষ্টাও করিতে হইবে, তাই কথাটা এখানে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রকৃতির নির্বাচন নামে দুটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, অধিক অগ্রসর হইবার আগে সাধ্যমতো তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এ আকর্ষণ দুর্জ্ঞেয় কেননা ইহার কারণ-নির্দেশ সম্ভব নয়, ইহাই তাঁহার কবিশক্তির মূলধন। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বয়স ও অভিজ্ঞতা

-বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূলধন স্ফীত হইয়া প্রচুর মুনাফা দেখাইয়াছে—তাহাই রবীন্দ্রসাহিত্য। আবার বয়স ও অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির সঙ্গে এই জন্মগত মূল আকর্ষণ ক্রমে নিবিড় পরিচয় ও অবশেষে গভীর জীবনতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। সে-সব বিবরণ ও বিবর্তনের ইতিহাস যথাসময়ে আসিবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট প্রকৃতি যে-শিশুটিকে চিহ্নিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছিল, মানুষের কোলে জন্মিয়া সে শিশু প্রকৃতিকে ভুলিয়া গেল না, মানুষের সতর্করচিত পাহারা এড়াইয়া দূরাবস্থিত প্রকৃতির মুখে আপন মাতৃমুখ দেখিয়া মুহূর্তে তাহাকে আপন বলিয়া চিনিয়া লইল।

> এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা-বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম।···প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা-গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন।···কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।[২]

ইহাকে প্রকৃতির নির্বাচন বলিব না তো কী! এতদিন যে প্রকৃতি দেয়াল-ইমারতের 'ফাঁক-ফুকর' দিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া বালককে মুগ্ধ করিত, এবারে প্রথম সুযোগেই অবাধমূর্তিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া 'অয়ম্ অহং ভোঃ' বলিয়া সাড়া দিল। বালকও তাহাকে চিনিল। কিন্তু যে অব্যবহিত মানুষের সংসারের মধ্যে তাহার

২ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

জন্ম, সেই মানুষের সংসারের কি হইল? দূর নিকট হইল বটে, কিন্তু পর তখনও ভাই হইল না, অনেক বাধা।

আবার কবির শরণাপন্ন হওয়া যাক।—

> বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে, পায়ের শিকল কাটিল না।[৩]

গোড়ায় খাঁচায় থাকায় বোধ করি ভালোই হইয়াছিল—শলাকার ফাঁকে ফাঁকে খাঁচার পাখি ও বনের পাখির প্রণয়রস জমিয়া উঠিয়াছিল। দাঁড়ে বসাতেও উপকার ঘটিয়াছিল, ঈষৎ স্বাধীনতায় বৃহৎ স্বাধীনতার বাসনা উগ্রতর হইয়াছিল। কিন্তু পায়ের শিকল কি অধিকবয়সেও কাটিয়াছিল? অন্তত মানুষের সংসারের দিকটায় যে কাটে নাই তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। পারিবারিক আভিজাত্য, সামাজিক ধর্মমত আর তাঁহার বিশেষ কবিপ্রকৃতি এই তিনে মিলিয়া ঐ সূক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ শৃঙ্খলটি রচনা করিয়াছিল। নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশকে কবির সহিত মানুষ ও প্রকৃতির আপেক্ষিক সম্বন্ধের রূপক হিসাবে গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।—

> একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের

৩ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময় আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।[৪]

এই ঘটনাটিকে কবিজীবনের একটি রূপক বলিয়াছি। মানুষের নিবিড়তম সান্নিধ্যে জন্মিয়াও তিনি মানুষকে জানিবার আগে অন্তরায়িত প্রকৃতিকে জানিয়াছেন। আবার যখনই তিনি মানুষের সংসারের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখনই কেহ-না-কেহ তাঁহাকে টানিয়া সরাইয়া দিয়াছে, কখনো সামাজিক বিশেষ ধর্মমতের অন্তরায়, কখনো পারিবারিক আভিজাত্য, কখনো বা মোজা ও ভদ্র আচ্ছাদনের অভাব। প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াও পূর্ণরূপে জানিলেন আর মানুষকে অবাধ সান্নিধ্যে দেখিয়াও আভাস-ইঙ্গিতের বেশি জানিতে পারিলেন না। জীবনস্মৃতির যুগে তিনি মানুষের সম্বন্ধে খাঁচার মধ্যে; ছিন্নপত্রের যুগে তিনি মানুষের সম্বন্ধে দাঁড়ের উপরে; শিকলটা অনেকখানি দীর্ঘ হইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে কাটে নাই। চলতি স্রোতের মুখে মানুষকে দেখা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, সেইজন্য তাঁহার মানুষের জগৎ গল্পগুচ্ছের ছোটগল্পের জগৎ। কিন্তু অদৃষ্ট নির্মম হইলেও নিষ্ঠুর নয়, এক হাতে ক্ষতি করিয়া অন্য হাতে পূরণ করে।—

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার

৪ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

> সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পালতোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।[৫]

মানুষের দিকের বাধা ঘুচিল না, কিন্তু গঙ্গার মাতৃহস্ত প্রকৃতির দিকের বাধা অপসারিত করিয়া দিল। ইহাই তাঁহার তখনকার যথার্থ মনের অবস্থা।

পূর্বোক্ত ঘটনার অনেককাল পরে জীবনস্মৃতি গ্রন্থ রচনার সময়ে কবি প্রকৃতির সহিত তাঁহার শৈশব ও বাল্যকালের যোগাযোগের সূক্ষ্ম ও শিক্ষাপ্রদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

> আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেলগাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য বলিয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পরে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে —মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল, সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল।[৬]

৫ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

৬ প্রভাতসংগীত, জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগভঙ্গজনিত। প্রভাতসংগীতে সেই যোগ পুনরায় স্থাপিত হওয়ায় আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। খুব সম্ভব উপরের বিবরণটি লিখিবার সময় কবি ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত কবি-কাহিনী কাব্যের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই কাব্যেই কাব্যের নায়ক কবির সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ, মানবহৃদয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন', এবং অবশেষে প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলনের বার্তা লিখিত হইয়াছে। সন্ধ্যাসংগীত ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে।[৭] এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কড়ি ও কোমল প্রকাশ পর্যন্ত জীবনস্মৃতির যুগ ধরিলে, কবি তাহাই ধরিয়াছেন, বিশ্বপ্রকৃতিই কবির একমাত্র নির্ভর। অবশ্য কবি-কাহিনীর নায়ক রবীন্দ্রনাথের বকলমে 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন' বলিয়াছে কিন্তু নায়িকা নলিনী তো তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। সন্ধ্যাসংগীতের বিচ্ছেদ, প্রভাতসংগীতের মিলন সমস্তেরই মূলীভূত কারণ বিশ্বপ্রকৃতি। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের উপান্তে প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যে রঘুর দুহিতাকে মানবসমাজের ক্ষীণ প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই, আর এই পর্বের অন্ত্য কাব্যে কড়ি ও কোমলে প্রথম স্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইতে শুনি—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই প্রথম মানুষের সুনিশ্চিত পদধ্বনি তাঁহার কাব্যে। কথাটি কবি জানিতেন তাই কবি এখানে জীবনস্মৃতি পর্বের সীমা টানিয়াছেন। জীবনস্মৃতি গ্রন্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বকবির পরিচয়

৭ এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশকাল প্রদত্ত হইল— কবিকাহিনী ১৮৭৮; সন্ধ্যাসংগীত ১৮৮২; প্রভাতসংগীত ১৮৮৩; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪; কড়ি ও কোমল ১৮৮৬।

ও পরিণয়ের কাব্য। ইহার পরেই সূচনা মানবসমাজের। অতঃপর খাসমহল বিবরণের পটোত্তোলন হইবে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে, সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের ইতিহাস; জীবনস্মৃতিতে যেমন দেখিতেছি মানবিক পরিবেশে প্রকৃতির লীলা। কিন্তু না, কথায় কথায় ঘটনাস্রোতকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অনেক আগাইয়া আসিয়াছি, এবারে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।

> এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না।...অতএব খাসমহলের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।[৮]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের নিঃসঙ্গতা, শ্যাম চাকরের গণ্ডি, ভৃত্যরাজকতন্ত্রের উপরে অনেকে অকারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুত এসব ব্যাপারের তেমন অসামান্যতা কিছুই ছিল না। সেকালে ধনী অভিজাত পরিবারের সাধারণ ছাঁচটাই ঐরকম ছিল। বয়স্ক ও বালকের মধ্যে তখন ব্যবধান খুব বেশি ছিল, আর পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের সঙ্গে এখনকার মতো মাখামাখি ছিল না। সেকালের প্রচলিত ছাঁচের মধ্যেই ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই বালকটি কল্পনাপ্রবণ ও স্পর্শগ্রাহী ছিল তাহার মন সমস্ত পরিবেশটিকে নিজ অন্তর্নিহিত কবিপ্রকৃতির পোষণের কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছিল। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সেকালের সব বালককেই পড়িতে হইত, অধিকাংশেরই মনের উপর দিয়া ছড়াটা পিছলাইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কানে বিশ্বমেঘদূতের প্রথম ইশারার মতো কাজ করিল—ঐ সরল ঝংকার তাঁহার মনে যে অনুরণন তুলিল তাহা

৮ কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি

যেন ফুরাইতে চাহে না।—

> বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপশব্দগন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।[৯]

এই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বিশ্বপ্রকৃতির একটা ইশারা ছাড়া আর কিছু নয়—ছবির সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধ্বনির ইশারা।

> তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত, মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি।[১০]

ঐ মেটে রঙের মলাটখানা খুলিয়া ফেলার ইচ্ছা দূর বাহিরকে ধরিবার ইচ্ছারই নামান্তর মাত্র। সারাজীবন তিনি ঐ আকাঙ্ক্ষাটি বহন করিয়াছেন, 'নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।'

ইহারই কিছু পরে বয়স যখন দশের মতো হইবে তখন তিনি

---

৯ ঘর ও বাহির, জীবনস্মৃতি

১০ ঘর ও বাহির, জীবনস্মৃতি

প্রথম কলিকাতার বাহিরে গেলেন পেনেটির বাগানবাড়িতে, খাঁচার পাখি দাঁড়ের উপরে বসিল। কিন্তু অভাবনীয় সুযোগে দাঁড়ের শিকলটাও খুলিয়া গেল, সে পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা, পথে পড়িল সেকালের শান্তিনিকেতন।—

> গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এই আমার ইচ্ছা— সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।[১১]

হায় রে, ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসন হইতে মুক্তি পাইবামাত্র দেখা গেল বহুকালের আকাঙ্ক্ষিতস্পর্শ বিশ্বপ্রকৃতি 'যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।' আর সন্ধ্যার অন্ধকারে খণ্ডিত দৃশ্য দেখিলে চলিবে না, ভোরের আলোতে একেবারে অখণ্ড দর্শনের আনন্দলাভ করিতে হইবে। পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া আশাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল না। ছাড়া পাইবার পরেও দূর ও বাহির দূরে ও বাহিরেই রহিয়া গেল।

অবশেষে হিমালয়ে গিয়া পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটিল, খাঁচার শলা দাঁড়ের শিকল দুইই ঘুচিয়া গিয়াছে, তবু দূর ও বাহির এতটুকুও কাছে আসিল না।—

> যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন

---

১১ হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি

> কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে…[১২]

রেলগাড়িতে বসিয়া আয়ত্তপ্রায় প্রকৃতিকে 'মরীচিকার বন্যা' মনে হইয়াছিল আর এখানে করায়ত্ত প্রকৃতি মুহূর্তে অভ্যস্ত বেশ পরিবর্তন করিয়া মানবরূপ ধারণ করিল। ছিন্নপত্রের যুগেও মানব ও প্রকৃতির এই লীলাবিনিময় দেখিতে পাইব, পদ্মা সেখানে মানবী ও বিশ্বপ্রকৃতি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। 'এ কী কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী।' দূর ও নিকটের মালাবদল আর হইয়া ওঠে না।

হিমালয় হইতে ফিরিবার পরে বালকের অধিকারের সীমানা অনেকটা বাড়িয়া গেল, তবু সীমার শাসন ঘুচিতে চায় না।—

> এমনি করিয়া তো দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত।[১৩]

কবির চোখের গুণে কাছের মানুষ ছবি হইয়া উঠিতেছে আর দূরের মানুষ সত্য হইয়া জীবন্ত হইয়া কাছে চলিয়া আসিতেছে—সে দূরের মানুষ কখনো অক্ষরে লিখিত, কখনো রেখায় অঙ্কিত।

> এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর

১২ হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি

১৩ প্রত্যাবর্তন, জীবনস্মৃতি

> সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল।[১৪]

এই তো গেল অক্ষরে লেখা ছবির কাছের মানুষ হইয়া ওঠা, এবারে রেখায় আঁকা ছবির কাছের মানুষ হইয়া উঠিবার অভিজ্ঞতা দেখা যাইবে। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করিলেন, তিনি তখন চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই বাড়িতে রঙিন শাসির উপরে আঁকা দুইখানি ছবি ছিল।

এবারে রবীন্দ্রনাথ—

> একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা, সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে, কেহ বা নামিতেছে। শাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশের কোন্ দূর কালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করিয়া মেলিয়া দিত, এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগল দোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।[১৫]

যে-সব বস্তুকে বাস্তব বলি, যেমন ঐ অন্তঃপুরের দৃশ্যটা, বিশেষ কবিধর্মের প্রভাবে দূরে গিয়া ছবি হইয়া উঠিতেছে আর যা কল্পনার ধন, যেমন পৌলবর্জিনী বা এই ছবি দুখানি, মুহূর্তে কাছে আসিয়া পড়িয়া বাস্তববৎ সজীব হইতেছে। আর্ট বা শিল্পকলা এই কাণ্ডটি ঘটাইতেছে। বিষয়টি কবি তখনই বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না।

১৪ ঘরের পড়া, জীবনস্মৃতি

১৫ গঙ্গাতীর, জীবনস্মৃতি

এইরূপে যখন আলস্যে মাধুর্যে, করুণায় ও রচনায় জীবন কাটিতেছিল তখন এক অভাবনীয় ব্যাপারে ওলটপালট ঘটিয়া গেল কবির জীবনে। এতদিন যে বিশ্বপ্রকৃতি আড়াল-আবডাল হইতে ইশারায় ইঙ্গিতে কবিকে লুব্ধ মুগ্ধ করিতেছিল এবারে সে মুখের ঘোমটাখানা আমূল সরাইয়া কবির সম্মুখে আসিয়া আপনাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল—আর এমন কাণ্ড ঘটিল কিনা কলিকাতা শহরের জীর্ণ পরিবেশটার মধ্যেই। বিলাতে থাকিবার সময়ে 'পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায়' কাব্য-রচনার আদর্শ পরিবেশে কবিতা লেখার প্রেরণা না পাওয়ায় মনে আঘাত পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১৬] আবার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতার পরে হিমালয়ে গিয়া কবি ভাবিলেন এবারে না-জানি সেই অভিজ্ঞতাকে আরো কত সত্যতরভাবে দেখিতে পাইবেন।—

> কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।
>
> আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না।[১৭]

এ সেই বিলাতের সমুদ্রতীরবর্তী পাইনবনের ছায়ার অনুরূপ অভিজ্ঞতা। বিশ্বপ্রকৃতি অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে কবিকে দেখা

১৬ বিলাত, জীবনস্মৃতি

১৭ প্রভাতসংগীত, জীবনস্মৃতি

দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাই তিনি সৌন্দর্যখচিত সিংহাসন হইতে নামিয়া শহরের জীর্ণ পরিবেশের মধ্যে দেখা দিয়া কবিকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কবির বিধাতা যেন স্থির করিয়াছেন যে, পরিবেশের হেরফের ঘটাইয়া মানুষের পরিবেশে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির পরিবেশে মানুষকে দেখাইয়া কবিকে নূতন দীক্ষা ও নূতন দৃষ্টি দান করিবেন; বুঝিতে সাহায্য করিবেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির ব্যবধান অনপনেয় নয়।

> সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।[১৮]

অনেকে মনে করেন যে এই অভিজ্ঞতা হইতেই রবীন্দ্রনাথের মহাকবিজীবনের উন্মেষ। অন্তত ইহা যে তাঁহার কবিজীবনের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা তাহাতে সন্দেহ নাই—এই মধুকোষটিকেই কেন্দ্র করিয়া পর্বে পর্বে কাব্যে কাব্যে প্রতিভার নূতন নূতন দল বিকশিত হইয়া চলিয়াছে।[১৯] আর এই অভিজ্ঞতাতেই যে জীবনস্মৃতি-পর্বের

---

১৮ প্রভাতসংগীত, জীবনস্মৃতি

১৯ প্রায় অনুরূপ বয়সেই মহর্ষির জীবনে প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল। আবার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও বিশ্বভ্রমণ প্রসঙ্গে সাধনারত মহর্ষির শিমলা শৈলে নিম্নগামী নির্ঝর দর্শন ও লোকালয়ে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা স্মরণীয়।

সীমানা তাহাও একরূপ নিশ্চিত। এতদিন কবির জীবনে যে প্রকৃতির তারটি বাঁধিবার উদ্যোগ চলিতেছিল এই ঘটনায় তাহার সমাপ্তি। সেই তার বাঁধা হইলে যে সুর ধ্বনিত হইল তাহাও অভিজ্ঞতাটির মতোই অপ্রত্যাশিত। সে সুরের রহস্যটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন লালিত হইতেছিল তখন নির্ঝর ভাবিয়াছিল উহাতেই বুঝি তাহার জীবনের চরিতার্থতা, কিন্তু এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবামাত্র সে বুঝিল এখানে থাকিলে তাহাকে চলিবে না, মানুষের সংসারের দিকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। এ কথা কবিরই। তাঁহাকে আর আলস্যে মাধুর্যে করুণায় নির্জনবাস করিলে চলিবে না, এবারে তাঁহাকে বৃহৎ সংসারের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। কলিকাতার জনারণ্যের নির্জনতায় প্রকৃতি যখন তাঁহাকে লালিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন এমন অসম্ভব কথা কেমন করিয়া মনে হইবে। কিন্তু সেই লালনপর্বের শিক্ষানবিশি শেষ হইলে প্রকৃতি সশরীরে দেখা দিয়া তাঁহাকে সেই পথটার উপরে দাঁড় করাইয়া দিল যাহার পাশ দিয়া কবির রূপকে ভগ্নস্বপ্ন নির্ঝর মানবসংসারের দিকে ছুটিয়াছে। ভাবগ্রাহী কবি বুঝিলেন যে, কবিজীবনের লক্ষ্য চোখে আঙুল দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। জীবনস্মৃতি-যুগের অন্য দুইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রকৃতির প্রতিশোধ ও কড়ি ও কোমলের এখানেই প্রভেদ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কারোয়ার নামক স্থানে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য লিখিত হয়। ঐ নাটকের ভাবের সমর্থন ছিল কারোয়ারের সমুদ্রদৃশ্যে। 'অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।' কিন্তু ঐ ব্যাকুলতামাত্রই। অনন্ত কি কখনো সান্তর সঙ্গে মিলিত হইবে!

এই প্রসঙ্গে তিনি আবার লিখিতেছেন—

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের

কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও,
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে, সেই সূর্যোদয়, সেই ফুলফোটা, সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়।...[২০]

এবারে অসীমকে মানুষের মধ্যে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। বেশ বুঝিতে পারা যায় বিশ্বপ্রকৃতি মুগ্ধ কবিকে মানুষের দ্বারের কাছে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। তাই কড়ি ও কোমল প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার।...কড়ি ও কোমল মানুষের জীবন-নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।[২১]

কবির বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, "এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল।"

বিশ্বপ্রকৃতি কলিকাতার মতো অভাবিত স্থানে কবিকে দেখা দিলেন এবং আরো অভাবিত এই যে কবির বীণায় প্রকৃতির তারটি বাঁধা হইবামাত্র তাহাতে মানুষের গানটি ঝংকৃত করিয়া তুলিলেন।

---

২০ প্রকৃতির প্রতিশোধ, জীবনস্মৃতি

২১ বর্ষা ও শরৎ, জীবনস্মৃতি

আর যেন তাহারই ভূমিকা রচনার উদ্দেশ্যে বিচিত্রলীলাময় অদৃষ্ট কবিকে টানিয়া লইয়া গেল প্রকৃতির অবাধ আসরে যেখানে মানুষের সঙ্গে কবির শুভদৃষ্টি ঘটিবে।

শিলাইদহ

পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথকে পৈতৃক জমিদারি পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে শিলাইদহে[২২] যাইতে হইবে। তিনি তো অবাক। তিনি কবি, বিষয়কার্যের কী বোঝেন—এই তাঁর মনোগত ভাব, কিন্তু না যাইয়াও উপায় নাই, পিতার ইচ্ছা। তা ছাড়া মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে আর-কেহ এমন ছিলেন না যিনি এই ভার লইতে পারেন। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক, বিষয়কর্মে উদাসীন; মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জজিয়তি করেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সংসার সম্বন্ধে বিরাগী; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত; জামাতা সারদাপ্রসাদ একসময়ে বিষয়কর্ম দেখিতেন, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গতি নাই। অতএব স্বাভাবিক সংকোচ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকেই যাইতে হইল। এ ঘটনা ১৮৯১ সালের। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া অবধি তাঁহাকে একরূপ স্থায়ীভাবে শিলাইদহে থাকিতে হইল। উড়িষ্যায় তাঁহাদের যে সম্পত্তি ছিল তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইয়াছে—অনেক সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন—কিন্তু এই দশ বছর কাল শিলাইদহ তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না। শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরকে তিনটি বিন্দু কল্পনা করিয়া একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলে ইহাই হইল তাঁহার

২২ শোনা যায় যে, এখানে শেলি নামে নীলকর সাহেব কুঠি গড়িয়া ব্যবসা করিত। শেলির দহ ক্রমে শিলাইদহে রূপান্তরিত হইয়াছে।

তিনকোনা পৃথিবী। মনে মনে কবি ইহাকে হয়তো নির্বাসন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার স্বস্থানে আগমন। কবির অজানিতে অদৃষ্ট আর-এক নূতন লীলার আসর পত্তন করিল। এটি যে কত বড়ো আর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্য সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখানকার পদ্মা নদী কবির প্রধান মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া উঠিল। কলিকাতা বাসকালে গঙ্গা নদী (পেনেটির বাগান ও চন্দননগর স্মরণীয়) যে মুক্তির স্বাদ দিত, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যরাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইত, পদ্মা নদী তাহাই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে করিতে থাকিবে ইহাই হয়তো কবি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত উল্টা ফল ফলিল। অদৃষ্টের লীলার গতি বিচিত্র।

পদ্মা নদীতে নৌকা ভাসাইয়া কবি ভাবিলেন যে, তাঁহার নৌকা প্রকৃতির কূলে ভিড়িবে, যে-প্রকৃতির ক্ষণিক ও খণ্ডিত রূপ তিনি কলিকাতায় দেখিতে পাইতেন। কিন্তু লীলাময়ী পদ্মা কবির নৌকা যে কূলে ভিড়াইয়া দিল তাহা মানুষের সংসারের কূল, তাহার এক দিকে সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালির লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ, অন্য দিকে 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' খণ্ডক্ষুদ্র গল্পগুচ্ছের গল্পের জগৎ। এ জগৎ এতাবৎকাল কবির অপরিচিত ছিল। এখানে পদ্মার নায়কতায় তাঁহার মুখোমুখি পরিচয় ঘটিল মানুষের সংসারের সঙ্গে, গোষ্ঠীবদ্ধ অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের সঙ্গে।[২৩] তাঁহার

২৩ জীবনস্মৃতির যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কবির সান্নিধ্য ঘটিয়াছে, যেমন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতি। ইহাদের অনেকেই নামান্তরে ও কাব্যোচিত রূপান্তরে তাঁহার কাব্যে স্থান করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবসমাজকে জানিবার, তাহাদের সুখদুঃখকে কল্পনার ক্ষেত্রে আয়ত্ত করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই।

বীণায় দ্বিতীয় তারটি চড়ানো হইল, কবির রাগিণী ক্রমেই পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। এই বিচিত্র-ইতিহাসবাহী গ্রন্থ ছিন্নপত্র ও তাহার পূর্ণতর সংস্করণ ছিন্নপত্রাবলী। সে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের আগে কবিজীবনে পদ্মার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া লওয়া আবশ্যক।

দেশভেদে একই নদীর ভিন্ন নাম হইতে পারে। গঙ্গার পরবর্তী অংশের নাম ভাগীরথী, আবার শাখাভেদে তাহাকেই পদ্মা ও মেঘনা বলা যাইতে পারে; ব্রহ্মপুত্রের পরবর্তী অংশ যমুনা নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত কাব্যরাজ্যের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একটি প্রবাহ বহমান, স্থানভেদে নাম ভিন্ন। প্রথম দিকে এই প্রবাহ ক্ষীণকায়, ইহা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর; মধ্যে ইহা বিশালোরসী পদ্মা; শেষাংশে ইহাই বলাকার আকাশগঙ্গা বা 'চঞ্চলা'। তিন নামে একই প্রবাহ। এখানে তর্ক উঠিবে, প্রথম ও শেষটি রূপক বা মানসিক ব্যাপার মাত্র, অথচ পদ্মা ভৌগোলিক জলপ্রবাহ। এ তিনে এক হয় কী প্রকারে। পদ্মার অবশ্যই ভৌগোলিক সত্তা আছে কিন্তু কবির পদ্মা ঠিক ভৌগোলিক নদী নয়—কবিকল্পনা তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া তাহাকেও একটি রূপক বা মানসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। এইভাবে রূপান্তরিত হইয়া পদ্মা প্রথম ও শেষাংশের সহিত মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। আর তাহারই প্রবাহ বছরে বছরে পলি নিক্ষেপ করিয়া কবির জগৎকে বিস্তৃততর করিয়া তুলিয়াছে। তাহা কোথাও শস্যে শ্যামল হইয়াছে, কোথাও জনপদে সমৃদ্ধ হইয়াছে, আবার কোথাও বা নিষ্কলঙ্ক শূন্যতার উপরে সৌন্দর্যের মরীচিকা বহাইয়া দিয়াছে। ইহার মধ্যে কুটস্থান পদ্মার রূপান্তরের ইতিহাসটি। তাহাই প্রথমে বলিতে চেষ্টা করি, সহায় কবির সাক্ষ্য।

পদ্মার লৌকিক রূপের অপরূপ চিত্র ছিন্নপত্র গ্রন্থে ও তাহার পূর্ণতর সংস্করণ ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে যথেষ্ট আছে; সে-সব চোখে

আঙুল দিয়া পাঠককে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আর তা ছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলির সার্থকতাও নাই। পদ্মা যেখানে লৌকিক রূপের নির্মোক খসাইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিবার দিকে চলিয়াছে সেইগুলিতেই আমাদের প্রয়োজন।—

> যেদিকে ছিন্নমেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সেদিকে অপার পদ্মা—দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃ-প্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে—সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনো পোষ মানে নি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে।[২৪]

এ পদ্মা লৌকিক নয়, দিব্যবিভূতিভূষিতা একটি জ্যোতিঃপ্রতিমা। পদ্মা ইতিমধ্যেই বাস্তবজগৎ হইতে ভাবজগতে উন্নীত হইয়াছে। তবু এই রূপের মধ্যে বাস্তবজগতের রেশ রহিয়া গেল, পদ্মা দেবীপ্রতিমা হইলেও বিশুদ্ধ ভাবরূপিণী নয়, বলাকার 'চঞ্চলা'র সঙ্গে সমত্ব তাহার ঘটিল না। নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশ পড়িলে দেখা যাইবে যে, মানবরূপের শেষ স্পর্শটুকু পরিত্যাগ করিয়া পদ্মা বিশুদ্ধ ভাবময়ী হইয়া উঠিয়াছে।—

> পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে—একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে; ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই

২৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১১। এই প্রবন্ধে শ্রাবণ ১৩৬৭ সংস্করণ অনুসৃত।

চলছে—সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেইজন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্র-গামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।[২৫]

এ নদী লৌকিক শেষ স্পর্শটুকু পরিত্যাগ করিয়াছে—ইহা একটা 'প্রবল মানসশক্তির মতো।' ঐ 'মতো' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ইহার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা নিহিত তাহা হইতেছে যে মানসিক শক্তিও নদীটির সার্থক উপমা নয়—কেননা, মন দেহ ছাড়া সম্ভব নয়—অথচ অন্য কোনো উপমা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।[২৬]

এবারে দেখা যাইবে পদ্মা আইডিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে আর এই রূপান্তরের ফলেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর ও বলাকার চঞ্চলার মাঝখানকার অদৃশ্য ফাঁকটুকু পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন এই আইডিয়ারূপী প্রবাহ কবিকে কোন্ কূলে ভিড়াইল দেখা যাক—ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি।

২৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৮

২৬ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতার প্রথমে নাম ছিল 'নদী'। কিন্তু নদী বলিতে নির্দিষ্ট বস্তু তাহার গতি দুইই বোঝায়। বস্তু বাদ দিয়া বিশুদ্ধ গতিকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই পরে 'চঞ্চলা' নাম প্রদত্ত হয়। কিন্তু যেহেতু মানুষের ভাষা দেহাশ্রয়ী মানুষের সঙ্গে একত্র বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য দেহ বা রূপের স্পর্শ-বিমুক্ত শব্দ ও উপমা বিরল, হয়তো একেবারেই অসম্ভব। কবি নদীকে 'চঞ্চলা' করিয়াছেন তৎসত্ত্বেও নটী, অপ্সরী, বৈরাগিণী প্রভৃতি শব্দকে বাদ দিতে পারেন নাই। বিশুদ্ধ আইডিয়ার যথোচিত প্রকাশের বাহন খুব সম্ভব রাগরাগিণী, শব্দ বা রেখা নয়।

আইডিয়া লইয়া তত্ত্বরচনা চলে কিন্তু কাব্য রচিতে মানুষের আবশ্যক। পরিচয়ের গভীরতার সঙ্গে পদ্মা ধীরে ধীরে মানবমূর্তি ধারণ করিয়া কবির কল্পনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। কিংবা পদ্মাই যেন কবিকে মানুষের উপকূলে ভিড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজেই মানবমূর্তি ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।—

> বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস নে। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।[২৭]

পুনরায়

> পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলো এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না। আর, এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে—এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়াগেঁয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী—স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব

২৭ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৯৩

নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে—তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।[২৮]

খুব উঁচু পাড়—বরাবর দুইধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুইধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।[২৯]

কবির নৌকায় যিনি হাল ধরিয়া বসিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, রহস্যময়ী বর্তমানে মানব-রূপধারিণী পদ্মা, আর তাঁহারই চালনায় নৌকা ইতিমধ্যেই মানবসংসারের কূল ঘেঁষিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কোনো এক ঘাটে কোনো এক সময়ে ভিড়িয়া পড়িবে মনে হইতেছে। অবশ্য নৌকা এখনো কূলে ভেড়ে নাই, কিন্তু উপকূলে যে মানবসংসার তাহার ছায়া পড়িয়াছে জলে, ভাসমান কবি ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রতিবিম্বে মৎস্যচক্ষুর আভাস পাইতেছেন, তবে লক্ষ্যভেদের এখনো বিলম্ব আছে।

আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময়

২৮ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২২০

২৯ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৪

ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এইসমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি—এত অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।...[৩০]

কবির পৃথিবী মাটির পৃথিবী এবং মানুষের পৃথিবী, যে পৃথিবীর 'মুখে একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ', সে 'দেবতার মেয়ে' কিন্তু তাহার দেবতার ক্ষমতা নাই। এই অক্ষমতা অসহায়তা অসম্পূর্ণতাই তাহাকে কবির প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। মাতার সমস্ত ত্রুটি সন্তানে, মানুষও অক্ষম অসহায় অসম্পূর্ণ, দুঃখ বিরহ বিচ্ছেদ ও মৃত্যুতে তাহার জীবনকন্থা শতচ্ছিদ্র। প্রকৃতিকে ভালোবাসা সহজ, মানুষকে ভালোবাসাই কঠিন, অনেক বাধা ডিঙাইয়া তবে তাহার আঙিনায় প্রবেশ করিতে হয়। কবি একে একে বাধা ডিঙাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাধা আছে সত্য কিন্তু পূর্বগামিনী ছায়া মানুষের রঙে তাঁহার কল্পনা ইতিমধ্যেই রাঙাইয়া দিয়াছে। কবির জগৎ মানবায়িত হইয়া উঠিবার মুখে।

কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা

৩০ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৩

গেল—সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই—যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—...।[৩১]

'ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই—যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার।' —কয়েক বছর আগে এমন ভাবা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এখন মানুষের জগৎ যে প্রকৃতির জগতের পরিপূরকমাত্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, প্রকৃতির জগৎ মানুষের জগতের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিতেছে। মানুষের দুঃখের জলে প্রকৃতির সৌম্যসুন্দর প্রতিবিম্ব। তবে বুঝি কবির নৌকা মানুষের ঘাটে ভিড়িয়াছে।

লীলাময়ী পদ্মার প্রবাহ কবিকে মানুষের ঘাটে নামাইয়া দিল, 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সংসার কবির চোখে পড়িল, কবিকল্পনার ক্যামেরার চোখ এখানকার বিচিত্র জীবনের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি অমর ভাষায় ধরিয়া রাখিতে লাগিল; এতকাল যাহা ছিল পরোক্ষ এবারে সে-সব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়া কবির জীবনে পরিণত হইতে চলিল। ইতিপূর্বে একবারমাত্র সামান্য কয়েক মাসের জন্য অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল কবির জীবনে গাজীপুরে বাসকালে। মানসীর সেই কয়েকটি কবিতাই সবচেয়ে পরিণত, কবির সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু মানসীতে যাহা ছিল ভূমিকা এখানে তাহা ভূমিতে পরিণত হইল, যে ভূমির উপরে সোনার তরী চিত্রা চৈতালির, গল্পগুচ্ছের প্রথমদিককার গল্পগুলির ঐশ্বর্যময় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির চালয়িত্রী বিশ্বপ্রকৃতি জানিত মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের অভাবেই কবির কল্পনা স্ফূর্তি পাইতেছে

৩১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৫২

না, এবারে সেই অভাবপূরণের ব্যবস্থা হইল। যদি কোনো সত্তাকে যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বলিতে হয় তবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই বলা উচিত। কেননা, বিশ্বপ্রকৃতিই শৈশব হইতে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া চালনা করিতেছে। প্রথমে তাঁহাকে আপন রহস্যনিকেতন দেখাইয়াছে, এবারে দেখাইতে উদ্যত মানুষের সংসার যাহার রহস্য গভীরতর, আবার যথাসময়ে দেখিতে পাইব যে এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দিরদ্বারে লইয়া গিয়া কবির বীণায় শেষ তারটি বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছে। তার পরে আবার যখন একে একে তার খুলিবার সময় আসিয়াছে—সেই বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহার সহায়। জীবনের উপান্তে যখন আর-সব তার ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, তখনো বিশ্বপ্রকৃতির সেই প্রথম তারটির সুরসপ্তক থামে নাই, যে একতারা হাতে তিনি কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই একতারাখানিই হাতে করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

ইতিপূর্বে অখ্যাত অজ্ঞাত সামান্য মানুষ বাংলা সাহিত্যে অমরপদবী লাভ করে নাই, কোথাও যদি তাহারা প্রবেশ করিয়াও থাকে তবে মাথায় মোট বহিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এতদিন তাহাদের কুণ্ঠিত স্থান যেন ছিল সাহিত্যের পাদটীকায়। এবারে তাহারা প্রধান পাত্রপাত্রীর পদপ্রাপ্ত হইল।

> আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
> একদিন শুনাবে তা কবিত্বের সম।

সেই অনাগত একদিন রবীন্দ্রসাহিত্যে নিত্য হইয়া বিরাজ করিতেছে, আর ইহার মূলে আছে লীলাময়ী প্রকৃতির হস্তক্ষেপ।

এই সময়ে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত একখানি পত্র হইতে কবির মনোভাব অবগত হওয়া যাইবে।

> আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা ঈষৎ কেমন বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে

হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয় অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী, কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ তখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে, অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমাহীন'—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়; তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়।[৩২]

'কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার!' অথচ তার কতটুকুই বা জানিতে পারা যায়। সেই অতিবৃহৎ অজানিত অংশ স্মরণ করিলে 'মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়।' এই বিষাদের ভাবটি লক্ষণীয়, কেননা যখনই তিনি মানবসংসারের কথা লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রকৃতির কথা সম্বন্ধেও ইহা অপ্রযোজ্য নয়, জানার ক্ষুদ্র দ্বীপটি বেষ্টন করিয়া বৃহৎ অজানার তরঙ্গমালা আক্ষেপ করিয়া উঠিয়াছে। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' কবির জানায় আর পরিসংখ্যানের জানায় এইখানে প্রভেদ। পরিসংখ্যানকার যাহা জানে নিশ্চয় জানে, কবি যেটুকু জানে সেটুকু বৃহৎ অজানার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কবিকে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করিয়া দিতে থাকে। এই কারণেই ছোটগল্পই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। সমগ্র জানার ভিত্তির উপরে উপন্যাস গড়িয়া ওঠে, ছোটগল্প ইঙ্গিতমাত্র। উপন্যাসে পাঠক সমগ্রকে পায়, আর ছোটগল্পে পায় আভাসকে। ছোটগল্প ও লিরিক একই শাখার ফল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে লিরিক-অভিযোগ

৩২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫৬

উঠিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি একান্তভাবে সার্থক সৃষ্টি।

গ্রাম্য জীবনের ছবির টুকরোগুলি একে একে কবির কল্পনার প্লেটের উপরে ছায়া নিক্ষেপ করিতে থাকে। কখনো তিনি কুঠিবাড়ির ছোট ডাকঘরের প্রবাসী পোস্টমাস্টারকে দেখিতে পান, তাহাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া গল্প করেন, পোস্টমাস্টার গল্পের ভূমিকা রচিত হয়। কখনো দেখেন যে একদল ছেলে নদীর তীরে একটা মাস্তুল গড়াইয়া খেলা করিতেছে—ছুটি গল্পের উপাদান সংগ্রহ হয়। আবার কখনো বা শ্বশুরগৃহযাত্রী ছোট মেয়েটিকে দেখেন, কোনো এক সময় সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী হইয়া উঠিবে সে। নদীতীরে বেদে-দলের জীবনযাপন দেখিতে পান যখন, তখন জানেন না যে চৈতালির একটি কবিতার উপকরণ সংগৃহীত হইল। এইভাবে সংকোচে সাধ্বসে মানুষ পদার্পণ করে তাঁহার কল্পনালোকে। আবার অনেক সময়ে মানবগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের বিস্তারিত দৃশ্য দেখিয়া মানুষের আর-এক পরিচয় লাভ করেন।

> যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারি দিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্‌ণ ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপরে একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়—তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! সকল-রকম শক্তির

কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।[৩৩]

বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দুঃখে শুধু যদি করুণার সঞ্চার হইত তবে হয়তো কর্মের দ্বারা তাহার সমাধান করা অসম্ভব হইত না—কিন্তু ঐসঙ্গেই মানুষের বৃহৎ রূপটা মানবসমাজের প্রতি একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রমের ভাব জাগায় তাঁহার মনে। আকাশ সমুদ্র ধরাতল যেমন অসীম, নদীর প্রবাহ যেমন অবিচ্ছিন্ন, মানুষের স্রোতটাকে তেমনি অসীম ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, করুণার সঙ্গে মিশ্রিত হয় কল্পনা, কাব্যের নূতন উৎসের সন্ধান পান কবি।

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রীপুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজতে লাগল—বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্য দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।[৩৪]

পুনরায়—

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি; চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা

৩৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১২১

৩৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৮

যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রামনগরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো বাট্ আই গো অন ফর এভার—কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখাপ্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে—তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে। দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনোকালে এর আর শেষ নেই।[৩৫]

মানুষের স্রোত যে কেবল অন্তহীন তাহা নয়—এ স্রোত যেন মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত প্রবাহ। ইহার মধ্যে মানবের ভাগ অধিক কি প্রকৃতির ভাগ অধিক সে বিশ্লেষণ এখন থাক, আমাদের আলোচনার ক্রম তাহার সমাধান করিবে। কবি আরো বুঝিতে পারেন যে যখন তিনি কলিকাতায় থাকেন তখন মানুষকে বড় করিয়া দেখেন, পল্লীগ্রামে আসিলে প্রকৃতি বড় হইয়া ওঠে। কিন্তু একথা বলিয়াই অজ্ঞাতসারে তিনি আপনাকে সংশোধন করিয়া লন, বলেন—

এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি; চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।…পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে।

৩৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩৮

কবির চোখে মানুষ স্বতন্ত্র কিন্তু সেইজন্যই কি সে ছোট নয়? ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনেক পরিমাণে নিরর্থক নয়? পল্লীগ্রামে মানুষের অংশ পরিমাণে কম হইলেও অজর, অমর এবং অক্ষয় বলিয়াই কি বড় নয়? এখানে গুণের বিচারে মানুষ এমন একটা নিত্যপদবী লাভ করিয়াছে যাহা এতকাল কবির চোখে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাপ্য ছিল। মানুষে প্রকৃতিতে এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটিয়াছে বলিয়াই মনুষ্যসংসারের তুচ্ছতম শব্দগুলিও বিশ্বসংগীতের অন্তর্গত হইয়া বাজিয়া ওঠে।

> এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ ঠুক্ ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্ঝাপ্ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাখা একটা বড়ো সংগীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে, অতএব চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।[৩৬]

কিন্তু কেবল বৃহৎ সমাজের নীহারিকামূর্তি নয়—মাঝে মাঝে নীহারিকার উপরে স্বতন্ত্র তারকা দেখা দিতে থাকে, ঐ তারকায় ও নীহারিকায় মিলিয়া মানুষের বিচিত্র ও পূর্ণ পরিচয় কবি লাভ করেন। এখানে মানুষের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্র উদ্‌ধৃত করিতেছি।

> কাল আমাদের এখানে পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল—ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মৃধা—সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে

৩৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৯০

যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে—সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা—এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে। এর মধ্যে মানব-প্রকৃতির একেবারে অবিমিশ্র আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়—এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়।[৩৭]

আবার—

প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তা কর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে। অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষা-ভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।[৩৮]

৩৭ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২১৯

৩৮ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৫

পুনরায়—

এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। ছোটো-ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ-ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম —কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো। কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না—এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে। শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থির বিশ্বাসপূর্ণ একাগ্রনিষ্ঠা নেই।[৩৯]

পুনরায়—

আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে—কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।[৪০]

এই কয়েকটি পত্রখণ্ডে আর-একটি নূতন রসের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সংঘবদ্ধ মানুষ কবির মনে বিস্ময় জাগাইয়াছে যেমন বিস্ময় জাগায় নিসর্গ, কিন্তু এবারে দেখা গেল নিঃসম্বল হতভাগ্য প্রজার দল তাঁহার মনে জাগাইয়াছে একটি সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তির ভাব। এই ভক্তির জোয়ারে অভিজাত জমিদারের হৃদয়ে শূন্য শুক্তিগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কল্পনার ক্ষেত্রে উভয়ের দুস্তর ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে।

এখানে ঐ প্রসঙ্গে আর দুখানি পত্র উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ভক্তির জোয়ারের পরিবর্তে এখানে

৩৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮২

৪০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮১

দুঃখের বন্যা। কখনো ভক্তিতে, কখনো দুঃখে, কখনো বিস্ময়ে, কখনো সম্ভ্রমে বারে বারে কবিতে মানুষে ভেদ ঘুচিয়া যাইতেছে, মনে রাখিতে হইবে এ সমস্তই লীলাময়ী প্রকৃতির নেপথ্যবিধানের পরিণাম।

> আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে। আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে—জলে দাঁড করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণস্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাসিতে তার গলা খন্‌খন্ করছে। মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম।…ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাসিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে টেনে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা এমন নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল! ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা idealএর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচোট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়![৪১]

আরো একখানি—

> মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারি কষ্ট হল—কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে

৪১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৬

যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে। যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে, তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে—কেউ চাকরি করছে কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে—অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নীচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশীলা বয়ে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখ নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রীজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায় —নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।[৪২]

নীহারিকারূপেই হোক আর তারকারূপেই হোক মানুষ একেবারে হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছায় না। মানুষ কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, বিস্ময় ভক্তি করুণা ও সম্ভ্রম জাগায় কিন্তু হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শখানি আনিয়া দেয় না, অন্তত কবির হৃদয় উপবাসী থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় আর মানুষের প্রকৃতি এ দুয়েরই দায়িত্ব এই ব্যবধানের জন্য। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে তো বুকে চাপিয়া ধরা যায় না—তাহার জন্য চাই কয়েকটি সমধর্মী সমভাবী সহৃদয় সুহৃদ। কিন্তু কোথায় তেমন সুহৃদ্‌বর্গ এই পল্লীগ্রামে। আসেন বটে মাঝে মাঝে জগদীশচন্দ্র, জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি, তাঁহাদের রসগ্রাহিতা আলোবাতাসের মতো কাজ করে কবিপ্রকৃতির উপরে। এ সবই সত্য। কিন্তু যখন তিনি গ্যেটের জীবন পড়িতে

৪২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২২৪

বসেন তখন কর্মবহুল রাজসভায় গ্যেটে যে বন্ধুহৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শ পাইয়াছিলেন সেই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া যেন একপ্রকার সূক্ষ্ম ঈর্ষার মতো অনুভব করেন।

> গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক—নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।[৪৩]

শুধু ঈর্ষা নয়, গ্যেটের পরিবেশের সঙ্গে নিজ পরিবেশের বৈসাদৃশ্য তুলনা করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তিনি—'কোথায়…ভাইমার রাজসভার রাজকবি গ্যেটে'…আর 'কোথায় বোটের মধ্যে আমি।'

> এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্ণে গৃহভিত্তির যেদিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরছে—সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালছে, গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমি খড়খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র কর্ম-সংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে![৪৪]

ব্যক্তিমানুষের অনায়ত্ত তপ্ত হৃদয়ের স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন। নীহারিকারূপী মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন,

৪৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৪৩

৪৪ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৪৪

নক্ষত্ররূপী মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু এই-দুটিই মানুষের সাকুল্য রূপ নয়। আর-একটি রূপ আছে যাহার মূল্য পূর্বোক্তগুলির চেয়ে বেশি বই কম নয়। দীপশিখারূপী মানুষ। নীহারিকা ও নক্ষত্র দুই-ই দূরের, তৃতীয়টি ঘরের। ঐ শিখাটিই তাহার একান্ত আপন। বিলাসে ও ব্যসনে, সুখের স্বচ্ছ তিমিরে এবং দুঃখের দ্বিগুণিত অন্ধকারে ঐ অচঞ্চল শিখা মানুষের নিত্যসুহৃদ। দীপশিখারূপী এই মানুষটির জন্য রবীন্দ্রনাথের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত নাই। যখন সে দীপ জ্বলিয়া ওঠে তখন বাতায়নবর্তী নক্ষত্রের জন্য তাঁহার আকূতি, আবার যখন সে দীপ নিবিয়া যায় তখন সে কী আকুলতা। এখানে গ্যেটের সৌভাগ্যপ্রসঙ্গে সেই দীপশিখাকেই তিনি স্মরণ করিতেছেন।

মানুষ যতই কাছে আসিয়া পড়ুক-না কেন কবির হৃদয়ের উপরে প্রকৃতির এতটুকু অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরঞ্চ দুয়ে মিলিয়া কবির বীণায় উদারতর মধুরতর রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আগে বলিয়াছি যে শিলাইদহে বাসকালে নূতন একটি তার চড়ানো হইয়াছে কবির বীণায়, সেটা এই মানুষের তার। এখন দুই তারে বীণা বাজিতে শুরু করিয়াছে। সোনার তরী চিত্রা ও চৈতালি এবং তৎকালে লিখিত গল্পগুলি এই দুই তারে ধ্বনিত সংগীত।

> বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে।[৪৫]

'প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি' এবং 'রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত

৪৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৪৪

এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম' প্রভৃতির নিগূঢ় রসটি যে না পাইবে তাহার কাছে গল্পগুলি সার্থক না মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

আবার নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশটিতে কবির সঙ্গে নদীর যে মানবসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, প্রণয়ী-যুগলোচিত যে সংকোচ সাধ্বস অভিমানের লীলা চলিতেছে তাহা যে না বুঝিতে পারিবে তাহার পক্ষে এই-সময়কার কবিতাগুলির রসগ্রহণ সম্ভব নয়।

> কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে, কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব, আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে; কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে; যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল। তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস।[৪৬]

আবার, নীচের অংশে 'সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা'র যে বধূবেশিনী মূর্তি প্রকট তাহার তাৎপর্য বুঝিলে তবেই কবির নবার্জিত ব্যক্তিত্বের অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

> কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ![৪৭]

৪৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪২

৪৭ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৫৩

প্রকৃতির হস্তক্ষেপে কবি মানুষের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, শুধু তাই নয় প্রকৃতিও মানব-ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করিয়া কবির চোখে নূতন মাধুর্য ও নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবুও কবি ও মানুষের দুরপনেয় ক্ষীণ ব্যবধানটুকু কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। সেই উলুধ্বনি মাঝে মাঝে কবিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বৃহৎ পৃথিবীর বিপুল মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে, অভিজ্ঞতার বাহিরে তো বটেই। শুধু একটা নিরুদ্দিষ্ট আকুলতা কবির হৃদয়ে তোলপাড় করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে নূতন একটি তার তাঁহার বীণায় চড়ানো হইয়াছে?

শান্তিনিকেতন

এবারে কবিজীবনের পটোত্তোলন হইল সেকালের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। একালের শান্তিনিকেতন দেখিয়া ষাট বৎসর আগেকার সেকালের শান্তিনিকেতনের রূপ বুঝিতে পারা যাইবে না। একালের শান্তিনিকেতন বহুহর্ম্যরাজিসুশোভিত বৃহৎ জনপদ, সুরুলের শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ব্যবধান-স্বরূপ যে শূন্য প্রান্তর তাহা লোপ পাইয়াছে, আবার বোলপুর শহরের সীমানা বাড়িতে বাড়িতে শান্তিনিকেতনের সীমানাকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। তার উপরে আছে মনুষ্যরোপিত বহুবিধ উদ্ভিদ যাহার অধিকাংশই বনস্পতিরূপে জনপদটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ষাট বৎসর আগেকার ক্ষুদ্র পল্লী কল্পনায় আনিতে হইলে এসব ভুলিতে হইবে। গোটা দুই পাকা বাড়ি, খানকতক চালাঘর, এই তো মানুষের বাসস্থান। মানুষের সংখ্যাও কুড়ি-পঁচিশের বেশি হইবে না। আর আজকার বনস্পতিমালার সমস্তই ভবিতব্যের গর্ভে ছিল, কল্পনার মধ্যেও ছিল কিনা সন্দেহ। একটি শালগাছের শ্রেণী, ক্ষুদ্র একটি আম্রকুঞ্জ, কিছু তালগাছ—আর এই প্রান্তরের আদিমতম অধিবাসী দুটি ছাতিম বৃক্ষ, এই তো তৎকালীন উদ্ভিদ-সম্পদ। এবারে কবিজীবনের পূর্ববর্তী দুটি

স্থানের সঙ্গে ইহার প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। কলিকাতায় ছিল জনসমুদ্রে কোটালের জোয়ার, শিলাইদহে ছিল 'সবুজ পাথারে' বান ডাকা—এখানে তাহাদের ন্যূনতম রূপ। এখানে উপরে একখানি প্রকাণ্ড আকাশ আর নীচে একখানি প্রকাণ্ড প্রান্তর, সে প্রান্তরের পুবে পশ্চিমে দিগ্‌বলয়ের রেখাটুকু অবধি নাই, অকস্মাতের গর্ভ হইতে সূর্যের উদয়, আবার অকস্মাতের গর্ভে তাহার বিলয়। মাঝখানে মানুষের নীড়টি কতকটা যেন প্রক্ষিপ্ত। মানুষের বিচিত্র রূপ ছিল কলিকাতায়, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ছিল শিলাইদহে, এখানে মানুষ ও প্রকৃতি ন্যূনতম স্থান অধিকার করিয়া অসীম শূন্যতাকে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। মানুষের জগৎ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া কবি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রকৃতির জগৎ শিলাইদহে স্থানান্তরিত হইয়া তিনি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিলেন ; এবারে তিনি এমন এক স্থানে আসিলেন যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির লীলা অপ্রকট। এবারে আরম্ভ হইল নূতন পরিচয়ের ভূমিকা। এতদিন যে বিশ্বগ কল্পনা বাহিরের দিকে প্রসারিত ছিল, এবারে বাহিরের ঐশ্বর্যের অভাবে সেই বহির্মুখী কল্পনা ভিতরের দিকে নিবিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ও ভগবৎ-জিজ্ঞাসার যথার্থ সূত্রপাত এখানে।

মহর্ষি-পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ ধর্মচিন্তা ও ভগবৎ-জিজ্ঞাসার সহজ পরিবেশের মধ্যেই বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেকালের অনেক মনীষীর জীবনে এসব বিষয়ে যেমন একটা প্রতিকূলতা ছিল, এ ক্ষেত্রে তাহা ছিল না, অনুকূলতাই ছিল বলিতে হয়। কিন্তু এ এমন একটা বিষয় যাহা পিতার হাত হইতে বা গুরুর হাত হইতে সম্যক্ ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, সকলকেই নিজ চেষ্টায় এ রত্ন আবিষ্কার করিতে হয়, গুরু বা পিতা সাহায্য করিতে মাত্র পারেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও গুরুরূপী পিতার সাহায্য মিলিয়াছে। কিন্তু সাহায্য ও আবিষ্কার এক নয়। এতদিন দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি

ধিক্কার। ইহার মধ্যে 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পরের মুখের কথাই প্রধান সম্বল।[২] রবীন্দ্রনাথের মনে তখনো বিশ্বপ্রেমের সত্য জাগ্রত হয় নাই সত্য আর রচনায় সরলতা ও সংযমের অভাব সেজন্য হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু কবির অস্ফুট ছায়ামূর্তি ও কবির নায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিরূপ মন্তব্য সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয় না। যে সব কবির প্রতিভায় রোমান্টিক চরিত্রটা প্রবল তাহাদের কাব্যের মূল পুঁজি নিজেদের Poetic Personality বা কবিব্যক্তিত্ব। উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে রস বাহির করিয়া স্বকীয় জগৎজাল বয়ন করে—ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। এইজন্যই এই শ্রেণীর কবির কাব্যের নায়ক কবি স্বয়ং। ইহাদের প্রথম কবি-কর্তব্য নিজের কবিস্বরূপকে আবিষ্কার-চেষ্টা, দ্বিতীয় কবি-কর্তব্য সেই আবিষ্কৃত কবি-ব্যক্তিকে কাব্যে প্রতিষ্ঠাদান। ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রথম তথা অপরিণত কাব্যে বারে বারে 'অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তি'টা প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস বা পূর্বগামিনী ছায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। যে কবিধর্মের যে স্বভাব। ইহা অস্বাভাবিক নহে, এমন না হইলেই অস্বাভাবিক হইত।[৩]

> সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা

২ কবিকাহিনীর ৪র্থ সর্গে মানুষের দুঃখদুর্দশার বর্ণনা ও পৃথিবীতে অবতীর্ণ সত্যযুগের বর্ণনা। মূলধন, 'পরের মুখের কথা'।

বনফুলের ষষ্ঠ সর্গে যে সত্যযুগের বর্ণনা আছে তাহাও শেলির মুখের কথা।

৮ম সর্গের হিমালয়-বর্ণনার মহাজন বিহারীলাল। সমস্ত কাহিনীটির ছাঁচ আরও দুইজন মহাজনকে স্মরণ করাইয়া দেয়—বঙ্কিমচন্দ্র ও কালিদাস।

৩ এই প্রসঙ্গে প্রধান ইংরেজ রোমান্টিক চরিত্রের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স ও বায়রনের কবিপ্রতিভার স্ফুরণ ও ইতিহাস স্মরণীয়।

করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নয়, যাহা ইচ্ছা করা উচিত…হাঁ সেই জিনিসটি।

এই কবি লেখকের লৌকিক জীবন নয়—ইহা কবিব্যক্তিত্ব বা Poetic Personality। ইহা কতকটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে, অনেকটাই মেলে না। যে অংশে মেলে সেই অংশে 'লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে' তাহাই; আর যে অংশে মেলে না তাহা কবির সচেতন ইচ্ছার বহির্ভূত শক্তির সৃষ্টি। সচেতন ও অবচেতনের দুই হাতে মিলিয়া গঠিত যে কবিব্যক্তিত্ব তাহাই এই শ্রেণীর কবির প্রধান নায়ক ও মূল পুঁজি। কবিকাহিনীর লেখক এই শ্রেণীর কবি, কবিকাহিনীর কবি এই শ্রেণীর নায়ক। কবিকাহিনী রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সূচনা—ইহার বিপরীত ঘটিলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। রবীন্দ্রনাথের কিশোর কলম আপন অজ্ঞাতসারে কবিব্যক্তিত্বের প্রথম খসড়া অঙ্কিত করিতেছিল, মূল পুঁজির প্রকৃতি ও পরিমাণ জানিতে চেষ্টা করিতেছিল। কবিকাহিনী কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের প্রথম অস্পষ্ট কাহিনী। এই কারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভার ইতিহাসে ইহার অপরিহার্য গুরুত্ব।

কবিকাহিনীর ঘটনা-বিশ্লেষণ ও ভাবনা-বিশ্লেষণ

এবারে কবিকাহিনীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিলে কাব্যটির যোগাযোগ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

শুন কল্পনাবালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরতলে। ছেলেবেলা হতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া।

তার পরে—

যৌবনে যখনই কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

কবি ভাবিয়াছিল প্রকৃতির প্রণয়ে শান্তিলাভ করিবে।

হে জননী, আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত অতৃপ্তি তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবী, পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল যে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হইতেছে না, কিসের যেন অতৃপ্তি রহিয়া যাইতেছে। তখন সে বুঝিতে পারিল "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।" কিন্তু তেমন মনের মতো মানুষ কোথায়? তাহার সন্ধানে তো কবি অনেক ঘুরিয়াছে। কবি যখন অতৃপ্তির গানে কানন ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে তখন একটি বালিকা আসিয়া তাহার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিল—তাহার নাম নলিনী। কবি কিছুদিনের জন্য শান্তি পাইল। কিন্তু তার পরেই আবার সেই অতৃপ্তি, কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি তাহার মনে দেখা দিল।

কবির সমুদ্র-বুক পুরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
'এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।'

নলিনীতে অতৃপ্ত কবি প্রাণের শূন্যতা দূর করিবার জন্য বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। কাশ্মীরের বনে, রুশিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে তাহার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা। কবি নলিনীকে বলিতেছে—

এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুন,
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।

কবির বিরহে নলিনীর মৃত্যু হইল। এদিকে—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন ;
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝরধ্বনি, প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হল দশা,
যে প্রকৃতিশোভা মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মতো কবির নয়নে,
নাইকো দেবতা যেন মনের মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া,
সে না হলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হত বিষণ্ণ আঁধার।

কবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন কৃষ্ণবিরহিত পার্থের মতো নিজের সত্যকার শক্তি কোথায় সে বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কত বড় ভুল সে করিয়াছে।

তখন কবি নলিনীকে তুষারে সমাহিত করিয়া সে বন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—কোথায় গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

চতুর্থ বা শেষ সর্গে কোন ঘটনা নাই বলিলেই চলে। কবি মনের দুঃখে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে সে চিন্তা করিতে লাগিল নলিনীর সত্তা কি সত্যই চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে? তাহা হইলে কী সান্ত্বনায় কবি আর বাঁচিয়া থাকিবে? দুঃখের অভিজ্ঞতায় কবি যেন বুঝিতে পারিল, মরিলে সব ফুরায় না ; মৃত্যুর পরে নলিনীর দেহহীন অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, এবং

তাহাতে প্রকৃতি সমৃদ্ধতর প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে।

দেহকারাগারমুক্ত যে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।

প্রকৃতি এমন সুন্দর, মাতার মতো যার প্রাণে অগাধ স্নেহ, তাহার রাজ্যে কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? সান্ত্বনার অভাব থাকিতে পারে? নলিনীর লোপ সম্ভব হইতে পারে?

প্রকৃতি! মাতার মতো সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবী, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতিদেবী,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবী, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবী,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতিদেবী,
সংশয় কখনো আমি করি না স্বপনে।

নলিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি সম্ভব হয় তবে আর দুঃখ কিসের? অতএব—

বাজাও রাখাল তবে সরল বাঁশরী।
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান।

এইরূপে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল।

সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।

মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্।
নেত্রে তাঁর বিকিরিত কী স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।

মনুষ্য-জগতে যেমন এই বৃদ্ধ কবি, প্রকৃতির জগতে তেমনি হিমালয়; দুজনেই বয়ঃপ্রবীণ, শুভ্রশীর্ষ, বহুদর্শী, শান্ত এবং সমাহিত। কবি স্বভাবতই নিজেকে হিমালয়ের সগোত্র অনুভব করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিতেছে। এ খেদ ব্যক্তিগত নয়, কারণ ব্যক্তিগত শোকের সান্ত্বনা কবি প্রকারান্তরে লাভ করিয়াছে—এ খেদ মানুষের দুঃখ স্মরণ করিয়া।

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক শৃঙ্খল তার অলংকার রূপে
আলিঙ্গন করে তারে রেখেছে গলায়।
দাসত্বের পদধূলি অহংকার করে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা।
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু।

সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে।
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙ্গিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।

হিমালয় তো ইহাই চিরকাল দেখিতেছে, তাহার মত এমন বহু-অভিজ্ঞ সাক্ষী আর কোথায়? কিন্তু ইহাই কি চিরকাল চলিবে? জগতে কি সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব নয়? কবি সেই সত্যযুগের স্বপ্ন দেখিতেছে—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাহিবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার।
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস।
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত।

হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
তবে বল কবে গিরি, হবে সেইদিন
যেদিন স্বর্গ ই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।

সেদিন যদিও আজ দূরে তবু কবি যেন তাহা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস 'একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়'।

এ সান্ত্বনা তাহাকে কে দিল? নলিনীর মৃত্যুশোকে যে সান্ত্বনা দিয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেই প্রকৃতিই কবিকে আসন্ন সত্যযুগের আশ্বাস দিয়াছে।

আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতি দেবী,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত দেবী, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।

এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে সে কবির ব্যক্তিগত দুঃখ ও মানুষের সমষ্টিগত দুঃখ একই সান্ত্বনায় শান্তি লাভ করিল। নলিনীর মরণোত্তর অস্তিত্ব আর মানুষের সত্যযুগের সম্ভাবনা—এ দুয়েরই সান্ত্বনা প্রকৃতি দিয়াছে। একটা তো কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কাজেই অপরটা কি মিথ্যা হইতে পারে?

এইরূপে মানুষের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াও সত্যযুগে রআশায় বুক বাঁধিয়া কবি হিমালয়ের শিখরে আছে।

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাত্রী দেব।

কবি আপন মনে যখন একাকী বসিয়া থাকিত তখন দূর হইতে 'নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান' শুনিতে পাইত। এমনিভাবে—

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইতো গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইতো তান।[৪]

কাহিনীর এই খসড়া পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কল্পনার ইঙ্গিতে একটি মহৎ সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন"। কিন্তু কোথায় মানুষ? কবি এখনো মানুষকে চেনেন না, কাব্য লিখিবার কালে কবি কলিকাতার অধিবাসী। সেটা মানুষের জগৎ বটে, মানুষের জগতে থাকিয়াও যে মানুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই তাহা আগেই বলিয়াছি। মানুষের সহিত পরিচয় হইল না সত্য কিন্তু এটুকু বুঝিতে পারিলেন যে "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।" সেই মন না পাইলে আর সমস্তই কেমন লাবণ্যহীন। এইজন্যই প্রথম সর্গের প্রকৃতি দীর্ঘকাল কবিকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তার পরে অবশ্য নলিনীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার, পরিচয় ও প্রণয় ঘটিল। তবে নলিনী তাঁহাকে শান্তিদানে

৪ মল্লিখিত কোন পূর্বরচনার অংশবিশেষ

অসমর্থ হইল কেন? নলিনী মানুষ নয়। সে শেলির Alastor কাব্যের 'veiled maid'-এর নূতন সংস্করণ, সে "The 'being' whom he loves"—মানসসুন্দরী; সে কবিরই মনোরম প্রক্ষেপ মাত্র। "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"—এই যদি কবির আকাঙ্ক্ষা হয় তবে নলিনীতে কবির তৃপ্তি নাই, কেননা নলিনী কবিরই মন, কবিরই বহির্মূর্তি। সেইজন্য মানুষের সন্ধানে কবি বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হইলেন, সারা বিশ্বভ্রমণ করিলেন, কিন্তু শান্তি মিলিল না। পৃথিবী কি জনশূন্য? তবে মানুষের সন্ধান কবি পাইলেন না কেন? বাস্তব ক্ষেত্রের মানুষ তখনো তাঁহার অভিজ্ঞতার অতীত, সেইজন্যই কাব্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অবশেষে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে নলিনী মৃত। নলিনী, তাঁহার 'কল্পনার বঁধু' মরিয়াছে বটে কিন্তু কবিকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া যায় নাই, প্রেমের রঙে প্রকৃতির উপরে একটি ঘনতর ইন্দ্রজালের মায়া মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে। মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি মানবময় হইয়া না উঠিলেও প্রেমময় হইয়া ওঠায় কবিকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হইয়াছে। কবি সেই শেষ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, আশ্বাস পাইয়াছেন কোন একদিন মানুষের মন তাঁহার মিলিবে।

প্রকৃতির সহিত আভাসে পরিচিত মানুষের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত কবির কাব্য 'কবিকাহিনী'। আভাসে দেখা মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, কেননা মানুষের সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতি কাব্যের বস্তু হইয়া ওঠে না। সুন্দরবনের কাব্য হয় না। আর সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ যে মানব-সংসার, তাহার পরিচয় এখনো কবির জীবনেতিহাসের ভাবী অধ্যায়ের অন্তর্গত। মানুষের প্রকৃত সমস্যার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই বলিয়াই 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' করিতে হইয়াছে, মানুষের সহিত পরিচিত হইবার পরে আর তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমের Utopia সৃষ্টির বিড়ম্বনা সহ্য

করিতে হয় নাই। বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে অতৃপ্ত কবির বৃহৎ মানব-সংসারের দিকে প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপের কাব্য 'কবিকাহিনী'। এই ইঙ্গিতটি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইলে তাঁহার পরবর্তী কাব্যসমূহের গতি, প্রকৃতি ও তাৎপর্য সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

"জগৎ দেখিতে হইব বাহির"

কবিকাহিনীতে দেখিয়াছি নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম কবিকে দীর্ঘকাল তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই, তিনি নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ মানব-সমাজের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? কবি ভাবেন, এ কি হইল—নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম আর বৃহৎ মানব-সমাজের অস্পষ্ট প্রেম দুইই যে সমান অতৃপ্তিকর। এমন হওয়া কি অসম্ভব যে ব্যক্তিগত প্রেম ও সার্বজনীন প্রেমের সমন্বয়েই তৃপ্তি! ব্যক্তি-প্রেম বৃহত্ত্বের পটভূমিতে স্থাপিত হইলে তবেই হয়তো সত্য হইয়া ওঠে, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই হয়তো এমন নৈরাশ্যজনক হইল। কবি যে তখন এই কথাগুলি এমনভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কবিকাহিনীতে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যসমূহের সাক্ষ্যে এমন মনে করা অন্যায় নয়।

কবিকাহিনীতে তিনটি সত্যেকে পাই—নলিনী বা মানুষের ব্যক্তিরূপ, বৃহৎ মানবসমাজের রেখাক্ষরে অঙ্কিত অস্পষ্টরূপ, আর প্রকৃতি। এই তিনের মধ্যে এই বয়সে প্রকৃতির সঙ্গেই কবির কিছু পরিচয় ছিল—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত নলিনীর যখন মৃত্যু হইল, বৃহৎ মানবসমাজ যখন পরিচয়ের অস্পষ্টতায় তাঁহাকে হতাশ করিল—তখন প্রকৃতির কাছে শেষ সান্ত্বনা লাভের আশায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই। বিশ্বপ্রকৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হিমালয় কবিমনের নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই হিমালয়ও আর ঠিক আগের নলিনীর সহিত কবির পরিচয় লাভের আগের প্রকৃতি নয়। ইহা নলিনীর দেহাতীতরূপে সমৃদ্ধতর। কবি

জানেন যে মানুষের মন চায় মানুষেরই মন, যে মানুষের মনের প্রসঙ্গেই কেবল মানুষ নয় প্রকৃতিও পূর্ণাঙ্গ। আবার তিনি অবচেতনভাবে জানেন না যে প্রেমের ব্যক্তিরূপটাও প্রেমের সার্বজনীনরূপের প্রসঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় যে মানবসমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভটা কবিজীবনের মুখ্য ও অপরিহার্য উদ্দেশ্য। এবারে সেই পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা। 'প্রভাতসঙ্গীত' বিশ্বপরিচয়ের গঙ্গোত্রী।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ কাব্যে image বা চিত্রোপমার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁহারা বলেন চিত্রোপমার মধ্যে অজ্ঞাতসারে কবিমনের গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রকাব্যের চিত্রোপমা সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য সন্দেহ নাই। বোধ করি রবীন্দ্রকাব্যের সার্থকতম চিত্রোপমা নদীপ্রবাহ। বারে বারে ইহার দেখা পাওয়া যাইবে। নদীপ্রবাহ যেমন ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া ওঠে তেমনি এই উপমাটি ক্রমেই গুরুতর অর্থবাহী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের পদ্মানদী ইহারই বাস্তবমূর্তি। ইহারই আনুষ্ঠানিক ও প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ প্রভাতসঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে—যখন ভগ্নস্বপ্ন নির্ঝর 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির' বলিয়া গহ্বর ছাড়িয়া বৃহৎ বিশ্বের মুখে বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবসঙ্গীতের পথিক কবিতাতেও এই ভাবটি বিদ্যমান কিন্তু চিত্ররূপের অসম্পূর্ণতা হেতু তেমন করিয়া বাণীবাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পথ চালায়, কিন্তু নিজে চলে না। নদী চলে এবং চালায়—বাণীবাহী উপমা হিসাবে ইহাতেই তাহার পূর্ণতা। ভগ্নস্বপ্ন নির্ঝর—ইহা কবিসত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়—আপনার জীর্ণ ও ক্ষুদ্র গহ্বর ছাড়িয়া—ক্ষুদ্র বলিয়াই জীর্ণ—বৃহৎ জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,

দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।[১]

সেখানে কবি-নির্ঝরের কি কাজ?

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা;
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।[২]

ইহার পূর্ববর্তী কবিতা আহ্বানসঙ্গীতে গুহাবদ্ধ কবি-নির্ঝরের পূর্ববর্তী অবস্থা দেখিতে পাই।

ওরে তুই জগৎফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল
মাটিতে পড়িল খ'সে,
সারা দিনরাত গুমরি গুমরি,
কেবলি আছিস বসে।[৩]

এ জগৎ সর্বজনের বৃহৎ জগৎ নয়। গুহাবদ্ধ নির্ঝরের জীর্ণ ও ক্ষুদ্র জগৎ। কথাটা কবি স্বয়ং স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়, যেমন নবোদ্‌গতদন্ত শিশু মনে করেছেন, সমস্ত বিশ্ব-সংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।[৪]

কিন্তু একবার বৃহৎ জগতে বাহির হইয়া পড়িবা মাত্র ক্ষুদ্র জগতের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া যায়—তখন নির্ঝর 'অনন্ত জীবনে'র আস্বাদ পায়—

১ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাতসঙ্গীত
২ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাতসঙ্গীত
৩ আহ্বানসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত
৪ প্রভাতসঙ্গীত, জীবনস্মৃতি

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন উঠিল আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।[৫]

নির্ঝর যতই অগ্রসর হইতেছে ততই জীবনলক্ষ্য তাহার সম্মুখে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর।
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।[৬]

তখন আর সে একক নয়, তখন সকলের সঙ্গে সমস্রোতে তাহার যাত্রা—

জগৎস্রোতে ভেসে চলো
যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবিশশী—
চল্ রে সেথা যাই।[৭]

এবং অবশেষে—

জগতে হয়ছে সারা প্রাণের বাসনা।

৫ অনন্তজীবন, প্রভাতসঙ্গীত

৬ পুনর্মিলন, প্রভাতসঙ্গীত

৭ স্রোত, প্রভাতসঙ্গীত

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের মানবসত্য নামে পরিশিষ্টে প্রভাত-সঙ্গীতের নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কবি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নির্ঝর যে-জগতের অভিমুখে বহির্গত কবি তাহার নাম দিয়াছেন—'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।'

> অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। ...এই হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করলো। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে সঙ্গে যোগমুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তারই মধ্য দিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্য দিয়ে। এই যে ডাক পড়লো, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে পড়েছে এক জায়গায়......
>
> সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিলো, মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি,—সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহা-সমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।[৮]

এই ব্যাখ্যার পরে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটি কথা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতাকেই কবি নিজ জীবন-তত্ত্বের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। আমরাও

৮ মানবসত্য, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০শ খণ্ড

তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ক্রমস্ফীত নদীর দুই তীরে—এক তীরে 'সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ মানুষের সংসার', অন্য তীরে 'নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোক'—রবীন্দ্রসাহিত্য-জগৎ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

"মরিতে চাহি না আমি"

প্রভাতসঙ্গীতে মানুষের সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। নির্ঝর পাহাড়ের গুহা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই যে মানুষের সংসারে প্রবেশ পায় এমন নয়—তখনো সমতলভূমির সংসার অনেক দূরে থাকে—তবে সেই দিকেই তাহার গতি, এই পরম সান্ত্বনা। কবিনির্ঝরও সেই দিকেই চলিয়াছে। মানুষের পরিচয় পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাই প্রভাতসঙ্গীতের মূল প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে মহাসমুদ্র তথা মহামানব বলিয়াছেন তাহা এখনো দূরবর্তী দেশকালে অবস্থিত। মহামানবকে জানিবার আগে বাস্তব মানুষকে জানিতে হইবে, প্রাত্যহিক মানুষকে জানিলে তবে মহামানব তথা নিত্যকার মানবকে জানিতে পারা যায়। বাস্তব মানুষ নিত্যকার মানুষের অপরিহার্য ভূমিকা। সেই বাস্তব মানুষের পরিচয় আছে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি ও গল্পগুচ্ছে। মাঝপথে ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল। এই দুইখানি কাব্য পড়িলে এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, কবিসত্তার নদী এখন মানুষের সংসারের কূল ঘেঁষিয়া চলিতেছে ; এখনো নৌকা ভিড়াইবার ঘাট মেলে নাই সত্য, কিন্তু কূলে কূলে দেখা যাইতেছে প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের লীলা, ঘাটে ঘাটে দেখা যাইতেছে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির আনাগোনা, উঠিতেছে বিরহমিলনের গুঞ্জন—আর নদীর অন্য কূলটা ঝাপসা রেখার গুণ্ঠনে এখনো আবৃত, যে কূলে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের জগৎ। কড়ি ও কোমল মানুষের সংসারের ঘাট, ঘর নয় ; ছবি ও গানে সেই ঘাটের দেয়ালা।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে

তো অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই ; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে, এবং তাহার গতিবিধির কোন নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না। কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।[১]

তার পরে তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—

মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশী সমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।[২]

এই প্রাণের ব্যাকুলতার কতকটা ছবি ও গানে, কতকটা কড়ি ও কোমলে। ছবি ও গানে ব্যাকুলতাটা একটা নেশামাত্র, তাহর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এখনো অস্পষ্ট। তখন ভোর হইয়াছে তবু ঘোর কাটে নাই, প্রাতঃকালীন কুয়াশার চতুর্দিক আচ্ছন্ন, দূরে দূরে সংসারের ছায়ামূর্তি।

১ বর্ষা ও শরৎ, জীবনস্মৃতি

২ কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি

> আমার ছবি ও গান আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়তো অনুভবও করছ। আমি দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সকল বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেতো যে তখন যদি তোমরা আমাকে দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।[৩]

গুহাত্যাগী নির্ঝর যখন বৃহৎ পৃথিবীর দিকে যাত্রা করে তখন এইরকম নেশা ব্যাকুলতা ও উল্লাস অনুভব করে না কি? তখনো তাহার মধ্যে 'ফলের লক্ষণ' থাকে না, এবং 'পরিণাম'ও সুদূরপরাহত থাকে, তবু তলে তলে বুঝিতে পারে পরম সার্থকতার দিকেই তাহার দুর্বার গতি। কড়ি ও কোমলের সঙ্গে এখানেই ছবি ও গানের প্রভেদ, সে প্রভেদ গুণগত নয়, গুণের তারতম্যগত। কড়ি ও কোমলে ফলের লক্ষণ দেখা দিতেছে, সৌন্দর্যপুলক পরিণামের আভাস পাইতেছে, নেশার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তীরবর্তী নরনারীর মূর্তি দেখা দিতেছে, তখনো তাহারা দূরবর্তী সন্দেহ নাই, তবে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কড়ি ও কোমলে ব্যক্তি-নরনারীর প্রথম প্রত্যক্ষ আভাস।

> আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির স্কাইলার্ক আর একটা ওয়ার্ডস্বার্থের

৩ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড

স্কাইলার্ক। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করছে আর একজন অনন্তসুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতায় প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক করে অনুভব করে।...কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন থাকলেই ভালো হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না, ভালো কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real আর পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য।[৪]

এই পত্রখণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা ইহাতে কবি অজ্ঞাতসারে আপন কাব্যতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছেন যাহার সচেতন উল্লেখ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়—সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা তাঁহার কাব্যরচনার একমাত্র পালা। বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসাটা সীমার জগৎ, আর সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই অসীম। কবির ভাষায় একটা 'নিরাকারের অভিমুখী' আর একটা 'সাকারে জড়িত'।

এখন, সীমা ও অসীমে, কবির ভাষায় 'সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসায়' আর 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষায়' রবীন্দ্রকাব্যে সত্যই যদি কোথাও পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনেক পরবর্তীকালের কাব্যে ঘটিয়াছে, কড়ি ও কোমলে ঘটে নাই নিঃসন্দেহ। আগেই বলিয়াছি সংসারপ্রবাহের যে কূলে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসার নিকেতন, কড়ি ও কোমলে কবিসত্তা সেই কূল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে।

৪ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড

ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ-মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

এই ক'টি ছত্রে কবির ধ্যান প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কাব্যের শেষদিকের চতুর্দশপদীগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতা নারীর দেহগতসৌন্দর্যবিষয়ক। এমন নিছক দেহগতসৌন্দর্যের কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নাই, অনেক স্থলেই ফুলের লালসার মধুতে মধুপের পাখা জড়াইয়া যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেহগত সৌন্দর্যের শেষ আবেশটা দেহাতীতের দিকে উঠিয়াছে। দেহগত সৌন্দর্যের কূল ঘেঁষিয়া স্রোত বহিতেছে সত্য কিন্তু ছোট ছোট ঊর্মিগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলিতেছে, মাঝে মাঝে আবর্তের টানে নদীর ধারা বিপরীত কূলের দিকে ছুটিয়া চলে। এই অপ্রত্যাশিত ক্রিয়া ঘটিতেছে বলিয়াই কবিতাগুলি নিছক দেহসর্বস্বতার উপরে উঠিয়া একটি বিচিত্র মাধুর্য লাভ করিয়াছে। বুঝিতে পারা যায় যে, নদীপ্রবাহের উপরিতলে স্রোতের যে ক্রিয়াই হোক না কেন, ভিতরে ভিতরে একটা স্রোত নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে, অসীমের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন পূর্ণ ভালোবাসা আর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-লোকের আকাঙ্ক্ষার এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি মূল উপাদান। কড়ি ও কোমলের আগেও সূক্ষ্মাকারে ইহা আছে, কড়ি ও কোমলে ইহা বেশ লক্ষ্যগোচর হইয়া উঠিয়াছে, তার পর হইতে ইহা, এই বিপরীতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বিচিত্রতর, বর্ধিততর বেগে প্রবহমাণ।

কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট

হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে।[৫]

আশুতোষ চৌধুরীর মন্তব্যও সত্য, কবির মন্তব্যও সত্য। কড়ি ও কোমলের প্রধান প্রেরণা সংসারের প্রতি দৃঢ় আসক্তি নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই আসক্তির সমস্ত জানলাগুলো বেশ শক্ত করিয়া বন্ধ নয়, দু-একটা জানলা আল্‌গা—তাহা দিয়া মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকের দমকা বাতাস প্রবেশ করে বলিয়াই আসক্তির গাঁঠগুলো খুব দৃঢ়নিবদ্ধ নয়।

৫ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

"রচি শুধু অসীমের সীমা"

॥ ১ ॥

কবিদের মনের গতি বড় বিচিত্র, আর এই বিচিত্রতার ফলেই কাব্যে এত বৈচিত্র্য ; নতুবা কাব্যের বিষয় যখন এক, সকল কাব্যও এক রকম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। গতির ত্বরা বা মন্থরতা, ঋজুতা বা বক্রতা অনুসারে দ্রষ্টার চোখে বস্তু ভিন্ন রূপ ও ধর্ম লাভ করে— সেই ভেদ বৈচিত্র্যরূপে ধরা পড়ে কাব্যে। বিমানের যাত্রী ও গোরুর গাড়ির যাত্রী বস্তুকে নিশ্চয় এক রকম দেখে না। মনোরথের যাত্রীদের সম্বন্ধে এ-কথা আরও অধিক প্রযোজ্য। এখন নির্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট বস্তু এক হইয়াও যদি গতিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, তবে রহস্যময় জীবন মনোরথের যাত্রীর চোখে কিরূপ দেখাইবে, সহজেই অনুমেয়। কাব্যের প্রকৃতি নির্ভর করে কবির মনোরথের গতির প্রকৃতির উপরে।

কালিদাসের মন প্রথম আষাঢ়ের জলভারনত মন্থর মেঘের মতো। সে-মেঘ অন্তরীক্ষচারী হইলেও পৃথিবীর সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ; ঊর্ধ্বলোক ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের চূড়া ও বনস্পতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করিয়া সে মেঘ চলে ; বনের ফুল ফুটাইতে ও ফল পরিণত করিয়া তুলিতে তাহার বড় আনন্দ ; সে-মেঘ জনপদবধূদের কটাক্ষ-দাম দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া মন্দাক্রান্তা তালে চলে ; সে-মেঘ পুষ্পকচারিণী সীতার মণিবন্ধে সযত্নে বিদ্যুতের বলয় পরাইয়া দেয় ; আবার যখন জললব-প্রাচুর্যে হঠাৎ নামিয়া পড়ে, পৃথিবীর পাহাড়গুলিকে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্তবৎ দেখিতে পায় ; এইভাবে কালিদাসের

মন পৃথিবীর কাছ ঘেঁষিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে মন্দমন্থর গতিতে চলে, সামান্য একটি বিরহীর বার্তাও তাহার কাছে তুচ্ছ নয়।

শেলির মনের গতি ধাবমান কৃষ্ণসারের, সে 'স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি', পৃথিবীর ধূলি ও বন্ধুরতা যেন স্পর্শ করে না তাহার পা কয়খানা; সংসারের নিশিত-শরপতন-শঙ্কাতেই সংসারের দিকে তাকাইবার অবকাশ তাহার নাই; যত দ্রুত সে ছোটে, সংসার তত পিছনে পড়িয়া থাকে; সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিবার, সংসারের সুখ-দুঃখের অংশ লইবার সুযোগ তাহার হয় না বলিয়াই সে "Ineffectual angel", সংসারও এই পলায়নপর মৃগকে মৃগতৃষ্ণিকার চেয়ে বাস্তব মনে করিতে পারে না।

কীট্‌সের মন জলৌকার ন্যায়; অতি মৃদু মন্থর, নিঃশব্দ গতিতে একটি তৃণপল্লবকে অতিক্রম করিয়া তৃণাগ্রভাগে একবার থামে, তার পরে সুনিপুণ দক্ষতায় অপর তৃণাগ্রটিকে পরীক্ষা করিয়া পদার্পণ করে। সংসারকে অধিকার করিয়া সে চলে, অতিক্রম করিয়া নয়; তাহার না আছে ত্বরা না আছে বিশ্রাম, "without haste, without rest"; তথ্য যতই তুচ্ছ হোক, তাহার অন্তর্লীন মধুবিন্দুটি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তাহার মন স্বস্তি পায় না; "a poet is a most unpoetical being"—সে জলে জল হইয়া মিশিতে চায় না, সপ্তুতীর্থের বারিকে সে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া আত্মপুষ্টি করিতে চায়।

যে তিনজন কবির গতির উল্লেখ করিলাম গতিবৈচিত্র্যের ফলেই তাঁহাদের কাব্যে এমন অভাবিত বৈচিত্র্য।

এবারে রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথের মনের গতি কিরূপ ও তাহার প্রকৃতি কী? সে-প্রকৃতির ফলে কী অভাবনীয় সম্পদ্ ও রূপ লাভ করিয়াছে তাঁহার কাব্য? সেটাই আলোচ্য বর্তমান প্রবন্ধে।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের কবিমন সীমা ও অসীমের বিপরীত কোটিতে আহত হইয়া ঘড়ির দোলকের মতো দুলিতে থাকে, আর এইভাবে দুলিতে দুলিতে সে অগ্রসর হইয়া যায়—কোথায় যায়, ভালো করিয়া নিজেই জানে না, তবে আভাসে জানে যে "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" কোন্‌খানে? হয়তো যেখানে সীমা ও অসীম মিলিত হইয়াছে সেই রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় লোকে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এক পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের ভেদ দোলকের এই আঘাত-বৈপরীত্য। এক পর্বের কাব্যে দোলক সীমার কোটিতে আহত, পরবর্তী পর্বের কাব্যে দোলকের আঘাত অসীমের কোটিতে।

"এ চিরজীবন তাই
আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা।"[১]

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য অসীমের অনির্দিষ্ট আকাশে সীমার মানচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। "রচি শুধু অসীমের সীমা।" "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।"

একদিকে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যখানি, অপর দিকে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি' তিনখানি কাব্যে সজ্জিত একটি গুচ্ছ—আর এ-দুয়ের মাঝখানে আছে 'মানসী' কাব্যখানা। কড়ি ও কোমল-এ রবীন্দ্রনাথের মন আঘাত করিয়াছে সীমার কোটিতে, সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালিতে অসীমের কোটিতে, আর মাঝখানকার মানসীতে মনটি এ-দুই কোটির মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায়।

১ উপহার, মানসী

কড়ি ও কোমলএ কবি সীমার দিক হইতে অসীমকে দেখিয়াছেন, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যে অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন, আর মানসীতে কবি-মন সীমা ও অসীমের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছে, কোন একতরকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আন্দোলনের অর্থ তাঁহার কাছে নিরর্থক নয়; তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার কবিকর্ম হইতেছে "রচি শুধু অসীমের সীমা।"

কড়ি ও কোমল কাব্যের নারীসৌন্দর্য-বিষয়ক কবিতাগুলি এককালে বিজ্ঞজন কর্তৃক নিন্দিত ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কবিতাগুলিতে সম্ভোগচিত্রের উজ্জ্বল রঙ লোকহিতের পরিপন্থী; নারীর অঙ্গের নিপুণ বর্ণন নীতিবিরোধী। অবশ্য কবিতাগুলির সমর্থকেরও অভাব ছিল না। এ-কথা মানিতেই হইবে যে, নারী-সৌন্দর্যের এমন নগ্ন বর্ণনা রবীন্দ্রকাব্যে বিরল; কোথাও যে লালসা শিল্পের সীমানাকে লঙ্ঘন করে নাই, এমনও বলা চলে না; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ লালসার সঙ্গেই সর্বদা এমন একটা ঊর্ধ্বমুখী টান ও গতি আছে, যাহা দেহের সীমানাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ যেন রাজহংস ক্ষণকাল তরে সরোবরে নামিয়া পড়িয়া সরোজিনীর সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহার পাখা বদ্ধ হয় নাই, ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রহিয়াছে। এই ভাবটিকেই বলিয়াছি সীমার দিক হইতে অসীমকে দেখা।

> হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর,
> হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।[২] (স্তন,১)

> ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
> দেবশিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।[৩] (স্তন,২)

২ স্তন ১, কড়ি ও কোমল

৩ স্তন ২, কড়ি ও কোমল

হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।[৪] (দেহের মিলন)

একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।[৫] (পূর্ণমিলন)

কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ,
এ চির পূর্ণিমা-রাত্রি হোক অবসান।[৬] (বন্দী)

এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।[৭] (কেন)

যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাসো তারে করিছ বিনাশ।[৮] (পবিত্র প্রেম)

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।[৯] (পবিত্র জীবন)

সুখ রৌদ্র মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।[১০] (মরীচিকা)

বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি।[১১] (বাসনার ফাঁদ)

৪ দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল
৫ পূর্ণ মিলন, কড়ি ও কোমল
৬ বন্দী, কড়ি ও কোমল
৭ কেন, কড়ি ও কোমল
৮ পবিত্র প্রেম, কড়ি ও কোমল
৯ পবিত্র জীবন, কড়ি ও কোমল
১০ মরীচিকা, কড়ি ও কোমল
১১ বাসনার ফাঁদ, কড়ি ও কোমল

কবিতাগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অস্বস্তির, অতৃপ্তির, অশান্তির এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট। এগুলিতে প্রমাণ হয় যে, পরিপূর্ণ ভোগ বা ভোগেচ্ছার মধ্যেও তৃপ্তি পায় নাই রাজহংস, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মানসোৎকা ডানা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন বৈষ্ণব কবির "দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" এই ঊর্ধ্বমুখী টানের ফলেই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। ঐ টানের অভাব থাকিলেও শিল্পকার্য হিসাবে ইহাদের মূল্য হয়তো থাকিত, কিন্তু কবিমনের বিচিত্রগতির এমন বাহন হইয়া উঠিত না। দোলক যে মুহূর্তে সীমার কোটিতে আঘাত করিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপরীত কোটি তাহার চোখে পড়িতেছে। ইহাকেই বলিয়াছি সীমার দিক হইতে অসীমকে দেখা।

এধারে দোলক আঘাত করিয়াছে অসীমের কোটিতে। আমরা সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির জগতে আসিয়া পড়িয়াছি। চৈতালি এই পর্বের শেষ কাব্য। এবারে আবার দোলক ফিরিবে সীমার কোটিতে, চৈতালিতে ইতিমধ্যেই তাহার পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যহের সংসার, বাস্তব জগৎ, জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ স্নেহ-মমতার চিহ্নগুলি ইতিমধ্যেই আবার চোখে পড়িতে শুরু করিয়াছে—দোলকের মুখ যে সীমার দিকে ফিরিয়াছে। কিন্তু সোনার তরী-চিত্রাতে অসীমের কোটি; অসীমের কোটি হইতে সীমাকে দর্শন; কড়ি ও কোমল হইতে পূর্ণতম ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়াছে কবির মন। সোনার তরীর মানসসুন্দরী এবং কড়ি ও কোমল-এর নারী-বিষয়ক কবিতাগুলি এক জগতের অধিবাসী নয়।

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছে উদয়।[১২]

এ যে অসীমের কোটিতে পরিপূর্ণভাবে আঘাত। কিন্তু অসীমের কোটি হইতে সীমাকে দর্শন! তার কী হইল? সে প্রমাণও আছে।

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ,—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।[১২]

অসীমে তৃপ্তি নাই, তাই পূর্বজন্মগত সীমার কোটিকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাই অসীমগত মন না বলিয়া তৃপ্তি পায় না যে, 'কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি'।

'মানস-সুন্দরী'র চেয়েও 'উর্বশী'তে বোধ করি স্পষ্টতর অসীমের কোটিতে আঘাতের এই অভিজ্ঞতা। 'মানস-সুন্দরী'র জগৎ হইতে সীমার দূরবর্তী জগৎ এক-আধবার ছায়ার মতো চোখে পড়ে কিন্তু 'উর্বশী'তে কবির মন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষের পরপারবর্তী ছায়াপথে এমনভাবে উধাও হইয়া গিয়াছে যে, সীমার জগৎ আর কিছুতেই চোখে পড়ে না। এমন অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নয়। তাই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় অসীমের কোটি হইতে দীনহীনা পৃথিবীকে চোখে পড়িয়া যায়, আবার 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাতেও সেই একই ভাব। কবির প্রেয়সীর স্থান সুভদ্রা, মহাশ্বেতা, পার্বতী প্রভৃতির সহিত একাসনে হইলেও বারংবার দারিদ্র্য-দুর্লভ বাস্তবের গৃহকোণটি চোখে পড়ে। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার বর্জিত অংশে ভাবটি স্পষ্ট ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কেন এমন

১২ মানসসুন্দরী, সোনার তরী

হয়? ইহাই যে কবিমনের প্রকৃতি। একবার সীমার কোটি হইতে অসীমকে দর্শন, আর একবার অসীমের কোটি হইতে সীমাকে দর্শন। এ দুয়ের মাঝখানে সংক্রমণের ইতিহাস মানসী কাব্যে।

মানসী কাব্যের অনেকগুলি কবিতা (এগুলিকে মানসীর কেন্দ্রগত কবিতা বলা যায়) একটি নিদারুণ মৃত্যুশোকের উৎস হইতে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ এই শোকের অভিজ্ঞতা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের মৃত্যুশোক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল, তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ-শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।" তাঁহার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, আঘাতের নৈদারুণ্যে প্রথমে কিছু দিন তিনি অন্তর্লোকে একটা নৈরাজ্যের মতো অনুভব করিয়াছিলেন। মানসীর 'ভৈরবী গান' কবিতায় এই ভাবটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এমন নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য-পূর্ণ কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নাই—মানসীতেও নয়। কিন্তু এমন দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও চলিল না। শোকের মধ্যেই শোকের প্রতিষেধক মিলিল।

মানুষের দেহটাতেই সীমা ও অসীমের অপূর্ব মিলন। এখন, দেহটাকে একান্ত করিয়া দেখিলে দেহের নাশে, মৃত্যুতে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। যে-ব্যক্তি দেহের অসীম সত্তাকে দেখিতে পায়, সৌভাগ্যবান সে, নিজেকে আর সে অসহায় অনুভব করে না। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ মানুষকে সীমার দিক হইতে দেখিতেছিলেন, মৃত্যুর আঘাতে ততক্ষণ নিতান্ত অসহায় ছিলেন। জলে-পড়া অপটু মানুষ প্রাণের দায়ে হাত-পা ছুঁড়িয়া কোন রকমে তীরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও তীরে উঠিলেন, সেটা অসীমের তীর। মানসীর

কবিতাগুলি সেই প্রাণান্তিক চেষ্টার ইতিহাস বহন করিতেছে।

আবার—

যাক, তাই যাক। পারিনে ভাসিতে
কেবলি মুরতি-স্রোতে।
লহো মোরে তুলে আলোকমগন
মুরতি-ভুবন হতে।[১৩]

নাই নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।[১৪]

'মুরতি-ভুবন হতে' ত্রাণ পাইবার আকাঙ্ক্ষা, আকাশটাকে বাদ দিয়া নীলিমাকে আশ্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা যখনই তাঁহার মনে দেখা দিল, তখনই তিনি নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইলেন। কড়ি ও কোমল-এ কবি সীমার দিক হইতে অসীমকে দেখিয়াছেন, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যে অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন, আর মানসীতে একবার সীমার দিক হইতে অসীমকে, একবার অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন—নিমজ্জমান মানুষ যেমন বারংবার জলাশয়ের দুটা দিককেই দেখে, তীরের কত কাছে আসিল, বিপদের ক্ষেত্র হইতে কতদূরে আসিল,—অনেকটা সেই রকম। মানসী এই বিপরীত দৃষ্টির পরিচয়ে পূর্ণ বলিয়া ইহার এমন মূল্য।

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত?"[১৫]

১৩ সুরদাসের প্রার্থনা, মানসী

১৪ হৃদয়ের ধন, মানসী

১৫ শূন্যগৃহে, মানসী

অনেক দুঃখ সহ্য করিয়া কবিকল্পনার দুর্গম দৌত্য স্বীকার করিয়া এ-প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতে হইয়াছে কবিকে। উত্তর পাইয়াছেন তিনি। 'ধ্যান', 'পূর্বকালে', 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় সে উত্তর আছে। কবির সিদ্ধান্ত এই যে, সীমাটাই একান্ত নয়, মৃত্যুতে তাই সব কিছুর অবসান ঘটে না। তবে সত্তা কিভাবে বিরাজ করে? স্মৃতিতে প্রেমরূপে বিরাজ করে, নিখিল বিশ্বে সৌন্দর্যরূপে বিরাজ করে। পরবর্তী কাব্যগুচ্ছ এই নবলব্ধ সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। সোনার তরীর 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় সেই সত্তা আছে প্রেমরূপে, চিত্রার 'উর্বশী' কবিতায় সেই সত্তা আছে সৌন্দর্যরূপে। একটিতে স্মৃতিচারী প্রেম, অপরটিতে নিখিলবিশ্বচারী সৌন্দর্য। আমার অনুমান সত্য হইলে কাব্য দুখানিকে এক গুচ্ছের অন্তর্গত মনে করিবার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে। নবলব্ধ অভিজ্ঞতার অর্ধেক সোনার তরীতে, অপরার্ধ চিত্রায়। এই দুই কাব্যের নবলব্ধ তীরে উঠিয়া অসীমের দিক হইতে ধীরে-সুস্থে সীমাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন কবি। তাই এই দুই কাব্যে প্রত্যয়ের নিশ্চয়তাজাত শান্তি আছে, মানসীর অনিশ্চিত, অস্থির আকুলি-বিকুলি নাই। আবার মানসী কাব্যের 'উপহার' কবিতাটি যখন লিখিতেছিলেন (এটিকে মানসীর উপান্ত-কবিতা বলা যাইতে পারে) তখনই মনে মনে তিনি সিদ্ধান্তটি লাভ করিয়াছেন, তাই এটি মানসীর অন্যান্য কবিতার মতো আকুলি-বিকুলিতে পূর্ণ নয়, প্রত্যয়ের স্থির মহিমায় উজ্জ্বল। সে-প্রত্যয় হইতেছে কবির বিধিদত্ত কার্য সম্বন্ধে নিশ্চয়জ্ঞান। একান্তভাবে সীমাও নয়, একান্তভাবে অসীমও নয়; এ-দুয়ের মাঝে নিরন্তর দৌত্য-বিনিময়, কবির ভাষাতে "রচি শুধু অসীমের সীমা।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

"ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"

॥ ১ ॥

কালিদাসের দুষ্মন্ত দৈত্যরণে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন 'অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী'। অথচ তিনিই কয়েক দিন মাত্র আগে রাজসভায় শকুন্তলাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। কাছের দেখায় ও দূরের দেখায় কত প্রভেদ। যে-শকুন্তলাকে তিনি তপোবনে দেখিয়াছিলেন সে কাছের মানুষ ছিল না, দুষ্প্রাপ্যতার দিগন্ত তাহাকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়া তাহার সুকুমার মুখমণ্ডলের উপরে একটি মায়াময় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল। রাজসভায় সেই অবগুণ্ঠন খুলিয়া শকুন্তলা যখন নিজেকে রাজার ধর্মপত্নী বলিয়া পরিচয় দিল তখন রাজা আর চিনিতে পারিলেন না। আবার কাছের দেখায় ও দূরের দেখায় কত প্রভেদ।

এখন, দূরত্বের তারতম্যে বস্তুর রূপের তারতম্য—এই যে ব্যাপারটা, এটা কি দুষ্মন্তের চোখের প্রকৃতি, না, স্বয়ং কালিদাস নিজের চোখের প্রকৃতিকে নায়কের উপরে আরোপ করিয়াছেন? কেবল নায়কের দৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না, কবির দৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার অনেকগুলি কাব্যে, আপাতত মেঘদূত ও রঘুবংশের দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে, শকুন্তলার দৃষ্টান্তের তো সবিশেষ উল্লেখই করিলাম, উচ্চাকাশ হইতে পৃথিবীর সৌন্দর্যের অভিনবত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। একই দৃষ্টির এতগুলি দৃষ্টান্ত আকস্মিক হইতে পারে না। কালিদাসের কবিপ্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ এই যে, বস্তুস্বরূপের বোধের জন্য দূরত্বের কামনা করে। কাছের জিনিস যে তাঁহার চোখে

পড়ে না তাহা নয়, প্রাণভয়ে ভীত ধাবমান মৃগের কি সুন্দর বাস্তবানুগ চিত্র। কিন্তু মৃগ যে ধাবমান। প্রতিটি মুহূর্ত যে তাহার দূরত্ব সেইসঙ্গে তাহার সৌন্দর্য বিবর্ধন করিতেছে। গতিশীলতা যে দূরত্বের অনুষঙ্গ। সেইজন্য মেঘ তাঁহার এত প্রিয়, মেঘ যুগপৎ দূরস্থ ও গতিশীল। সেইজন্য রথবেগের বর্ণনা তাঁহার এত প্রিয়। মোট কথা বুঝি এই যে, দূরত্বের অঞ্জন চোখে না পরিলে সৌন্দর্য ধরা পড়িত না তাঁহার কাছে। শকুন্তলার কবির পক্ষে মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা বোধ করি সম্ভবপর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় অনুরূপ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি। তিনি সারাজীবন সীমা ও অসীমের মধ্যে দোতুল্যমান অবস্থায় সীমার কোটি হইতে অসীমকে, অসীমের কোটি হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন, সুন্দর দেখিয়াছেন, স্বরূপস্থ দেখিয়াছেন। এক দিকে বস্তু ও ঘটনা, অন্য দিকে কবি ; মাঝখানে দূরত্বসৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দুয়ে শুভদৃষ্টি ঘটে না। ডায়েরি লিখিতে পারেন না কবি স্বীকার করিয়াছেন। সে এই কারণে। রোজনামচা যে রোজকার ব্যাপার, মাঝখানে দূরত্ব কই। এই একই কারণে সাময়িক কবিতা রচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। এক সময়ে অনেক সমালোচক অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের স্মরণ কাব্যের তুলনা করিয়া এষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এষা উচ্চাঙ্গের কাব্য কি না জানি না, স্মরণ নয় নিশ্চয়। ঘটনার বড় বেশি কাছে তখন তিনি ছিলেন। দূরে থাকা ও কাছে থাকার ফলে কাব্যরসের তারতম্যের এমন অনেক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভব। সেটা ঠিক এখানে আলোচ্য নয়। কেবল এইটুকু মানিয়া লইলেই চলিবে যে, সীমার কোটি হইতে যখন তিনি অসীমকে দেখেন, অসীমের কোটি হইতে যখন সীমাকে দেখেন, তখনই তিনি তাহাদের সুন্দর দেখেন, স্বরূপে দেখেন। এইভাবে দেখাই তাঁহার পক্ষে যথার্থ দর্শন।

পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবি কড়ি ও কোমল কাব্যে সীমার কোটি হইতে অসীমকে দেখিয়াছেন। তার পরেই তাঁহার দোদুল্যমান চিত্ত অসীমের কোটিতে আসিয়া পেঁাছিয়াছে, এবারে অসীম হইতে সীমাকে দর্শন। সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি অসীমের কোটির কাব্য। মাঝখানে রহিল মানসী—এ কাব্যে কবির এক কোটি হইতে অন্য কোটিতে সংক্রমণের চিহ্ন। আরো একটি কারণে মানসী কাব্যের বিশিষ্টতা। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত কাব্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটি সংকীর্ণ পরিধির মানুষ, প্রধানত তাহা পারিবারিক ও আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি। সোনার তরী কাব্য রচনাকালে তিনি বৃহত্তর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। মানসীর এক দিকে এই সংকীর্ণ গণ্ডি, অন্য দিকে বৃহত্তর লোকসমাজ। এই সংক্রমণের চিহ্নও বহন করিতেছে মানসী কাব্য। সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি এক কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত, ইহাদের মৌলিক প্রেরণা ও ভাবনা এক বই দুই নয়, আর ইহাদের শিল্পরীতিও অভিন্ন। তবে একটি হইতে অপরটির যে প্রভেদ তাহা প্রাহ্ন মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের প্রভেদ—তিনটিই কবি-অভিজ্ঞতার একই দিবসের অন্তর্ভুক্ত।

এখন, এই কাব্যগুচ্ছকে অনেকে অনেক ভাবে দেখিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন। সোনার তরী কবিতাটির অপব্যাখ্যা ও জীবনদেবতা-আইডিয়ার অতিব্যাখ্যা আলোচনার পথ দুর্গম না করিয়া তুলিলে কাব্যগুলিকে আরো অনেক সহজে রসিকের হৃদয় গ্রহণ করিত। বস্তুত রসিক-হৃদয়ের কাছে দুরূহ এমন কিছু এ কাব্যগুলিতে আছে মনে করি না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছে কাব্য-তিনখানি সুখের মতো 'সহজ সরল'। আমার কাছে এই গুচ্ছটি লৌকিক প্রেমের, লৌকিক সৌন্দর্যের ও লৌকিক আনন্দের কাব্য। তবে সেই লৌকিক প্রেম, লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দ অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট, তাই হঠাৎ তাহাদের

অতিলৌকিক ও অলৌকিক বলিয়া ভ্রম হয়। আর কিছুই নয়, কল্পনার স্বর্গভ্রষ্ট অরূপ রশ্মি পড়িয়াছে লৌকিক প্রেমে, লৌকিক সৌন্দর্যে, তাই এমন দৃষ্টিবিভ্রম। রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ যাঁহারা করিয়া থাকেন মনগড়া অভিযোগের কালো চশমা জোড়া খুলিলে তাঁহারা খুশি হইতেন, দেখিতে পাইতেন যে বাংলা আর কোনো কাব্যে লৌকিক প্রেম, লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দ এমন অপরূপ শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। আগেই বলিয়াছি যে, কাব্যগুলি সহজ ভাবে গ্রহণের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল সোনার তরীর অপব্যাখ্যা ও জীবনদেবতার অতিব্যাখ্যা। সে বাধা এখনো সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে মনে হয় না। কিন্তু সরাসরি এগুলিকে প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে বাধা নিতান্তই কাল্পনিক। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রচেষ্টা। কেবল মনে রাখা অত্যাবশ্যক লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দ অসীমের দূরত্ব হইতে নিরীক্ষিত।

গাজিপুরে বাসকালে তিন-চার মাসের মধ্যে যে কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন সেগুলির মূল প্রেরণা একটা নিদারুণ নৈরাশ্য। এমন ঘননৈরাশ্যেপূর্ণ কবিতাসমষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।

> ভবে সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ
> কে রেখেছে মত আঁটিয়া।...
> কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
> একেলা জীর্ণ তরীতে।...
> সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
> সেইখানে আছে বসিয়া।...[১]

এ মনোভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে আগেও নাই, পরেও নাই। মানসী রচনাকালে ইহাই তাঁহার মানসিক অবস্থা।

[১] ভৈরবী গান, মানসী

আসল কথা কয়েক বৎসর পূর্বেকার একটি মৃত্যুশোক তাঁহার মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এ-সব তাহারই প্রতিক্রিয়া।

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই,
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত !

আছে সেই সূর্যালোক নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ
রয়েছে জীবন নেই জীবনের সুখ।[২]

নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনতর।

মৃত্যুর দুঃখ নানারূপ মূর্তি ধরে জীবনে, যাহা হইলে হইতে পারিত অথচ হইয়া ওঠে নাই তাহা অন্যতম মূর্তি।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে।
কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আধারে।[৩]

আবার—

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল,
নয়নের দৃষ্টি গেল রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ আর ধরণী বিশাল।[৪]

কিন্তু এমন নিরেট নৈরাশ্যের ভার মানুষের মন দীর্ঘকাল বহিতে পারে না। তখন সে ঐ পাষাণের মধ্যে ফাটলের সন্ধান করে।

২ শূন্য গৃহে, মানসী
৩ আকাঙ্ক্ষা, মানসী
৪ বিচ্ছেদ, মানসী

মানুষের সৌভাগ্য এই যে অদৃষ্ট অনুসন্ধিৎসাকে বিড়ম্বিত করে না, পাষাণের ফাঁকে ফাঁকে উষার আলো দেখা দিতে থাকে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন আলিঙ্গনে।
তারি ভালোবাসা তারি বাহু সুকোমল
... ...
বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস।[৫]

কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উষার অস্পষ্ট আভাস।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি।
হৃদয়-আকাশে থাক্‌-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।[৬]

এবারে আলো আর-একটু স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই কম্পমান আলো অন্ধকারের বন্ধন কাটাইয়া একটা অচঞ্চল স্থায়ী মূর্তি লাভ করিয়াছে।

অনন্ত প্রেমের অন্তহীন মূর্তিমেখলা—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
... ...
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।[৭]

৫ মানসিক অভিসার, মানসী
৬ সুরদাসের প্রার্থনা, মানসী
৭ অনন্তপ্রেম, মানসী

এখানে প্রায় আমরা মানসসুন্দরী কবিতার মর্মস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। অনন্ত প্রেম, মানসিক অভিসার ও সুরদাসের প্রার্থনার মতো কবিতায় মনে পড়িয়া যায় পরবর্তী কালের—

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।…

নয়নসম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।[৮]

কবি দুঃখের অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া যে সত্য উদ্ধার করিলেন তাহা এই যে, মৃত্যুতে সব শেষ হয় না। প্রিয়জন নিখিলে সৌন্দর্যরূপে, স্মৃতিতে প্রেমরূপে থাকিয়া যায়। এখন, এই অভিজ্ঞতাজাত সত্যের উপরে পরবর্তী কাব্যগুচ্ছের প্রতিষ্ঠা। স্মৃতিলোকশায়ী প্রেম সোনার তরী কাব্যের মৌলিক প্রেরণা—মানস-সুন্দরীতে ইহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ। নিখিলশায়ী সৌন্দর্য চিত্রা কাব্যের মৌলিক প্রেরণা—উর্বশীতে ইহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ। আর, সংসারের আড়ম্বরহীন কর্তব্যগুলির মধ্যে, অকিঞ্চিৎকর ঘটনা ও দৃশ্যগুলির মধ্যে যে প্রাথমিক জীবনরস ও আনন্দ আছে তাহাই হইতেছে চৈতালি কাব্যের মৌলিক প্রেরণা। চৈতালির সুরগ্রাম খাদে বাঁধা, স্তিমিতকণ্ঠ মানসসুন্দরী বা উর্বশীর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নাই, হয়তো বা অভিজ্ঞতার তারতম্যে তাহা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মৌলিক প্রেরণাটি বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়। কাজেই লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দকে কাব্যগুচ্ছের মৌলিক প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তবে সেই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দ অরূপ রশ্মিতে প্লাবিত এবং

---

৮ ছবি, বলাকা

কাব্যত্রয়ে চিত্রিত মানবজীবন কল্পনার এক অতিদূর অন্তরীক্ষলোক হইতে দৃষ্ট।

॥ ২ ॥

কল্পনার অন্তরীক্ষলোক হইতে "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি" প্রেমে সৌন্দর্যে ও আনন্দে অপরূপ প্রতিভাত হইয়াছে। সে অপরূপত্ব এমনই অপার্থিব যে পৃথিবীর অংশকে 'স্বর্গখণ্ড' মনে হইয়াছে, আরও রহস্যের বিষয় এই যে, স্বর্গ হইতে বিদায়ের ক্ষণে দীনা হীনা পৃথিবীকেই স্বর্গ মনে হইয়া তাহার অপরিপূর্ণতাই স্বর্গের দিব্যপদ লাভ করিয়াছে। ভূতলে থাকিয়া ভূতলকে এমন মধুর মনে হয় নাই, যেমন মধুর মনে হইল দূরে সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্যত্রয়ের ইহাই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য। তবে তিনে কিছু প্রভেদ আছে, কোথাও প্রেম কোথাও সৌন্দর্য কোথাও আনন্দ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই পার্থক্যটুকুর উপরে তেমন জোর দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু চিত্রার অন্তর্গত 'স্বর্গ হইতে বিদায়' বা 'প্রেমের অভিষেক' অনায়াসে সোনার তরীতে সন্নিবেশিত হইতে পারিত। আবার, সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' চিত্রায় সন্নিবিষ্ট হইলে স্থানাত্যয়দোষ ঘটিত মনে হয় না। তেমনি সোনার তরীর অন্তর্গত চতুর্দশপদীগুলি স্বভাবধর্মে চৈতালির আশ্রয় দাবি করিতে পারিত। আর চৈতালির 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে' চিত্রার কবিতাগুলির সহিত আত্মীয়তা ঘোষণা করিতেছে।[১] এসব কবিতার স্থানচ্যুতি রেলগাড়ির এক শ্রেণীর যাত্রীর অন্য শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিবার মতো।

'মানসসুন্দরী'কে বাংলা কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা বলিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। আগে বলিয়াছি যে, মৃত্যুর

১ "এর (চৈতালির) প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতম কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।"—কবিলিখিত চৈতালির সূচনা

পরে প্রিয়জন স্মৃতিতে প্রেমরূপে থাকিয়া যায় এই উপলব্ধি ঘটিয়াছিল মানসী কাব্য রচনাকালে কবির। মানসসুন্দরীর মানসী প্রিয়জনের সেই বিদেহিনী মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'মানসী মানসেই আছে'। মানসেই আছে বই-কি। কিন্তু এখানে সেই মানসীকে বাস্তবলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। আর সে বাস্তব কেবল একটি জন্ম বা ইহজন্মের মধ্যে আবদ্ধ নয়, পূর্বজন্ম ও পরজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।

জানি, আমি জানি, সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম পথে—[১০]

কিন্তু তাহাতেও মন তৃপ্তি মানে না—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ,
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে নাকি তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি?[১০]

আর ইহজন্মের মধুর রহস্য তো আগেই বিবৃত হইয়াছে,

তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখী,

... ...

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[১১]

১০ মানসসুন্দরী, সোনার তরী
১১ মানসসুন্দরী, সোনার তরী

'এখন' কখন? পরিণত বয়সে মনে করিবার কারণ নাই। মৃত্যু দুস্তর দূরত্ব সৃষ্টি না করিলে বাস্তবময়ী 'মানসসুন্দরী' হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। বস্তুকে যথার্থরূপে দর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথের মন যে দূরত্বের অপেক্ষা রাখে এখানে মৃত্যু সেই দূরত্ব সৃষ্টি করাতে ইহজন্মের খেলার সঙ্গিনী পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া বাস্তবময়ী মানসসুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যু একদফা বাস্তবকে অপসারিত করিয়াছে, তার পরে কবি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে পূর্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন, নীহারিকাসংহত তারকা পুনরায় নীহারিকায় পরিণত হইয়াছে। তাই নিতান্ত লৌকিক প্রেমকে অলৌকিক বলিয়া মনে হয়।

কবি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন যে 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান'! তার উৎসের গভীরে কোথাও নরনারীর প্রেমের অভিজ্ঞতা অবশ্য বর্তমান।

> সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?[১২]

কিন্তু প্রেমের নেত্রে দৃষ্ট "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র নিপুণতম বিন্যাস 'প্রেমের অভিষেক' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতা দুটিতে। স্বর্গে গিয়া পুণ্যবান ব্যক্তি দেখিল যে স্বর্গ তেমন কাম্য নয় যেমন মনে হইয়াছিল দূর হইতে।

> শোকহীন
> হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
> চেয়ে আছে।[১৩]

ক্ষয়িতপুণ্য ব্যক্তি স্বর্গ হইতে বিদায়কালে বুঝিল—

১২ বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী

অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে।[১৩]

অপর পক্ষে দূরগত পৃথিবীর কি মধুর চিত্র—

দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো—নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।[১৪]

এই অপরূপ প্রেমসমৃদ্ধ সৌন্দর্যের মূলে আছে বস্তুর ব্যবধান। পৃথিবী দূরস্থ বলিয়াই সুন্দর, যেমন নিশ্চয় এক কালে দূরস্থ স্বর্গকে সুন্দর মনে হইয়াছিল। তবে কি আবার এমন সময় আসিবে যখন পদতলগত পৃথিবীকে আর এমন মধুর মনে হইবে না? নিশ্চয়! কারণ, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। স্বর্গও নয়, মর্ত্যও নয়, কবি দূরত্বকে ভালোবাসেন।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি।[১৫]

হঠাৎ 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি পূর্বোক্ত ধারণা সম্বন্ধে মনে

১৩ স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা

১৪ স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা

১৫ সুদূর, উৎসর্গ

সংশয় জাগ্রত করিয়া দিতে পারে। মনে হইতে পারে এ যে গৃহের বনিতার বন্দনা। গৃহের বনিতার বন্দনা সত্য, কিন্তু গৃহের মধ্যে নয়, গৃহ হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াই তাহার যথার্থ মূর্তি দর্শন সম্ভব হইয়াছে।

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তীসতী
বিচরে নলের সনে...
হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে।[১৬]

সেখানেই প্রেমের সার্থকতা। তবে এখানে কিরকম অবস্থা?

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার[১৬]

সেই পুরাতন কথা—বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত না হইলে বস্তু তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে না রবীন্দ্রনাথের চোখে। সে বস্তু প্রেম হইতে পারে, সৌন্দর্য হইতে পারে, আনন্দ হইতে পারে।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে একটি যথাযোগ্য মূর্তিদানের উদ্দেশ্যে কবিকে চরাচর সন্ধান করিয়া উর্বশীকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এ উর্বশী পৌরাণিকী নয় বা বিদেশিনীও নয়—রবীন্দ্রনাথের মনের সৌন্দর্যপ্রতীক। তবে উর্বশী কেন? উর্বশীর সহিত অনেক সৌন্দর্যের অনেক মাধুর্যের অনেক রসরহস্যের ইতিহাস জড়িত—পাঠকে ও উর্বশীতে স্থায়ী একটা চলাচলের পথ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই উর্বশীর প্রয়োজন। কিন্তু আসল কারণটা অন্যত্র। উর্বশীর চেয়ে সুদূরতরা মানুষের কল্পনার অতীত। সে নিত্য সুদূরের স্বর্গনিবাসিনী। এখানেই তাহার বিশেষ মূল্য কবির চোখে।

১৬ প্রেমের অভিষেক

এক প্রান্তে—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী[১৭]

অন্য প্রান্তে—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।[১৭]

এক দিকে প্রাত্যহিক সংসার, অন্য দিকে কল্পনার প্রত্যন্ততমসীমা-শায়ী বিশ্বের আদিমতম প্রভাত। দূরত্বের ধনুর্গুণ পূর্ণতম বিস্ফারিত, আর একটু টানিলেই ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। উর্বশী শুধু আদিম নারী নয়, সে নারীর আদিম (basic) রূপ। প্রত্যেক নারীর মধ্যে একবিন্দুপরিমাণ উর্বশীর ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান, কিন্তু মূল উর্বশী সকল সম্বন্ধের অতীত, নর ও নারী দুয়েরই। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ইহাই প্রকৃত রূপ ও রহস্য। সে যেন জলতলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব, ধরাছোঁয়ার বাহিরে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিবেন উর্বশীর শরণাপন্ন না হইয়া তাঁহাদের উপায় নাই।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে আরো কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন চিত্রা কাব্যে—যদিচ সেগুলি উর্বশীর মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে মনে হয় না। 'বিজয়িনী' কবিতার 'অচ্ছোদসরসীনীরে' স্নান সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র যে রমণী উঠিল—সে ও উর্বশী ভিন্ন নয়, দুজনেই সদ্য বারিরাশি-সমুত্থিতা। সে নারী বিশুদ্ধ সৌন্দর্যময়ী বলিয়াই কন্দর্প

পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।[১৮]

'আবেদন' কবিতার রাজরাজেশ্বরী আর-একটি সৌন্দর্যপ্রতিমা। ভৃত্য (কবি) তাহার মালঞ্চের মালাকর হইবার দাবি জানাইয়াছেন।

১৭ উর্বশী, চিত্রা

১৮ বিজয়িনী, চিত্রা

এ কাব্যে যে কবি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।[১৯] চিত্রা কাব্যে পাষাণসুন্দরী নামে একটি চতুর্দশপদী আছে। কাব্যাংশে ইহার অসামান্যতা এমন কিছু নয়। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচারে ইহার প্রয়োজন আছে। উর্বশী, বিজয়িনী, রাজরাজেশ্বরীর মতো ঐ পাষাণসুন্দরীও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মানবসম্বন্ধের প্রতি উদাসীন না হইয়া উপায় নাই। কাহারও নয় বলিয়াই সে সকলের, সময়-বিশেষের স্থান-বিশেষের নহে বলিয়াই তাহা চিরকালের ও চিরদেশের। আগে যে দূরত্বের কথা বলিয়াছি মানবসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া এখানে সেই দূরত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

চৈতালি কাব্যের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

> চৈতালি তেমনি এক টুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে-রূপ নিয়ে অল্প-কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

আমার তো মনে হয় সোনার তরী ও চিত্রার অন্তে চৈতালি কাব্য না অপ্রত্যাশিত, না আছে তার মধ্যে কিছু আকস্মিক। বরঞ্চ পূর্বধারার পরিণতি রূপে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রত্যাশিত। প্রমাণস্বরূপ সোনার তরীর কতকগুলি চৈতালিধর্মী চতুর্দশপদীর উল্লেখ করা যাইতে পারে ; আগেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

তার পরে চৈতালির নিরলংকৃত ভাষার রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন কবি।

> অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না।

১৯ 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলির কথা ভুলি নাই। কিন্তু কাব্যাংশে কোনোটিকেই উপরে উল্লিখিত কবিতাগুলির সমান মনে হয় না।

আরও একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। সোনার তরী ও চিত্রার অলংকার-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ভাষার গুণে আর অধিক টান দেওয়া বোধ করি সম্ভব ছিল না, অন্তত সাময়িক ভাবে। তা ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনের অনাড়ম্বর ঘটনাসমূহ ও আপাত-অকিঞ্চিৎকর সুখদুঃখ বর্ণনার ভাষা স্বভাবতই সহজ সরল হইতে বাধ্য।

কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রতিক্রিয়ায় কবি অসীমের কোটিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কল্পনার উচ্চাকাশ হইতে পৃথিবীর প্রেম ও সৌন্দর্য চোখে পড়িতেছিল, এবারে সে বেগ মন্দীভূত, কবি পুনরায় ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আর, যতই নামিতেছেন ততই তাঁহার চোখে সংসারের অতিপরিচিত দৃশ্যগুলি ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সে দৃশ্যগুলি এতকাল 'অতিপরিচিত অবজ্ঞায়' আচ্ছন্ন ছিল, এখন উচ্চলোক হইতে দৃষ্ট হইয়া, অন্তরীক্ষচারী রথ হইতে দুষ্মন্তের পৃথিবী-দর্শনের অভিজ্ঞতার মতো, বড় সুন্দর, বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে। সংসার কী আনন্দে প্রত্যহের বিড়ম্বনাকে বহন করে তখনই কতক বুঝিতে পারা যায়। 'সামান্যলোক'কে তখন আর সামান্য মনে হয় না, নিত্যকার প্রভাত 'অমৃতের স্রোতে' দুলিতে থাকে, তখন খেয়ানৌকার পারাপারকে সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের চেয়ে গুরুতর ঘটনা বলিয়া মনে হয়, আর না বলিয়া উপায় থাকে না যে—

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।[২০]

এবং মনে খেদ হইতে থাকে যে—

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ![২১]

'মূর্খাধম ভৃত্য' তখন 'সে-ও পিতা আমিও পিতা'র গৌরবে মনিবের সঙ্গে একাসনভুক্ত হয়। আর তখন বাৎসল্য কৌতুকে—

২০ সামান্য লোক, চৈতালি
২১ দুর্লভ জন্ম, চৈতালি

জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতিছোটো দিদি।[২২]

এবং—

পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।[২৩]

উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

শুধু কি সংসারের এই অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যগুলি! সমস্ত সংসারটাই এক অপূর্ব মাহাত্ম্য লাভ করে, 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব' ও 'বৈরাগ্য' কবিতাগুলিতে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর বাংলাদেশের হেমন্তের অতিপরিচিত মধ্যাহ্ন হেমকান্তপটে ক্ষোদিত চিত্রের অপরূপতায় স্বর্গের সৌন্দর্যকে লাঞ্ছিত করিতে থাকে। চৈতালি কাব্য চিরন্তনতার সোনার ফ্রেমে বাঁধানো প্রত্যহের আশ্চর্য চিত্র।

অসীমের কোটি হইতে ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি দর্শন-অন্তে কবি পুনরায় ভূতলে পদার্পণ করিলে অভিজ্ঞতার একটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু তখনই আবার নিত্যদোলায়মান কবিচিত্ত নূতন অভিজ্ঞতার প্রেরণায় দূরত্বের সন্ধান করিতে লাগিল। এবারে আর কল্পনার অন্তরীক্ষলোক নয়, এবারে ইতিহাস পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের মানসলোকে কবির 'সুদূরে'র সন্ধান আরম্ভ হইল। অতঃপর লিখিত হইবে কথা ও কল্পনা, এবং কাহিনীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলি। আর সেইসঙ্গে নৈবেদ্যর চতুর্দশপদী কবিতা। সোনার তরী ও চিত্রার অন্তে যেমন ও যে-কারণে চৈতালির চতুর্দশপদী, কথা, কল্পনা ও কাহিনীর অন্তে সেই-রকম ও সেই কারণে নৈবেদ্যর চতুর্দশপদী। সঙ্গে আছে অবশ্য ক্ষণিকা—ক্ষণিকা কবির ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, মানসলোক ভ্রমণ করিবার সময়েও ক্ষণিকার কাব্যে তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া আছেন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গান্তর, যাহার বিস্তারিত আলোচনা কেবল বারান্তরেই সম্ভব।

২২ দিদি, চৈতালি

২৩ পরিচয়, চৈতালি

সপ্তম অধ্যায়

"সে ভাষা ভুলিয়া গেছি"

॥ ১ ॥

কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্য কাব্যকে আমরা প্রাচীন ভারতে কবির মানসভ্রমণের কাব্য বলিয়াছি। মানসভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ফুলে ফলে ভরা ডালা এই তিনখানি কাব্যে আর কিঞ্চিৎ আগে পিছে লিখিত নাট্যকাব্যগুলিতে। কিন্তু প্রশ্ন এই, হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? কবি তো পদ্মাতীরে বসিয়া সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালিতে লৌকিক প্রেম, লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দের কাব্য লিখিতেছিলেন। মনের এমন অবস্থায় তাঁহার দৃষ্টি অতীত ভারতে পড়িতে গেল কেন আর অতীত ভারতে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার সমস্ত মন সেদিকে আকৃষ্ট হইল কেন? এ সব কেনর সদুত্তর দিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার কল্পনারাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে এক অপ্রত্যাশিত যুগান্তর ঘটিয়া গেল। এই যুগান্তরের প্রভাব তাঁহার জীবনে প্রায় দ্বাদশবর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল আর তাহার ফলে কবির গদ্য পদ্য ও জীবনদৃষ্টি যে তির্যক গতি লাভ করিল তাহা কাটাইয়া উঠিয়া পুনরায় বাস্তবের সমসূত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্থূল হিসাবে বলা যায় যে চৈতালি রচনার কাল হইতে গোরা উপন্যাস রচনার সময় পর্যন্ত এই পর্ব। মাঝে দু একটা ব্যতিক্রমের দ্বীপ আছে, যেমন ক্ষণিকা ও শিশুকাব্য। পরবর্তী রচনা চোখের বালি, নৌকাডুবি ও খেয়া এই প্রভাবের ফল। গোরা উপন্যাসে আসিয়া কবি পুনরায় বাস্তবের দৃঢ় তটভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গোড়াতে প্রশ্ন তুলিয়াছি বাস্তবচারী কবির দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের

দিকে গেল কিভাবে? সোনার তরী চিত্রা চৈতালি কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' প্রবন্ধে বলিয়াছি যে এই সময়ে কবি বাস্তবকে কিঞ্চিৎ দূর হইতে, সীমাকে অসীমের কোটি হইতে দেখিতেছিলেন, আর সেই জন্য বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় আনন্দময় মনে হইতেছিল।[১] এইভাবে বাস্তবকে দেখিবার সময়ে তিনি একবার অপাঙ্গে প্রাচীন ভারতকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে সুন্দর মনে হইল। তখন আর অপাঙ্গ দর্শনে তৃপ্তি হইল না; কায়মনোবাক্যে তিনি যেন সেই রহস্যময় গহনে প্রবেশ করিলেন, পরবর্তী কাব্যগুলি সেই গহনচারিতার অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কিন্তু এইভাবে দেখিবার সময়ে তাঁহার খেয়াল হইল না যে, 'প্রাচীন ভারত' বাস্তব নয়, একটি আদর্শমাত্র। আদর্শকে তিনি বাস্তব বলিয়া ভুল করিলেন—এই ভুলের মাশুল শেষ কড়িটি অবধি তাঁহাকে শোধ করিতে হইয়াছে—প্রায় বারো বছর সময় লাগিয়াছে।

আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির একটু বৈশিষ্ট্য আছে, সেটি হইতেছে সীমাকে তিনি দেখেন অসীম হইতে, অসীমকে দেখেন সীমা হইতে, আর এইভাবে দৃষ্ট হইবার ফলে সীমা অসীমের গুণে এবং অসীম সীমার গুণে ভূষিত হইয়া প্রকাশ পায়। সোনার তরী চিত্রা চৈতালির মর্ত্যভূমিকে তিনি কল্পনার অসীম হইতে দেখিয়াছেন, সেইজন্য ঐ কাব্যত্রয়ে যে লৌকিক প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ বর্তমান তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অলৌকিক গুণে ভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্তী কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্য কাব্যেও এই বিচিত্র দৃষ্টি। 'প্রাচীন ভারত' একটি আদর্শ; আদর্শের মধ্যেই

১ চৈতালির এই-কবিতাগুলি প্রাসঙ্গিক: বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত, ঋতুসংহার, মেঘদূত, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভব গান, মানসলোক, কাব্য। এইসব কবিতার কতক কল্পনায় ও কতক নৈবেদ্যে অনায়াসে বসিতে পারিত। চৈতালি কাব্যে ইহারা স্বজনভ্রষ্ট।

একটা দূরত্ব আছে। তার পরে আবার যখন কল্পনার উচ্চাকাশ হইতে দৃষ্ট হয় তখন তাহার দূরত্বের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন সেই আদর্শলোক বড় সুন্দর, বড় মহৎ মনে হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। কথায় বন্দীবীর প্রসিদ্ধ কবিতা। কিন্তু বান্দাকে লইয়া কবি যে উচ্ছ্বাস করিয়াছেন বাস্তব ইতিহাস তাহার সমর্থন করে কি? মৃত্যুকালে সে উৎকট-মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার জীবন ঐ মহত্ত্বের সহিত সমসূত্রে স্থাপিত নয়। কিন্তু তবু যে কবির এমন উচ্ছ্বাস তাহার একমাত্র কারণ একটা আদর্শের স্ফটিকের মাধ্যমে কবি বান্দাকে দেখিয়াছেন। আবার গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কিত কবিতা দুটিতে শিখগুরুকে তিনি মহত্ত্বের শিখরে স্থাপিত করিয়াছেন, খুব সম্ভব তাহাও একটা বিতর্কের বিষয়। আসলে বান্দা ও গুরুগোবিন্দ মূল আদর্শরূপে কবির মনের মধ্যেই আছে; সেই আদর্শ আরোপিত হইয়াছে দুজন বাস্তব মানুষের উপরে; ইতিহাস সে আরোপ সমর্থন করে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। ইতিহাসের বস্তু এখানে কাব্য হইয়া ওঠে নাই, কাব্যের বস্তুকেই ইতিহাস বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার কারণ আগেই বর্ণনা করিয়াছি; আদর্শের দূর লোককে কল্পনার দূরতর লোক হইতে দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কাব্য হিসাবে কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্যর নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, শিল্পোৎকর্ষে ইহারা অতুলনীয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কেন এই সময়ে তিনি প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত কাব্যগুলি লিখিলেন, সে কাব্যগুলি আবার কেন বিশেষ রূপ লাভ করিল—তাহাই আমি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চাই। এখানে আমার লক্ষ্য কাব্য নয়, স্বয়ং কবি, বোধ করি সমালোচনা শাস্ত্রেরই তাহা চরম লক্ষ্য। এই পর্বের কবি আগের ও পরের পর্ব হইতে যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়, তিনি যেন এক অন্য জাতের মানুষ। সেই কথাটাই বুঝাইবার উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধের।

॥ ২ ॥

কল্পনা কাব্যের প্রধান কতকগুলি কবিতা আমাদের বিচার্য।[২] প্রধানত কালিদাসের সাহায্যে কবি এখানে যে মনোরম সৌন্দর্য-প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার অনুরূপ হইতেছে ক্ষুধিত পাষাণের সৌন্দর্যপ্রাসাদ। ক্ষুধিত পাষাণের বন্দী তুলার হাকিম, কল্পনার প্রাসাদের বন্দী স্বয়ং কবি। তুলার হাকিম স্বকৃত স্বপ্ন-সাহারার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে লালসার ও রূপের মরীচিকা দেখিতে পায় আর এখানে স্বয়ং কবি স্বপ্নপুরীর বদ্ধদ্বারের বাহিরে বসিয়া সৌন্দর্য ও চিরযৌবনের আভাস পাইতে থাকেন।

এতদিনে সেথা বন বনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্তে বসেছে নবীন ভূপতি।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী।
আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্না যামিনী।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহুবন্ধনে
ধ্বনিছে শূন্যে জয়সঙ্গীত-রাগিণী।[৩]

মানবজগৎ ও নিসর্গজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া স্বপ্নকারাগার রচিত। বর্ষায় মেঘময় ইঙ্গিতে কালিদাসের নায়ক-নায়িকারা একে একে দেখা দিতে থাকে, মেঘগর্জনে সেকালের মৃদঙ্গ মুরলী ধ্বনিত হইয়া ওঠে; আর একসঙ্গে চকিত হইতে থাকে প্রত্যাসন্ন আকাশের বিদ্যুৎ, জনপদবধূদের নয়ন এবং নৃত্যললিত কটিতটের স্বর্ণরশনা! মনোরম কারাগারের মনোহর বন্ধনদশা! কেবল ইহার সেই দিকের গবাক্ষটি

২ বর্ষামঙ্গল, চৌরপঞ্চাশিকা, স্বপ্ন, মদনভস্মের পূর্বে, মদনভস্মের পর, অসময়, ভগ্নমন্দির।

৩ অসময়, কল্পনা

উন্মুক্ত যেদিকে স্বপ্নের পটে উজ্জয়িনীপুর।

কালিদাসের নায়িকাদের মধ্যেই আছেন কবির প্রেয়সী। স্মৃতির প্রদোষে পথ হাতড়াইয়া অবশেষে প্রেয়সীর ভবনে কবি উপস্থিত হইলেন, প্রেয়সীও দেখা দিলেন।

নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি
"হে বন্ধু আছ তো ভালো?" মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি!...

মেহের আলির কণ্ঠে সতর্কতার লৌহ-ঘণ্টার প্রথম ধ্বনি বাজিয়া উঠিল—'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।' "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি" —'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।'

এ উজ্জয়িনীপুরী যতই সৌন্দর্যময়, যতই মাধুর্যময় হোক—এ স্বপ্নপুরী মাত্র, বাস্তব মানুষের পা রাখিবার যোগ্য কঠিন মাটি এখানে নাই।

ভগ্নমন্দির কবিতায় মেহের আলির চরম সতর্কধ্বনি বাদিত হইয়াছে।

ভাঙা দেউলের দেবতা।
কত উৎসব হইল নীরব
কত পূজা-নিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা,
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।[৪]

সেদিনের আদর্শ আজ ভগ্ন মন্দির, দেববিগ্রহ আছে সত্য, কিন্তু নাই পূজারী, নাই পূজার্থী; নাই পূজার মন্ত্র জানা, "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি"। তুলার হাকিমের মতো কবিও রক্ষা পাইয়াছেন স্বপ্নগ্রাস

৪ ভগ্নমন্দির, কল্পনা

হইতে, কারণ দুজনের মধ্যেই কোথায় একটুখানি অবিশ্বাসের ভাব ছিল। খুব সম্ভব "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি" কথা কয়টিতে কবির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে লৌকিক জগতের দরজার চাবি খুলিবার শব্দ। আর এই শব্দটির স্মৃতি তিনি চৈতন্যের তলে বহন করিয়াছেন দীর্ঘকাল। একদিন ঐ শব্দের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই তিনি 'প্রাচীন ভারতে'র আদর্শলোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মুক্তি পাইয়াছেন বাস্তব ভারতের কঠিন মাটির উপরে। কাজেই এই কাব্যত্রয় প্রসঙ্গে "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঐ শব্দক'টির মধ্যে আছে মুক্তির মন্ত্র।

॥ ৩ ॥

কথা কাব্যের অধিকাংশ কবিতা এই পর্বে লিখিত। বৈদিক ভারত, রাজপুত ও মুঘল ইতিহাস হইতে কবি বীরত্ব ও মহত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমর কাব্য রচনা করিয়াছেন।[৫]

ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ও বীরত্বের নিদর্শন ইতিহাসের যে-কোন পর্বে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমষ্টিগত মহত্ত্ব সূচিত হয় কি না সন্দেহ। বুদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহ কিন্তু ইহাও তেমনি নিঃসন্দেহ যে তৎকালে তাঁহাকে নিন্দা করিবার, এমন কি তাঁহাকে আঘাত করিবার লোকের অভাব ছিল না। দুর্গেশ দুমরাজ নিঃসন্দেহ বীরপুরুষ ছিল, কিন্তু মাধাজী সিন্ধিয়াও কি মহৎ ছিল? অবশ্য তাহার বীরত্বে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কিন্তু সে বীরত্বে মহত্ত্বের উপাদান ছিল কি? দুর্গেশ দুমরাজের প্রাণদান একটা স্মরণীয় ঘটনা সত্য। কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের যে-কোন একটা পল্টনে এমন অগুনতি

---

৫ বাঙালীর ইতিহাস বাদ পড়িল কেন? বাঙালী খুব কাছে বলিয়াই কি দূরত্বের মোহাঞ্জন সৃষ্টিতে বাধা পড়িয়াছে? প্রাত্যহিক মানুষকে 'আদর্শ মানুষে' পরিণত করা কঠিন বলিয়াই কি?

মহৎ বীরত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়—বস্তুত অবিরল বলিয়াই কেহ তাহার সব টুকিয়া রাখে নাই। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, কবির মনের মধ্যেই তখন একটা আদর্শ সন্ধানের তাগিদ দেখা দিয়াছে—তাই দূরকালের কতকগুলি লোক ও ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কবি একটি আদর্শ জগৎ গড়িয়াছেন, কাজের সুবিধার জন্য আমরা যাহার নামকরণ করিয়াছি 'প্রাচীন ভারত'।

॥ ৪ ॥

নৈবেদ্য কাব্যে নানাশ্রেণীর কবিতা আছে।[৬] নৈবেদ্যের কবিতাগুলিতে যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে একদিকে তাহা যেমন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অনুরূপ অভিজ্ঞতার তুলনায় অগভীর তেমনি আর একদিকে পূর্বতন ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির তুলনায় যথেষ্ট গভীর। পূর্বতন ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে গীতাঞ্জলি প্রভৃতির অভিজ্ঞতায় পৌঁছিবার মাঝখানে নৈবেদ্যের অভিজ্ঞতা। গভীরতর অভিজ্ঞতায় প্রবেশের জন্য তাঁহার একটা প্রেরণার আবশ্যক ছিল। নৈবেদ্য সেই প্রেরণাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এ প্রেরণা আসিয়াছে গৌণত তাঁহার পিতার জীবন হইতে (১৬ সংখ্যক কবিতা স্মরণীয়) আর মুখ্যত প্রাচীন যুগের ঋষি পিতামহগণের জীবন হইতে। প্রধানত অপরের অভিজ্ঞতার কুম্ভ অবলম্বন করিয়া এখানে কবি আধ্যাত্মিক মহাসমুদ্রে ভাসমান, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে তাঁহার অবলম্বন আবশ্যক হয় নাই,

৬ মোট একশটি কবিতা, তন্মধ্যে প্রথম একুশটি ও শততমটি ধর্মসঙ্গীত, সকলগুলির মূল্য সমান নয়। বাকি থাকিল আটাত্তরটি সনেট। ইহাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিসম্বন্ধের কথা, কতক স্বদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও বর্তমান দুরবস্থার কথা, কতকগুলিতে বিশ্ববোধজনিত অভিজ্ঞতার কথা। বাকি অনেকগুলি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সম্পর্কিত। ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৯, ৮০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬ প্রভৃতি সনেট এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

বারে বারে ঋষি পিতামহদের নজীর উদ্ধার করিবার প্রয়োজন তখন অতিক্রান্ত। নৈবেদ্যে যাহা পরোক্ষ পরবর্তী গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে তাহা একান্ত প্রত্যক্ষ। ঔপনিষদ ধর্ম সম্বন্ধে কবি যৌবনারম্ভ হইতেই সচেতন, কারণ তাহাই হইতেছে মহর্ষির সাধনা ও ব্রহ্মধর্মের ভিত্তি। নৈবেদ্যে আসিয়া সেই ঔপনিষদ ধর্ম আর ভারতের মহত্ত্ব একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত দুয়ের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বেশ কিছুকাল হইল কবির মনে 'প্রাচীন ভারত' সম্পর্কিত একটি মনোহর কুজ্ঝটিকা জমিয়া উঠিতেছিল, এবারে নৈবেদ্য কাব্যে বর্ণিত আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব তাহার সহিত যুক্ত হওয়াতে যেন তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারতে'র অনুরূপ হইতেছে শেলির 'হেলাস' বা প্রাচীন গ্রীস। শেলি মনে মনে কাল্পনিক উপাদানে একটি আদর্শ জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন 'হেলাস' বা প্রাচীন গ্রীস, নামসাম্যে বস্তুসাম্য ঘটিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সমকালীন রাজকীয় ও ধর্মীয় অত্যাচার ও অবিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতির প্রতিষেধক ও পরিপূরক সেই আদর্শ জগৎ বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। বস্তুত শেলি-রচিত আদর্শ-লোকের সহিত বাস্তব গ্রীসের সম্বন্ধ অতিশয় ক্ষীণ, অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন গ্রীস শেলি-পরিকল্পিত প্রগতির পরিপন্থী।[১]

১ প্রাচীন গ্রীস হাতের কাছে ছিল না—তাই তিনি আর একটি 'আদর্শ জগৎ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ভারতীয় সামন্তরাজ্য। তাঁহার একবার খেয়াল হইয়াছিল যে, দগ্ধ পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় কোন সামন্তরাজ্যে চাকুরি গ্রহণ করিবেন। উনিশ শতকের ভারতীয় সামন্তরাজ্যগুলি যে কি পদার্থ ছিল (বিংশ শতকেও যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই) তাহার বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। শেলি এক সপ্তাহকালও টিকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর প্রাচীন গ্রীসে, মনে করা

কল্পনা-কথা-নৈবেদ্য কাব্যে বর্ণিত ও সমকালীন প্রবন্ধাদিতে ব্যাখ্যাত 'প্রাচীন ভারত' কোনকালে কোনখানে ছিল না। উহা সার টমাস মোরের Utopia, প্লেটোর রিপাবলিক, শেলির হেলাস, বৈষ্ণব কবিদের বৃন্দাবন, কালিদাসের তপোবন বা অলকার মতো একটি মনোরম পরিকল্পনা। কবির কল্পনা করিতে ক্ষতি নাই, কল্পনাই তো কবির ধর্ম, পূর্বোক্ত কবিকল্পনা মানুষের সম্ভব-অসম্ভবের সীমানায় অনেক রদবদল করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কল্পনাকে বাস্তবের আসন দিলেই সমস্যার সূত্রপাত হয়। বাস্তবের মূল্যে কল্পনাকে হাটে বেচিতে গিয়া কবির প্রাণান্ত ঘটে। গ্রাহক যতই কমিতে থাকে কল্পনাকে মনোরমতম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ততই অধিকতর অবাস্তব করিয়া তুলিতে হয়। অন্য পক্ষে কবির আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া গ্রাহক মেকি মুদ্রাগুলি বাজারে আনিয়া উপস্থিত করে, শেষ পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় অসম্ভব হইয়া পড়িয়া লেনদেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা দেশের আইডিয়ার বাজারে এই রকম একটা সঙ্কট দেখা দিয়াছিল।[৮] রবীন্দ্রনাথ এই বাজারের সর্বপ্রধান বিক্রেতা ছিলেন, কারণ সাহিত্য-ঐশ্বর্যে ভূষিত হওয়ায় তাঁহার আইডিয়ার চাহিদা ছিল সবচেয়ে অধিক। এ সঙ্কটের বিস্তারিত বিবরণ রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়—কেবল রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যতখানি বলা আবশ্যক বলিব।

যাক পেরিক্লিসের এথেন্সে, গেলে তিনি স্বেচ্ছায় বিষপান করিতে বাধ্য হইয়া সক্রেটিসের পূর্বদৃষ্টান্তে পরিণত হইতেন।

৮ এই সঙ্কটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সময়টাকে বুঝিতে পারিলে পরবর্তীকালের গতিপ্রকৃতি বোঝা সহজ হইবে। বর্তমান কালকে বুঝিবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস অধ্যয়ন। এ বিবরণ লিখিত হইলে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব, সতীশ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বহু মনীষীর আত্মিক বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

॥ ৫ ॥

আদর্শ নির্মম প্রভু। একবার তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিলে আর রক্ষা নাই, আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আত্মোৎসর্গের শেষ সীমা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়, তাহার পরিণাম হয়—কুঠার নয় ক্রুশ নয়—নির্বাসন বা অবহেলা, সাময়িক বিচার-বিভ্রাট তো বেকসুর খালাসের সামিল। এই নির্মম প্রভুর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সাময়িকভাবে বিচার-বিভ্রাট মাত্র ঘটিয়াছিল। বিচার-বিভ্রাটের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। আদর্শকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ—ইহাই বিভ্রাটের মূল কথা। আর এই মৌলিক বিভ্রান্তি হইতে পরবর্তী যাবতীয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি। 'প্রাচীন ভারত' যদি আজিকার অধঃপতিত ভারতের পূর্বরূপ হয়, দুয়ের মধ্যে ইতিহাসের বন্ধন যদি ছিন্ন না হইয়া থাকে তবে এদেশের পক্ষে পুনরায় পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। সামাজিক সাধনার কোন্ সোপানে প্রাচীন মহত্ত্ব সম্ভব হইয়াছিল—না, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ ও হিন্দুশাস্ত্র ও সংহিতার বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন। এই রকম একটি যুক্তিজাল কবির মনকে আশ্রয় করিয়াছিল।[১] রবীন্দ্রনাথের মুখে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্র সংহিতার সমর্থন নিতান্ত বিস্ময়কর। এতই বিস্ময়কর যে এ ইতিহাস বিবৃত করাকে অনেকে শিষ্টাচারসঙ্গত নয় বলিয়াও মনে করিতে পারেন। তবু কবির মানসিক ইতিহাস বিবৃত করা ছাড়া উপায় নাই—কবির মনের গাতপ্রকৃতি বুঝিবার জন্যই ইহার

১ শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, তৎকালের অনেক মনীষীকে এই রকম একটা ধারণায় পাইয়া বসিয়াছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের বেলায় ব্যাপারটা বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মশাখাভুক্ত ব্যক্তি; আচার-অনুষ্ঠানের দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া তাঁহাদের নৌকা অনেক আগেই অন্য ঘাটে ভিড়িয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, যুগের হাওয়া প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক কবির মুখে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও শাস্ত্র সংহিতা যদি বিস্ময়কর হয়, তবে এই অবাস্তব ধারণা হইতে তাঁহার মুক্তি আরও বিস্ময়কর। মোহের ইতিহাস না জানিলে মুক্তির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে।

যাই হোক, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্র সংহিতার যে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ প্রাচীন ভারতের গুরুত্বের উপলব্ধি; পরোক্ষ কারণ আধুনিক ভারতকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে নামিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

> রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও বর্ণাশ্রমকে ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; উপনিষদের সাধনার মধ্যে সর্বসাধনার মিলন হইতে পারে। তজ্জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তাহা তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তিনি কবি, তাই কবিসুলভ সরল কল্পনা বলে কবি কালিদাসের ন্যায় তপোবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। দেশবাসীকে তিনি যে বিদ্যালয়ে আহ্বান করিলেন, তাহা 'বোর্ডিং স্কুল' নহে। তাহা তপোবন, সেখানে ছাত্রেরা মাস্টারের কাছে বিদ্যা শিখিবে না, শিষ্যেরা গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে। কালিদাসের তপোবন ও উপনিষদের আরণ্যক আশ্রমের সংমিশ্রণে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিকল্পিত হইল।[১০]

উক্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাতার মনোভাব জানিতে পারিলেই বর্ণাশ্রম ও শাস্ত্র সংহিতার সমর্থনে তিনি যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারেন জানিতে পারা যাইবে।

> শান্তিনিকেতনের পরিচালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই মাসের মধ্যে দেখা দিল। অশান্তি বাধিল কবির অনুমোদিত, ব্যাখ্যাত, আদর্শীকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম লইয়া। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়

১০ রবীন্দ্রজীবনী—পৃ ৯, ২য় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়

নিয়ম হয় যে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কি না, তাই লইয়া সমস্যার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বাবুকে লিখিতেছেন—'প্রণাম সম্বন্ধে আপনাদের মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্রেরা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।' কিন্তু কবির মনের দ্বিধা যায় না, তাই লিখিলেন যে অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথায়ও নাই? তাঁহার মত তখন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলের মতের প্রতিধ্বনিমাত্র, যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে 'আশ্রমে' স্থান দেওয়া যাইতে পারে না এই ছিল প্রতিষ্ঠাকালের মত। বিদ্যালয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিবার ও মানাইবার চেষ্টা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই ছিল। ভোজনশালায় পঙ্‌ক্তি বিচার করিয়া, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ করিয়া সকলে আহার করিতেন।[১১]

এ বিষয়ে অন্যক্ষেত্র হইতে আরো উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা গ্রহণের মূলে কবির একটি প্রধান অভিপ্রায় ছিল হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা,—যে হিন্দুত্ব শাস্ত্র সংহিতা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিয়াও কিম্বা মানিয়াই মহৎ। কবির এইসময়কার মনের বিস্তৃততর ইতিহাস যাঁহারা জানিতে উৎসুক, রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত প্রথম তিন পরিচ্ছেদ পড়িলে উপকৃত হইবেন।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন—

> নৈবেদ্য কাব্যের সহিত বিনোদিনীর কাহিনী ও বর্ণাশ্রমধর্মের যোগ যে কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।[১২]

সেই যোগসূত্র অনুসরণের চেষ্টাই এতক্ষণ করিতেছি। কবির

১১ রবীন্দ্রজীবনী—পৃ ৪১-৪২, ২য় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়

১২ রবীন্দ্রজীবনী—পৃ ২২, ২য় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাস নৈবেদ্যে ব্যাখ্যাত আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের মূলে বর্ণাশ্রমধর্ম ও শাস্ত্রসংহিতার অনুশাসন। আবার যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম ও শাস্ত্র-সংহিতার অনুশাসনে বিশ্বাসী তাঁহার পক্ষে বিনোদিনীর বাসনার আগুন লইয়া লঙ্কাকাণ্ড বাধানো অসম্ভব, এমন কি নষ্টনীড়কে শেষ পর্যন্ত চরম দুর্গতির মধ্যে টানিয়া লইতেও বাধে। আর নৌকাডুবি উপন্যাস রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে একমাত্র তিনিই লিখিতে পারেন—

> স্বামীর সম্বন্ধে নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।[১৩]

হিন্দুশাস্ত্রসংহিতার অনুশাসন কমলার বেশ মজ্জাগত বলিয়াই অনায়াসে হিন্দুপত্নীত্বের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আদর্শ হিন্দুনারীরূপে অঙ্কিত করিতে গিয়া মানুষের সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক গতি যে লঙ্ঘিত হইতেছে সে বিষয়ে লেখক রচনাকালে কি সচেতন ছিলেন? পরবর্তী উপন্যাস গোরাতে এই প্রভাবের জের। তবে এই প্রভাব হইতে মুক্তিলাভটাই গোরা উপন্যাসের আসল কথা। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই অবাঞ্ছিত প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

সেকালের মনীষিগণ আদর্শ ও বাস্তবকে সমমূল্যের মনে করিতেন বলিয়াই হিন্দুত্বকে মনুষ্যত্ব, হিন্দু আচারকে মানবধর্ম এবং হিন্দু জাতিগৌরবকে ভারতীয় জাতিগৌরব বলিয়া মনে করিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্তা পরবর্তী ভারতীয় চিন্তা-ধারা ও জাতীয় চেষ্টাকে এমন এক তির্যক গতি দান করিয়াছিল যে, তাহা এখন পর্যন্ত সরল রেখায় চলিতে শিখিল না। তপোবন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি অবাস্তব আদর্শের টানে অদ্যাবধি আমাদের জীবনসমুদ্র ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া ওঠে।

১৩ নৌকাডুবি, ভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড

যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধ যুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি…মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, ইহাই আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।[১৪]

বৈদিক যুগে তপোবন ও বৌদ্ধযুগে নালন্দা সম্ভব, আমাদের যুগেই বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সম্ভব না হইবে কেন? নিশ্চয় সম্ভব হইবে, কিন্তু তাহা আর একটা তপোবন বা আর একটা নালন্দা হইবে না; আধুনিক যুগধর্মের প্রভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা কিছু হইবে। বৌদ্ধযুগ যেমন তপোবনের অনুসরণ করে নাই, নালন্দা গড়িয়াছে, আমরাও তেমনি নূতন কিছু গড়িব, তপোবনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়িব না বা নালন্দার অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা করিয়া অকারণ অনুকরণে শক্তির অপব্যয় করিব না। এসব কথা আজকের দিনে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে, বিস্ময় লাগে যে তখনকার দিনে মনীষিগণ বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

'প্রাচীন ভারত' যতই মনোরম হোক তাহা কল্পনা কাব্যের 'ভগ্নমন্দির' মাত্র; তাহার সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও পবিত্রতা সকলেই স্বীকার করিবে কিন্তু আর সেখানে পূজার্থীর ভিড় জমিবে না, বোধ করি সেদিনের পূজার মন্ত্রও আজ বিস্মৃত। "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।" সেই প্রাচীন মনোরমের আকর্ষণে মাঝে মাঝে আমাদের চিত্ত স্বপ্নের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়; ভাগ্যগুণে কখনো কখনো তাহার সাক্ষাৎকারও ঘটে; কিন্তু যখন তাহার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরের উত্তর দিতে চাই তখন দেখি যে "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।"

১৪ সতীশচন্দ্র রায়ের গুরুদক্ষিণা পুস্তকের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা; রবীন্দ্র-জীবনী পৃ ৩২, ২য় খণ্ড

'প্রাচীন ভারত' একটি মনোরম আইডিয়া মাত্র। এই আইডিয়ার রসে লালিত কল্পনা, কথা ও নৈবেদ্য উচ্চাঙ্গের কাব্য। কিন্তু যেখানেই কবি আইডিয়াকে বাস্তবের সমমূল্য দান করিয়াছেন আর তাহার ইঙ্গিতে কর্মপ্রচেষ্টা চালিত করিয়াছেন সেখানেই অবাঞ্ছিত ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও আইডিয়ার জগতে বন্দীর কানে বাস্তব জগতের সতর্কবাণী বহন করিয়া কখনো কখনো প্রবেশ করিয়াছে—"সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।"

অষ্টম অধ্যায়

"শুধু অকারণ পুলকে"

॥ ১ ॥

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির পরে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা অতীতকালে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এইসময়কার কাব্যগুলি অতীতের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ (কথা—১৯০০, ক্ষণিকা—১৯০০, কল্পনা—১৯০০, কাহিনী—১৯০০, নৈবেদ্য—১৯০১)। যখন তাঁহার কবিকল্পনা অতীত ভারতে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে 'ক্ষণিকা'র মতো কাব্যের রচনা বিশেষ বিস্ময়কর। এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যের সহিত ক্ষণিকার তুলনা করিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, স্থূল প্রমাণে না জানিলে এক হাতের ও এক মনের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধে। এমন যে সম্ভব হয়, তার কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহা একই সময়ে বিষমের ধারণা ও চর্চা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ কারণ বিদ্যমান। সেই বিশেষ কারণের বিস্তারসাধনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, নহিলে ক্ষণিকার স্বতন্ত্র আলোচনায় নূতন প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির বাস্তবলোকের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার কল্পনা যে-মানসলোকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা অতীত-ভারত, এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে। সেই মানসলোকের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার কল্পনা আবার বাস্তবলোকে ফিরিয়া আসিবে, যথাসময়ে দেখিতে পাইব। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে রবীন্দ্র-কল্পনার একটি স্বাভাবিক ধর্ম তাহাও আগে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঠিক যখন তাঁহার কল্পনা অতীতকালে ভ্রমণে নিযুক্ত ছিল, তখন তিনি

একেবারে বাস্তবস্পর্শবিবিক্ত ছিলেন না, একটি অঙ্গুলির দ্বারা প্রত্যহের পৃথিবীকে যেন স্পর্শ করিয়া ছিলেন। ক্ষণিকাতে পাই সেই অঙ্গুলিস্পৃষ্ট বাস্তবের স্পর্শ। এইজন্যই কাব্যখানিকে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা বলিয়াছি। কল্পনার দিব্যরথে কবি চলিয়াছেন কালিদাসের উজ্জয়িনাতে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভারতের গৌরবকাহিনী-আকীর্ণ রাজপথে, প্রাচীন আর্যঋষিগণের অধ্যাত্মঅভিজ্ঞতাপূত তপোবনচ্ছায়ায়, তখন, তখনো তাঁহার উত্তরীয়প্রান্ত পদ্মাতীরের অতিপরিচিত তরুরাজি ও কুটিরের শীর্ষে বিলুণ্ঠিত। ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা পড়িলে এ-কথা মনে না হইয়া যায় না। বইখানা যেন 'ছিন্নপত্রে'র এপিঠ-ওপিঠ, দুটিকে পিঠোপিঠি ভাই-বোন মনে করিতে বাধা নাই, তাহাদের মুখেচোখে ও ভাষায় জনকপরিচয় বেশ স্পষ্ট। অথচ ছিন্নপত্রের জগৎ হইতে কল্পনা, নৈবেদ্য, কথার জগতের দূরত্ব অপরিসীম।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ক্ষণিকা সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"জীবনের অতীতস্মৃতি ও অলীক কল্পনার মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া আজ তাহাকেই ভুলিবার জন্য কবির আপ্রাণ চেষ্টা।" তাঁহার এই মন্তব্য সত্যের সম্পূর্ণ রূপ নয়। প্রথমত 'জীবনের অতীত স্মৃতি ও অলীক কল্পনার' মধ্যে কবি বাস করিতেছিলেন না, আবার কল্পনাও অলীক নয়। ব্যক্তিগত জীবনের অতীত বা অনতি-অতীত স্মৃতি এখানে কবির উপজীব্য নয়, জাতির প্রাচীন মানসিক সত্তা তাঁহার কাব্যের প্রধান উপজীব্য। আর কল্পনাই বা অলীক হইবে কেন? বর্তমানের উপলব্ধিতেও তো কল্পনার আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, মানস-ভ্রমণের কাব্যগুলি রচনা শেষ করিয়া যে তিনি ক্ষণিকায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নয়, দুই শ্রেণীর কাব্যই সমকালে সমতালে রচিত হইতেছিল। কাজেই এখানে 'বন্ধন ছিন্ন করার প্রয়াসের' প্রশ্ন ওঠে না। তবে যে এমন বিষমকাব্য এমন সমতালে লিখিত হইতেছিল তাহার কারণ রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রকৃতির

বিশিষ্টতায়, কখনো কোনো কারণেই তাঁহার কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবস্পর্শবিবিক্ত হয় না, পুষ্পক রথে বিচরণ করিবার সময়েও বিলুণ্ঠিত উত্তরীয়ে ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে, অসীমের সন্ধানে দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়াই আবার দ্রুততরবেগে সীমার দিকে ফিরিয়া আসে। সমকালীন কাব্যগুলি মনে রাখিয়া ক্ষণিকা পড়িলে তাহার রসোপলব্ধি ঘনতর হইয়া উঠিবে, মনে হইবে অসীমের নীলকান্তপটে-অঙ্কিত 'অতিপরিচিত অবজ্ঞার'-কণ্টক-বিমুক্ত আমাদের অতিপরিচিত দৃশ্যাবলী দেখিতেছি।

॥ ২ ॥

প্রাচীনকালের ভাবলোক হইতে দৃষ্ট হইয়া পরিচিত পদ্মাতীরের দৃশ্যগুলি বড় সুন্দর ও অর্থপূর্ণ প্রতিভাত হইয়াছে। এইসব দৃশ্যই কবি দেখিয়াছেন পদ্মায় বোটে-ভাসমান অবস্থায়। কাছের দেখায় ও দূরের দেখায় প্রভেদ থাকিবেই। কাছের দেখার বিবরণ ছিন্নপত্র, দূরের দেখার বিবরণ ক্ষণিকা। ছিন্নপত্রের বিবরণও সুন্দর, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে কাঁটা জুড়িয়া দিয়াছে কাছের দেখা; ক্ষণিকার বিবরণ নিষ্কণ্টক সুন্দর, দূরের হস্তার্পণে কণ্টক কখন উন্মোচিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

প্রাচীনকালের ভাবলোক, সৌন্দর্যে মহত্ত্বে অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতায় পূর্ণ জগৎ দর্শকের উপরে গুরুতর দাবি করে, বলে—কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাসযোগে বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট নয়, বলে—ঐ সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সহিত জীবনটিকে মিলাইয়া লইতে হইবে। দর্শকও প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে উদ্বোধিত করিয়া বলে,

হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সত্তায়
মোরে করি দাও সভাকবি।[১]

১ রাত্রি, কল্পনা

বলে—

মহান্ মৃত্যুর সাথে
মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।[২]

বলে—

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে উর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সু-দুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে।[৩]

এ-দাবি দীর্ঘকাল বহন করা কঠিন, উচ্চগ্রামে বাঁধা সুর ক্ষণে ক্ষণে নামিয়া পড়ে, নামিয়া পড়িয়া সহজ স্বচ্ছন্দ মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে। ক্ষণিকা কাব্য সেই সহজ স্বচ্ছন্দ মুক্তির অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কোন আদর্শের জন্য নয়, মহত্ত্বলাভের জন্য নয়, অতিপ্রাকৃত কোন সিদ্ধির জন্য নয়, শুধু বাঁচিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকা, বাঁচিবার অকারণ আনন্দকে বুকের রত্নহারের মতো দোলায়িত করা—ইহাই ক্ষণিকার মূল কথা, আবার ইহার মূলে আছে কল্পনা-নৈবেদ্য-কাহিনী-কথা কাব্যের প্রতিক্রিয়া।

ক্ষণিকা কাব্যের ভূমিকারূপী 'উদ্বোধন' কবিতাটিতে এই ভাবটিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"শুধু অকারণ পুলকে"।

কাহিনী ও কথা কাব্যে স্মৃতির সেতুবন্ধন প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যেন তিনি বলিয়াছেন—

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।[৪]

২ বর্ষশেষ, কল্পনা

৩ ৫১-সংখ্যক, নৈবেদ্য

৪ উদ্বোধন, ক্ষণিকা

আবার নৈবেদ্য কাব্যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার গভীর গুহায় প্রবেশের দুশ্চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন বলিয়াছেন—

বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা, চাই না খুঁজিতে।[৫]

তৎপরিবর্তে—

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহাকে ডেকে নে রে বুকে—[৬]

আর,—

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।[৭]

এবারে ভূমিকার ঘনীভূত ভাবটি কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কি ভাবে বিস্তারিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যাক।

কল্পনার কতকগুলি কবিতা লইয়া ক্ষণিকার কয়েকটি কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়া যাক। প্রথমে কালিদাস-সম্পর্কিত কবিতাগুলি। কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি 'পূর্বজনমের প্রিয়া' মালবিকার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কালিদাসের হাতে সাজানো অপরূপ তার মূর্তি। কিন্তু হইলে কি হয়—

৫ উদ্বোধন, ক্ষণিকা
৬ উদ্বোধন, ক্ষণিকা
৭ উদ্বোধন, ক্ষণিকা

মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
হে বন্ধু আছ তো ভালো? মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।[৮]

কালিদাসের কাল যতই রম্য হোক, কালিদাসের মালবিকা যতই রমণীয় হোক—দুর্লঙ্ঘ্যতম সত্য হইতেছে 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।' তাই অনিবার্য পরিণাম হইতেছে 'অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে'।

এবারে ক্ষণিকা কাব্যের 'সেকাল'। কালিদাসের কাল মনোরম সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালে পুনঃপ্রবেশ সম্ভব নয় বলিয়াই কাঁদিয়া মরিতে হইবে, এমন কি কথা। কালিদাসের নিপুণিকা, চতুরিকা, মালবিকাদের সাক্ষাৎ পাইলে মন্দ হইত না, কিন্তু অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটিয়া মরিয়া লাভ কি! তাছাড়া—

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে
মন্দ তারা লাগতো না কেউ
কালিদাসের চোখে।
...
আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।[৯]

৮ স্বপ্ন, কল্পনা

৯ সেকাল, ক্ষণিকা

এ সেই নিছক বাঁচিয়া থাকার অকারণ পুলক। একই সময়ে একই বিষয়ে লিখিত দুইটি কবিতায় কবির দুই মেজাজ। সীমার জগৎ হইতে প্রাচীন ভাবলোক দেখিয়া যেমন মধুর মনে হইয়াছে, তেমনি আবার মধুর মনে হইয়াছে সীমার জগৎকে ভাবলোকের সীমাহীনতা হইতে দেখিয়া। পর্বে পর্বে দৃষ্টির এই কোটি-বিনিময় রবীন্দ্রকাব্যের একটি নিগূঢ় রহস্য।

আবার লওয়া যাক কল্পনা কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটি। এ-মেঘ, এ-বর্ষা, এ-জনপদবধূ, সমস্তই কালিদাসের—রবীন্দ্রনাথ সেই যুগান্তরের মেঘবীথিকায় শতেক যুগের গীতিকা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। এ-বর্ষা কখনো কোনো বাস্তবলোকে ছিল না—না কালিদাসের কালে না রবীন্দ্রনাথের কালে। এর সঙ্গে মিলাইয়া দেখা যাক ক্ষণিকার বর্ষার কবিতাগুলি। 'আষাঢ়' ('নববর্ষা' ও 'আবির্ভাব' কবিতা দুইটি 'ক্ষণিকা' আসরে রবাহূত। ইহাদের যথাস্থান 'চিত্রা' বা 'সোনার তরী'তে)। এই কবিতায় যে-বর্ষা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা যে-কোন লোক নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দেখিতে পারে। এ-বর্ষা কালিদাসের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মনোরম। যে-লোক বীর বা মহৎ নয়, তাহারও জীবনের যেমন মূল্য আছে, এ-বর্ষার মূল্যও সেই পর্যায়ের। অকারণের পুলক, অকারণের মূল্য।

আবার 'কল্পনা'র প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে একটা অতিশয়োক্তি আছে—চড়া সুর, কড়া রঙের আতিশয্য।

> চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
> চরণে আমার বীণাঝঙ্কার বাজে কি ?
> ...
> মোর সুকুমার ললাটফলকে
> লেখা অসীমের তত্ত্ব,
> হে আমার চিরভক্ত
> একি সত্য।[১০]

১০ প্রণয়-প্রশ্ন, কল্পনা

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগনবিহারী।[১১]

এবারে ক্ষণিকার প্রেমের কবিতাগুলি দেখা যাক—

তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।
...
শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইকো তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা,
...
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি,
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।[১২]

এ-কবিতায় আতিশয্য নাই, চড়া রঙ নাই, ফিকে রঙের ঘাসের ফুল যেমন রোদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া চোখ এড়ায়, এ-প্রেমেরও সেই দশা—বাস্তবের সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছে—আছে বলিয়াই মনে হয় না, যদিচ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

'কল্পনা' কাব্যের একটি প্রধান সৌন্দর্য কাব্যের তথা নারীর বিচিত্র প্রসাধনকলা।

কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।[১৩]

১১ মানসপ্রতিমা, কল্পনা

১২ সোজাসুজি, ক্ষণিকা

১৩ বর্ষামঙ্গল, কল্পনা

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।[১৪]
...
আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্না-যামিনী।[১৫]

এ-হেন বিচিত্রকারুকলাময়ী রমণীদের পাশে ক্ষণিকার স্বল্প-বেশা রমণীগণ দাঁড়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতে পারে, কিন্তু কবির সে সঙ্কোচ নাই। তাঁহার যেন বিশ্বাস অলঙ্করণ সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তরায়। বাঁচিবার অকারণ পুলকের ন্যায় এখানেও অকারণ সৌন্দর্য, অকারণ প্রেম, সেইজন্যই তাহাদের মূল্য সমধিক।

যেমন আছ তেমনি এস
আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না-হয় বাঁকা হবে,
নাইবা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ,
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ।[১৬]

এই প্রসঙ্গে ক্ষণিকার নারীদের সহিত এই পর্বের অন্যান্য নারীদের তুলনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই তুলনার ফলে ক্ষণিকার সহজ রস, অকারণ পুলক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আশা করা যায়। কথা, কাহিনীর নাট্যকাব্য, কল্পনায় যে-সব পৌরাণিকী, ঐতিহাসিকী, কাল্পনিকী রমণীদের কবি অঙ্কিত করিতেছিলেন,

১৪ স্বপ্ন, কল্পনা
১৫ অসময়, কল্পনা
১৬ চিরায়মানা, ক্ষণিকা

তাহাদের তুলনায় ক্ষণিকার রমণীরা নিতান্ত নগণ্য। বস্তুত তাহারা ভিন্ন জগতের অধিবাসী। পূর্বোক্তগণের চিত্র কাব্য-ইতিহাসের সোনার ফ্রেমে বাঁধানো, শেষোক্তগণের চিত্রের একমাত্র ফ্রেম পল্লীকুটীরের ভাঙা দরজার চৌকাঠ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক,
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
আকাশ পানে হানি যুগলভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।[১৭]

হায়, কল্পনা কাব্যের 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না',—এরা একমেয়ে নয়, এদের প্রভেদ অলঙ্কারগত প্রভেদের অধিক। একজন বাস্তবের হাত হইতে গৃহীত, অন্যজন 'শতেক যুগের কবিদের' কল্পনার ঝরনায় পরিস্রুত হইয়া দিব্যমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে।

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।[১৮]
...
চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে।
...
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

—প্রভৃতি মেয়ের স্থান, একমাত্র স্থান, পদ্মানদীর সহজের কূলে। কবির মন যখন মানসভ্রমণ করিতেছিল, এরাই তাঁহার মনে বাস্তবের রস জোগাইয়া তাহাকে প্রাত্যহিক জগতের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই বাস্তবিকা রমণীর দিব্যমূর্তি অঙ্কিত ও দিব্যকীর্তি কথিত ক্ষণিকার 'কল্যাণী' কবিতাটিতে।

---

১৭ কৃষ্ণকলি, ক্ষণিকা

১৮ দুই বোন, ক্ষণিকা

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।[১৯]

যখন কবি কথা, কল্পনা, কাহিনীর তপোবনবাসিনী বীরাঙ্গনাদের অঙ্কিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এই সব সাদাসিধা কবিত্বগৌরবহীন রমণীদের আঁকিতে যে তাঁহার কলম কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহার কারণ কবি নিজেই বলিয়াছেন—

স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই
আমার অভিরুচি।[২০]

॥ ৪ ॥

এবারে দেখা যাইবে কল্পনা কাব্যের 'কবি'তে ও ক্ষণিকার 'কবি'তেও এই রকম গুরুতর প্রভেদ। কল্পনা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কবিকে একটি অভিনব পদবী দিয়াছেন, সে যেন ঠিক আমাদের মতো মাটির মানুষ নয়, আধিব্যাধিজরার অধীন নয়। সে দেবোপম ও দেবসঙ্গী। সেই আদিম জগতে শরীরী মদন যখন যুবজনের চিত্ত আকুল করিয়া ঘরে ঘরে ফিরিত, তখন

কিশোর কবি মুগ্ধছবি
বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।[২১]

আবার আদিমতর জগতে যখন শিল্পের সৃষ্টি হয় নাই, মানুষ যখন অনুভব মাত্র করিতে পারিত, প্রকাশের ক্ষমতা যখন তাহার করায়ত্ত হয় নাই, সেই সময় গোপনচারী কবি নিসর্গের অন্তঃপুরে

১৯ কল্যাণী, ক্ষণিকা
২০ তথাপি, ক্ষণিকা
২১ মদনভস্মের পূর্বে, কল্পনা

অনবধানে প্রবেশ করিয়া জগদ্ব্যাপী প্রণয়-রহস্য ফাঁস করিয়া দিয়াছিল :

হেন কালে কবি গাহিয়া উঠিল,
নরনারী শুন সবে,
কতকাল ধরে কী যে রহস্য
ঘটিছে নিখিল ভবে।[২২]

কল্পনা কাব্যের স্বপ্নচারী কবি বিশ্বের চরম রহস্য ভেদ করিবার আশায় আবেদন করিয়াছেন—

মোরে করো সভাকবি
ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা।[২৩]

এই হইতেছে কল্পনার 'কবি'র স্বরূপ। সে-কবির জীবন ও দায়িত্ব কল্পনা কাব্যের উচ্চ সুরে বাঁধা—সে সর্বতোভাবে সাধারণ মানুষের চেয়ে মাথায় ও শক্তিতে বড়।

কিন্তু ক্ষণিকা কাব্যে আসিয়া যে-কবির সাক্ষাৎ পাই, সে আমাদের মতোই, আমাদের জন্যই তার জীবনধারণ, বিশেষ কোন শক্তি যদিবা তাহার থাকে, তবে আমাদের কাছ হইতে তাহা সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

কাব্য পড়ে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখেনি মুখ,
দিবারাত্রি ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।[২৪]

এইখানে দেখা গেল, আমাদের কবি ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ

---

২২ প্রকাশ, কল্পনা

২৩ রাত্রি, কল্পনা

২৪ কবি, ক্ষণিকা

নাই। আগেই বলিয়াছি, কবি কেবল আমাদের মতো নন, আমাদের জন্যই তাঁর কবিজীবন ধারণ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার যতই ধরুক পাক।[২৫]

ক্ষণিকার কবি অলৌকিক বিভূতি গোপন করিয়া প্রত্যহের কিঞ্চিৎ-ধূলিমলিন বসনখানি পরিয়াছেন, তাঁহার গানও তথৈব, সংসারের মলিন-মধুর ঘটনার মধ্যে যথাস্থান সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কালিদাসের দোসর হন নাই বলিয়া তাঁহার ক্ষোভ নাই, মহাকাব্য রচনা করেন নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখ নাই, বরঞ্চ শনিমেখলার ন্যায় টুকরা মহাকাব্য তাঁহার প্রিয়ার মণিমেখলা রচনা করিয়াছে দেখিয়া তাঁহার কী উল্লাস।

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।[২৬]

আমি মণিমেখলা বলিয়াছি, কবি বলিতেছেন 'পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।' মেখলার স্থান ছাড়িয়া দিতে তিনি

২৫ কবির বয়স, ক্ষণিকা
২৬ ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা

রাজি নন, কবিদের কাণ্ডই আলাদা। সাধারণভাবে রবীন্দ্রকাব্য সেই ভগ্ন মহাকাব্যের টুকরা হইলেও বিশেষভাবে ক্ষণিকা মহাকাব্য-ভাঙা টুকরায় রচিত এক বিচিত্র মেখলা।

॥ ৫ ॥

ক্ষণিকাতে 'একটিমাত্র' নামে একটি কবিতা আছে। ক্ষণিকা কাব্যকে আমি যে-দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি তাহার সঙ্গে কবিতাটির বিশেষ সঙ্গতি আছে মনে হয়। এক ব্যক্তি একটি দুর্লভ আঙুরফল পাইয়াছিল। সেটিকে ভোগে না লাগাইয়া মুঠার মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিবার পর সারাদিনের শেষে সে আবিষ্কার করিল যে—

মুঠার মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুরফল।[২৭]

এই আঙুরফলটি কী? জীবনের অনাড়ম্বর সহজ সুখ ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকাংশ লোকে এই সহজ সুখটাকে প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার না করিয়া কোনো এক চরম মুহূর্তের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দেয়—পরে যখন মুঠা খুলিয়া বাহির করে, দেখিতে পায় যে

মুঠার মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুরফল।[২৮]

কবির মুঠার মধ্যেও আঙুরফল শুকাইয়া যাইতে পারিত, বিশেষ, তিনি যখন মানসভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। ইতিহাস, পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্য যখন তাঁহার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল তখন এই আশঙ্কাই স্বাভাবিক যে, আঙুরফলটি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। কবিতাটিতে যদিচ তিনি আঙুরফলটি নষ্ট হইবারই বিবরণ দিয়াছেন, ইহা সতর্কবাণীমাত্র। তাঁহার ক্ষেত্রে আঙুরফলটি শুকাইয়া নষ্ট হয় নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়—যখন তিনি

২৭ একটিমাত্র, ক্ষণিকা

২৮ একটিমাত্র, ক্ষণিকা

ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় বীথিকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনো তিনি 'খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিরহমিলনপূর্ণ' 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলিকে', বাস্তব জীবনকে অবহেলা করেন নাই, জীবনের সহজ সুখ ও অকারণ পুলক তাঁহার চিত্তকে নিত্যরসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। মানস-ভ্রমণের পর্বে লিখিত ক্ষণিকা কাব্য বাস্তবজীবনের সঙ্গে সেই যোগাযোগের সংবাদ বহন করিতেছে। ইতিহাস-পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের তুলনায় বাস্তবজীবন যত তুচ্ছ, যত বর্ণহীন, যত অনাড়ম্বর হোক না কেন, তাহার মধ্যে যে জীবনরস প্রবাহিত, তাহাই "অকারণ পুলকে" মানুষের সব দীনতা সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতে সক্ষম—ইহাই ক্ষণিকা কাব্যের বার্তা।

নবম অধ্যায়

"ঘরেও নহে পারেও নহে"

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যখানি একান্ত নিঃসঙ্গ, ইহার কোনো দোসর নাই। এমন নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধারণত দু-তিনটিতে মিলিয়া অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝাঁক বাঁধিয়া আসে—তাহারা এক জাতের পাখী, এক নীড়ের অধিবাসী, এক লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু খেয়া কাব্যের বেলায় দেখি সে নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহার সঙ্গী নাই, তাহার আশেপাশে আগেপিছে বৎসর কয়েকের ব্যবধানেও খুব উল্লেখযোগ্য কাব্য নাই।[১]

কাব্য নাই, কিন্তু কলমের অবসরও নাই, এই সময়টাতে অজস্র গদ্যরচনা—প্রধানত ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ যেন এই কয় বছর কবির কলম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকের কলম গ্রহণ করিয়াছেন। এই গদ্যরচনার দুস্তর প্রান্তর অতিক্রম করিতে করিতে এক-একবার ইহাকেই নিয়ম ও খেয়ার মতো কাব্যকেই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে থাকে। আসলে গদ্যের প্রান্তরটাই যে নিয়মের ব্যতিক্রম ইহা সব সময়ে মনে থাকে না। রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল জগতে এত বিস্তৃত এমন একটানা

১ খেয়া কাব্য প্রকাশ ১৯০৬ আষাঢ়। পূর্ববর্তী কাব্য : নৈবেদ্য ১৯০১, শিশু ও স্মরণ ১৯০৩ ; পরবর্তী কাব্য : গীতাঞ্জলি, প্রকাশ ১৯১০।

এ সব ছাড়া সামান্য কিছু গান ও কবিতা এই সময়ের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এই স্বল্পতা রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের ধর্ম নয়। পদ্যের প্রাচুর্যের স্থলে এই পর্বটায় দেখিতে পাওয়া যায় গদ্যের প্রাচুর্য।

গদ্যের প্রান্তর আগেও আর নাই, পরেও আর পাওয়া যাইবে না। অবশ্য পরবর্তীকালে পূরবী কাব্যের আশেপাশে আগেপিছে আর-একটি গদ্যরচনার প্রান্তর পাওয়া যাইবে, কিন্তু সে প্রান্তর এমন বিশাল নয়, আর পূরবী কাব্যখানাও এমন নিঃসঙ্গ নয়।[২]

এখন, খেয়ার এই নিঃসঙ্গতা মনে প্রশ্ন না জাগাইয়া পারে না, আর সেই প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া এই নিঃসঙ্গতা ও খেয়া কাব্যের রহস্য-কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

নিঃসঙ্গ খেয়া কাব্যের দোসর নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার তুলনা আছে। বাংলাদেশের জনমানবহীন বৃক্ষবনস্পতিহীন বিশাল প্রান্তরের প্রান্তে নদীতীরবর্তী খেয়াঘাটের নিঃসঙ্গ ছায়াবটের রাজকীয় মহিমা খেয়া কাব্যের যথার্থ তুলনা। দূরদূরান্ত হইতে দৃশ্যমান, ক্লান্ত পথিকের লক্ষ্য, খেয়াযাত্রীর আশ্রয় এই ছায়াবট বাংলাদেশের বহুপরিচিত দৃশ্য। ইহাকে খেয়া কাব্যের তুলনা বলিলাম বটে কিন্তু আরও একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার আকাশের পটে যতই পোঁচের পর পোঁচ কালি বুলাইয়া দিতে থাকে পরিচিত ছায়াবট ততই রহস্যময় হইয়া ওঠে, অবশেষে এক সময়ে অন্ধকারের পটে তারাগুলি যখন পূর্ণ দীপ্যমান হইয়া ওঠে আমাদের পরিচিত ছায়াবট তখন দেখা-না-দেখার প্রান্তে, থাকা-না-থাকার প্রান্তে এক রহস্যভয়াল মূর্তি গ্রহণ করে ; তাহা আকাশের কি পৃথিবীর মন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না ; তাহার পরিচিত সত্তার মধ্যে কোথা হইতে যেন অপরিচয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়া দৈবী

২ পূরবী প্রকাশ ১৯২৫ শ্রাবণ ; পূর্ববর্তী কাব্য : পলাতকা ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ ১৯২২।

পূরবী যে খেয়া কাব্যের মতো নিঃসঙ্গ নয় তার প্রধান কারণ, এই সময় রবীন্দ্রকাব্য-জগতে পশলায়-পশলায় গানের বর্ষণ চলিতেছে। প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৯২৫) সেই দিব্যবারি সঞ্চিত।

সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ছায়াবট অবশ্যই খেয়া কাব্যের তুলনা, কিন্তু তাহা অন্ধকার নিশীথের ছায়াবট।

অন্ধকার নিশীথের উল্লেখ নিছক অলংকার মনে করিবার কারণ নাই—এ ক্ষেত্রে ইহা পরম বাস্তব, আর খেয়া কাব্যের ব্যাখ্যায় ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। খেয়া কাব্যে পঞ্চান্নটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে তেইশটি কবিতা, প্রায় অর্ধেক, রাত্রি-বিষয়ক। প্রদোষের তরল অন্ধকার, গভীর রাত্রির নিকষ অন্ধকার, শেষযামের ধূসর অন্ধকার এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো একখানি কাব্যে রাত্রির অন্ধকার এতগুলি কবিতার বিষয় হইয়া ওঠে নাই। এখানে আবার দেখি কবিস্বভাবের ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দেখিলেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এমন কেন হইল। কবির মনের মধ্যে কোনো কারণে অন্ধকার নামিয়াছে কি? মনের অন্ধকারকেই তিনি নিসর্গে ও মানবসংসারের যত্রতত্র দেখিতেছেন কি? যদি তাহাই হয় তবে আর-একটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইয়া ওঠে, কী সেই মনের অন্ধকার, কেন সেই মনের অন্ধকার। এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য যে, কবি চিরকাল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উষালোকের স্মৃতি মনের মধ্যে ধারণ ও বহন করিয়াছেন, আকাশের রবি তাঁহার মিতা, অন্ধকারের তিনি কেহ নহেন। তবে এখানে রাত্রির অন্ধকার এমন মুখ্যতা লাভ করিল কেন?

প্রথম কবিতাটি 'শেষ খেয়া', উপসংহারের কবিতাটি 'খেয়া', দুটিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার; অন্ধকারে কাব্যের সূচনা, অন্ধকারে সমাপ্তি। 'অনাবশ্যক' নামে অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাটিতে অন্ধকারকে প্রহরে প্রহরে চিহ্নিত করিয়া দেখা হইয়াছে, শোকাভিভূত ব্যক্তি যেমন কখনো কখনো স্মৃতির সিন্ধুক খুলিয়া শোকের মুদ্রাগুলি সযত্নে গণনা করে, অনেকটা তেমনি।

'গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো···ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে··· অমাবস্যা আঁধার দুইপহরে'। প্রথমে গোধূলি, তার পরে ভরা সাঁঝ,

অবশেষে একেবারে আঁধার দুই-পহর—তাহাও আবার অমাবস্যার। অন্ধকার একেবারে থরে থরে সজ্জিত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, 'লক্ষ দীপের' সূচিকাঘাতেও এ অন্ধকার অটুট। এ কেমন অন্ধকার, এ কিসের অন্ধকার?

আর-একটি কবিতা 'দিঘি'। দিঘির গভীর কালো বোবা জলের দিকে চাহিয়া কবির রাত্রির অন্ধকারকে মনে পড়িয়া যায়।—

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছ—
মাটির পিঞ্জর।[৩]

অন্ধকার মনের মধ্যে না থাকিলে সর্বত্র অন্ধকারের ছাপ তিনি দেখিবেন কেন?

প্রশ্ন অনেক তোলা হইয়াছে, এবারে একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাক।

॥ ২ ॥

ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর আগে আমরা কবিকে দেখিয়াছিলাম পদ্মাতীরের প্রসন্ন আলোকে, জীবন যেখানে উজ্জ্বল। সে জীবনের ভরা ফসল পাইয়াছি সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্যে। এমন অনেকদিন গেল, একটা যুগ। তার পরে কবির কল্পনা ক্রমে জীবনের প্রসন্ন আলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনকালের ছায়াচ্ছন্ন দুর্গম পথে প্রবেশ করিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও পুরাকালে মানসভ্রমণের ফলে কবি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন সে ফসল ভরা আছে কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে। অন্যত্র তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে

৩ দিঘি, খেয়া

কবিকল্পনা আবার যখন জীবনের প্রসন্ন আলোকে প্রত্যাবর্তন করিল, সেই পুরাতন পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসিল, তখন সব যেন কেমন ম্লান হইয়া গিয়াছে বোধ হইল কবির কাছে। যে কবি মানসভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন আর যে কবি প্রত্যাবর্তন করিলেন তাঁহারা যেন এক ব্যক্তি নন। সেদিন যাহাকে অভ্রান্ত মনে হইয়াছিল আজ তাহার ত্রুটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, সেদিনকার বৃহৎ আজ অকিঞ্চিৎকর, সেদিনকার বাস্তব আজ ছায়াময়, সেদিনকার সব প্রযত্ন প্রচেষ্টা আজ নিতান্ত নিরর্থক মনে হইল কবির কাছে। মানসভ্রমণে যে আদর্শলোককে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন আর যে বাস্তবলোক তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত এ দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? এ দুইকে মিলাইবার উপায় কোথায়? মানসভ্রমণের অন্তে কয়েক বছর তাঁহার কল্পনার জগতে আদর্শ ও বাস্তবের একটি নিদারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই সংঘর্ষের বিবরণ ও প্রমাণ খেয়া কাব্যে। আগেকার দিনে যাহাকে বাস্তব মনে হইয়াছিল তাহা অপসৃত, অথচ নূতনও কিছু গড়িয়া উঠিল না। কবি যেখানে পা রাখিতে যান দেখেন সেখানে শূন্যতা, যাহাকে ধরিতে যান দেখেন সেখানে আশ্রয় নাই। পুরাতন আশ্রয়ও যাহার গিয়াছে নূতন আশ্রয়ও যাহার গড়িয়া ওঠে নাই, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'—খেয়া সেই হতভাগ্যের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই দোটানা অভিজ্ঞতা একপ্রকার অনিশ্চয়তা, একপ্রকার অস্পষ্টতা—ইহা অন্ধকারের সমতুল। খেয়া কাব্যে অন্ধকার যে বহুস্থানে image-রূপে ব্যবহৃত তাহার মূল এইখানে।[৪]

৪ এই সময়ের এদিকে ওদিকে, ১৯০১ হইতে ১৯০৮-৯ সালের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও তৎসংক্রান্ত মতামতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর। ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইলে কবিজীবন সম্পর্কে, তথা খেয়া সম্বন্ধে, অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

॥ ৩ ॥

কিন্তু অন্ধকার ও অনিশ্চয়তাকে তো মানুষ চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে না ; অন্ধকারের মধ্যে আলোকের, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তার, সন্ধান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তখন আলোর ও নিশ্চয়তার সন্ধানে সে অন্তরের মধ্যে তাকায়। অবসৃত পরিচিত জগতের স্থানে ও বদলে তখন সে একটা নূতন জগৎ গড়িতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টা অনেকটা বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ গঠন-চেষ্টার অনুরূপ। বাস্তবের বদলে গঠিত বাস্তবের বিকল্প সাহিত্যে symbol বা symbolism নামে পরিচিত। আসল যখন হস্তচ্যুত তখন তৎস্থলে নূতন একটা-কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ কোনো রকমে কাজ চালাইয়া লয় ; যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে না তাহার শেষ আশ্রয় দাঁড়ায় নাস্তিক্য। খেয়া কাব্যে "ঘরেও নহে পারেও নহে" অবস্থায় কবির মনে তখন অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা, পুরাতনের আশ্রয়চ্যুত শিথিল মুষ্টিতে তখন নূতন কিছুকে আশ্রয় করিবার দুর্জয় সংকল্প।[৫]

মনের এহেন অবস্থায় তিনি বিকল্প জগৎ গড়িবার মানসে পুরাতন জগতের সহিত একটা অতিরিক্ত মাত্রা, একটা নূতন dimension, যেন যুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ অতিরিক্ত মাত্রাতেই কবির সান্ত্বনা ও খেয়া কাব্যের মৌলিকতা। খেয়া কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতা ঐ নূতন মাত্রা-সমাবেশের ফলে এমন-এক অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে, পূর্ববর্তী কাব্যে যাহার সাদৃশ্যের একান্ত অসদ্ভাব।

৫ প্রাচীন হিন্দুসংহিতার বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের প্রতি এই সময় তাঁহার যে একটা আস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই সংকল্পের অন্তর্গত, যে-কোনো একটা আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যান এই রকম যেন তাঁহার ভাব।

এবারে, এই নূতন মাত্রা বলিতে কি বুঝি আর তাহার সংযোগে অভিনবত্বই বা কেমন ভাবে ঘটে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্ববর্তী রচনার আশ্রয় লইয়া তুলনার সাহায্যে বিষয়টা বুঝাইতে হইবে।

> কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে।[৬]

এই চিত্রখণ্ডের সহিত নিম্নলিখিত চিত্রখণ্ডের দুস্তর ব্যবধান নাই—

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?…
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।[৭]

একটিমাত্র পদক্ষেপে এক চিত্রখণ্ড হইতে অন্য চিত্রখণ্ডে পৌঁছানো সম্ভব। এবারে খেয়া হইতে একটি চিত্রখণ্ড উদ্ধার করিতেছি, সেই জলের ঘাট, সেই জল ভরা, সেই পল্লীবধূ, সবই এক অথচ এক নয়।—

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ওই শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণঝংকারে।…
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।[৮]

---

৬ পত্রসংখ্যা ১৬, ছিন্নপত্র

৭ দুই বোন, ক্ষণিকা

৮ ঘাটের পথ, খেয়া

স্পষ্টত ইহা আর-এক বস্তু ; আগে ছিল একটি হইতে অপরটিতে রূপান্তর, এখানে জন্মান্তর। সহৃদয় পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারে কেবল লৌকিক জল-ভরার কথা বলা হইতেছে না, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আরো কিছুর ইঙ্গিত করা হইতেছে। এই 'আরো কিছু'টাই নূতন মাত্রা, ইহাই নূতন সংযুক্ত হইয়াছে। আর এই সংযোগের ফলেই খেয়া কাব্যের কবিতাগুলির কিছু অধিক গুরুত্ব।

এমনতর আরো কয়েকটি চিত্রখণ্ড বা ভাবখণ্ড লওয়া যাক।—

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।...
আঁধার-আলোয় সাদায় কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি.
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝাগড়াঝাঁটি।[৯]

বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই—
কাজের পথে আমি তো আর নাই।...
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।[১০]

এই দুই ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে অতিরিক্ত মাত্রাটির সংযোগ।

আবার আর-এক জোড়া দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

আমি হব না, ভাই, নববঙ্গে
নবযুগের চালক,

৯ বিদায়, ক্ষণিকা
১০ বিদায়, খেয়া

আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।[১১]

আর—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,[১২]

এ দুয়ের মধ্যে শিল্পোৎকর্ষের ব্যবধানের প্রসঙ্গ না তুলিয়াও বলা যায় যে প্রথমটা একটা সাময়িক attitude বা মেজাজ মাত্র দ্বিতীয়টা তার চেয়ে অনেক গভীর—এ ব্যবধান জন্মান্তরের, রূপান্তরের নয়।

আরো একজোড়া উদাহরণ লওয়া যাক—

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।[১৩]

আর—

ওগো, এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।...
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই-নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
মিটে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।[১৪]

১১ জন্মান্তর, ক্ষণিকা

১২ পথের শেষে, খেয়া

১৩ মেঘমুক্ত, ক্ষণিকা

১৪ বর্ষাপ্রভাত, খেয়া

এখানেও ব্যবধান জন্মান্তরের, আর অতিরিক্ত মাত্রাটার সংযোগই তাহার কারণ।

ঐ যে গোড়ায় বলিয়াছি আদর্শ ও বাস্তবের ঠিকে মিলিতেছে না বলিয়া কবিসত্তার গভীরে একটা ভাঙাগড়া চলিতেছে, সেই সাময়িক অরাজকতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের আশায় কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্থলে জগতের স্বরূপ আবিষ্কার-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য নয়, যতদিন স্বরূপ আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন symbol ব্যবহার করিয়া কাজ চালানো ছাড়া আর উপায় কি। এ যেন পুরাতন ইমারত ভাঙিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে নূতন গড়িবার সময়ে কাঠ ও বাঁশের ভারা বা ফ্রেম ব্যবহারের মতো। এখন, এই ভারাটাতে কোনোরকমে ঠেকা কাজ চলিয়া যায় বটে কিন্তু স্থায়িত্ব বা স্থায়িত্বের গৌরব কখনো তাহা পায় না। সাহিত্যে symbol তথা symbolism-এর তদ্রূপ ব্যবস্থা। Symbolism অসময়ের সহায়, চিরকালের নির্ভর নয়।

রবীন্দ্রনাথও চিরকাল symbolismএর উপরে নির্ভর করেন নাই, বলাকায় আসিয়া সাময়িক ভারার বাঁশ-কাঠ সরাইয়া ফেলিয়া নবনিকেতনে গৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এখনো তার দশ বছর বিলম্ব—এখন সবে ১৯০৬ সাল, বলাকার প্রকাশ ১৯১৬ সালে।

॥ ৪ ॥

আদর্শে ও বাস্তবে সামঞ্জস্যবোধের অভাব হইতে দুঃখের উৎপত্তি—অন্তত খেয়া কাব্যে দুঃখানুভূতির কবিতাগুলির মূল সামঞ্জস্যবোধের অভাবে। আর খেয়া কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় দুঃখাত্মক কবিতা। চিত্রা কাব্যের 'সুখ অতি সহজ সরল' হইতে, ক্ষণিকা কাব্যের 'সত্যেরে লও সহজে' হইতে, কবি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। জীবনপ্রবাহ গভীরতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন 'সুখ অতি সহজ সরল' না হইতেও পারে। জীবনপ্রবাহ

যখন ঝরনার চেয়ে উদার ও গভীর ছিল না—সূর্যের আলোয় যখন শুধু জলের উপরিভাগ মাত্র নয়, জলের তলাকার নুড়িগুলা সুদ্ধ ঝল্‌মল্‌ করিত—তখন 'সুখ অতি সহজ সরল' ছিল সত্য। কিন্তু গভীর ও উদার জীবনপ্রবাহের উপরিতলের ঊর্মিগুলি রৌদ্রে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিয়া উঠিলেও রৌদ্ররশ্মি গভীরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। এখানে সুখ সহজও নয়, সরলও নয়, অনেক সময়ে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতে থাকে। আর, 'সত্যেরে লও সহজে'? অন্ধকার যেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট (মনে রাখিতে হইবে খেয়ার প্রায় অর্ধেক কবিতা অন্ধকারের পটে আঁকা) সত্যোপলব্ধি সেখানে সহজ নয়।

তখন রাত্রি আঁধার হল,
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম,
আসবে না কেউ আজ।[১৫]

তার পরে দুর্যোগের রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুঃখের আঘাতে ভুল ভাঙিতে থাকে, সংস্কারের দেয়ালে কৈশিক ফাটলপথে সত্যের অস্পষ্ট মূর্তি চোখে পড়িতে থাকে। কখনো রাজার দূতকে বাতাস, কখনো 'চাকার ঝন্‌ঝনি'কে 'মেঘের গরজনি' মনে হয়; অবশেষে 'দুঃখরাতের রাজা' যখন আসিয়া উপস্থিত হন তখন আর সাড়ম্বর অভ্যর্থনা করিবার সময় থাকে না। যখন তিনি আবার রাত্রিশেষে বিদায় লন তখন দেখা যায় যে, মালাটি না রাখিয়া গিয়া তরবারির গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এই দুঃখবোধ খেয়া কাব্যের বৈশিষ্ট্য, আর ইহার মূলে আদর্শ ও বাস্তবে সমন্বয়ের অভাব এ কথা আগে বলিয়াছি। পূর্ববর্তী রবীন্দ্রকাব্যে ঠিক এই শ্রেণীর দুঃখবোধের প্রকাশ নাই। এখন হইতে পরবর্তী সব কাব্যে দুঃখবোধের মেঘ কখনো ঘন কখনো স্বচ্ছ

১৫ আগমন, খেয়া

ছায়া ফেলিতে থাকিবে। কিন্তু দুঃখ যদি আদর্শ (অসীম) ও বাস্তবে (সীমায়) সমন্বয়ের অভাবজাত হয়, তবে কি বুঝিতে হইবে যে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে ইহার সুষ্ঠু ও যথোচিত সমন্বয় হয় নাই ? হয়তো তাই।

যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেখানে ফিরিয়া গিয়া শেষ করি। ঐ যে কবি একবার স্বল্পকালের জন্য একটা আদর্শলোকের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন, যে জগতের শুভ্র শাশ্বত আলোক কবির চক্ষুকে বাস্তবান্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাব খেয়া কাব্যে। কিছুকালের জন্য কবির দৃষ্টির axis বা মেরু যেন বদলিয়া গিয়া জীবনের রূপ তাঁহার কাছে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।—

ওগো, তোরা বল্ তো এরে
ঘর বলি কোন্ মতে।[১৬]

বাস্তবান্ধের দৃষ্টিতে আপন ঘর আর আপন নয়, এবং শেষপর্যন্ত

গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারই এই ডোর।[১৭]

এ শৃঙ্খল শুধু কবির আপন হাতে গড়া নয়, একটি বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বিশেষ মনোভাবের তাড়নায় গড়া।

একটা আদর্শ যতই মহৎ হোক তাহার খুব কাছাকাছি গিয়া পড়িলে গায়ে আঁচ না লাগিয়া পারে না, সেই দীপ্যমান আলোকের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি সাময়িকভাবে অন্ধ না হইয়া পারে না, মানুষের পক্ষে (সে মানুষ যতবড়ই হোক-না) প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আদর্শকে দেখা

১৬ অবারিত, খেয়া
১৭ বন্দী, খেয়া

বাঞ্ছনীয় নয়। হ্রদয়ের ছোট জলাশয়টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আদর্শের মৎস্যচক্র ভেদ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আদর্শকে দেখিতে গেলে সংকট না ঘটিয়া যায় না।

শেলি নিজ কবিজীবনের সংকট ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> Had gazed on Nature's naked loveliness,
> Actaeon-like, and now he fled astray
> With feeble steps o'er the world's wilderness.[১৮]

শেলির সংকট ও ট্রাজেডি এর চেয়ে সুষ্ঠুতর ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো দীর্ঘতর আয়ু লাভ করিলে জীবনসংকট হইতে মুক্ত হইয়া শেলি স্থৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেন। দীর্ঘতর আয়ুর অধিকারী রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত স্থৈর্য ও শান্তিতে (সামগ্রিক নয়) প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দুঃখবোধের মেঘখানা একেবারে অপসারিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ছায়া স্বচ্ছতর হইয়া আসিয়াছে—মেঘের ফাটল বিস্তৃততর হইয়াছে। আলোছায়ার দোরোখা বসনের মধ্যে আলোর ভাগটাই বেশি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ খেয়া কাব্যের আলোচনার অন্তর্গত নয়, অনেক পরবর্তীকালের সেই পরিণতি। এখানে আমরা কবিকে 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে'-অবস্থায় দেখিয়া বিদায় লইলাম।

১৮ Adonais (Shelley)

দশম অধ্যায়

"সীমার মাঝে অসীম তুমি"

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মধ্যে ত্রিধাচিহ্নিত একটি মনোরম দ্বীপ আছে। দ্বীপটি নদীর অন্তর্গত হইয়াও দুই তীর হইতে কিছু অস্বাভাবিকভাবে বিবিক্ত, মাটির তলায় যে যোগটুকু প্রত্যাশিত এক্ষেত্রে তাহারও যেন অভাব। অনেক সময়ে মনে হয় এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড যেন গ্রহান্তরের প্রক্ষেপ, তাই এমন অপার্থিব, তাই কেমন অলৌকিক। হয়তো এইজন্যেই, কিম্বা কি জন্য ঠিক জানি না, দ্বীপটি সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া সত্ত্বেও আবিষ্কারকদের দল ইহার অভ্যন্তর ভাগে বেশি দূরে প্রবেশ করে নাই। ইহার মনোরমতা যেমন আকর্ষণ, ইহার রহস্য-ময়তা তেমনি অন্তরায়। আকর্ষণে ও অন্তরায়ে, মনোরমতায় ও রহস্যে ত্রিধাচিহ্নিত রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের এই দ্বীপটি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি দুর্গম সমস্যা। ত্রিধাচিহ্নিত এই দ্বীপটির নামান্তর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি।

এই গীতাখ্য কাব্যগুলি তিনখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়াও একই মানসিক ভূখণ্ডের অন্তর্গত। ইহাদের বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া একত্র করিয়া দেখাই সঙ্গত, আর সেভাবে আলোচনা করিলে পরস্পরের অবিচ্ছিন্নতায় কাব্য তিনখানির তিনশত ছিয়াত্তরটি[১] গান সংহত হইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। দেখা যাইবে প্রথম হইতে

১ গীতাঞ্জলি গানের সংখ্যা ১৫৭
গীতিমাল্য গানের সংখ্যা ১১১
গীতালি গানের সংখ্যা ১০৮
৩৭৬

শেষ পর্যন্ত তিনশত ছিয়াত্তরটি ফুলে গাঁথা একটি দিব্য মালিকা, আরো দেখা যাইবে গীতাঞ্জলির প্রথম গান রচনার সময় হইতে গীতালির শেষ গানটি রচনার সময় পর্যন্ত একইভাবে ভাবিত একই প্রেরণায় আন্দোলিত রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ পর্ব।[২]

গীতাখ্য কাব্যত্রয়কে একটি দ্বীপ বলিয়াছি। ঐ দ্বীপের উপমাটা আরো একটু অনুসরণ করা যাইতে পারে। দ্বীপটির উপকূলভাগের ঠিক পরেই বিস্তৃত Hinterland আছে, আর তারো পরে দ্বীপের ঠিক কেন্দ্রে অতলস্পর্শ একটি উৎস। দ্বীপের শ্যামল উপকূলভূমিটিই সাধারণত লোকে দেখিতে পায়—ইহা ঐ গীতাখ্য কাব্যত্রয়। ঐ কাব্যত্রয়ের পিছনে যে বিস্তৃত ও অপেক্ষাকৃত দুর্গম Hinterland বা

২ গীতালির শেষ গান রচনার তারিখ লইয়া মতভেদের অবকাশ নাই। কিন্তু গীতাঞ্জলির গানের রচনাকাল কোন্ তারিখ হইতে ধরিব?

গীতাঞ্জলির গান রচনাকালের একটি সংক্ষিপ্ত স্থচী দিতেছি—তাহার ফলে বিষয়টা স্পষ্ট হইতে পারে।

গানের ক্রমিক সংখ্যা	রচনা সাল
১—৪	১৩১৩
৫—৭	১৩১৪
৮—১৪	১৩১৫
১৫—৫৯	১৩১৬
৬০—১৫৭	১৩১৭

এখন, সংখ্যার গুরুত্ব বিবেচনায় ১৩১৬ সালে রচনারম্ভ ধরা উচিত। তবে আমি মনে করি ১৩১৫ সালকেই রচনারম্ভকাল ধরা উচিত—ঐ সময় হইতে শান্তিনিকেতন নামে স্থপরিচিত উপদেশাবলী-ধারার স্থচনা। এই রচনাগুলির যোগ অতিশয় ঘনিষ্ঠ—একই আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে দুয়ের স্বষ্টি। বস্তুত শান্তিনিকেতনের ধারাবাহিক উপদেশাবলীর সহিত গীতাঞ্জলির ধারাবাহিক গানের লিখিত আলোচনা হইলে পরস্পরের সাহায্যে কবির সাধনজীবন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

অনুকূল ভূমি আছে তাহা হইতেছে শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত গ্রন্থের উপদেশবাণী। আর দ্বীপকেন্দ্রের উৎস কবির আধ্যাত্মিক প্রেরণা। এখন সহজেই অনুমেয় যে তিনে ঘনিষ্ঠ যোগ, কোনো একটিকে ছাড়িলে অপর দুটির সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আরো অনায়াসবোধ্য যে, উপকূলভাগ যতই মনোরম হোক এই দ্বীপের প্রকৃত রহস্য ঐ উৎসের অভ্যন্তরে। কিন্তু এত সব জানিয়া-শুনিয়াও যে লোকে সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে নাই তাহার প্রধান কারণ--কাজটি কঠিন। শান্তিনিকেতন উপদেশাবলী তত্ত্ব নয় বা কার্যকারণ বিশ্লেষণে গ্রথিত রচনা নয়, তেমন হইলে বোঝা কঠিন হইত না, উপদেশগুলি উপলব্ধির প্রকাশ, অনেকটা উপনিষদের বাণীর ন্যায়। ভাষা যতই সরল ও সরস হোক উহার মর্মে প্রবেশ সহজ নয়। তার পরে ঐ উপলব্ধির মূলে সাধনায় নিযুক্ত যে কবিচিত্ত আছে তাহার রহস্যে প্রবেশ আরো কঠিন। আর এ দুয়ে মিলাইয়া গীতাঞ্জলির গানগুলির মর্মোদ্ধার সময় শ্রম ও বিশেষজ্ঞতা -সাপেক্ষ। কাজেই অধিকাংশ লোকে উপকূলভূমির মনোরমতা দেখিয়াই, গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর-উপর রসাস্বাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। আর ইহারই ফলে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের এই মনোহর দ্বীপটির অন্ধিসন্ধি, রস ও রহস্য অদ্যাবধি প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। আমরা যথাসাধ্য এই কাজটি করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু তার আগে দ্বীপটির সীমাসরহদ্দ সম্বন্ধে আর একটু ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক।

॥ ২ ॥

খেয়া কাব্যের পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য গীতাঞ্জলির প্রথম চারটি গানের রচনাকাল ১৩১৩ সাল, কাজেই খেয়া কাব্যের শেষ ও গীতাঞ্জলি কাব্যের রচনারম্ভ পরস্পরকে স্পর্শ করে। আবার গীতাঞ্জলির শেষ গান রচনা ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাস, অন্যপক্ষে

গীতিমাল্যের প্রথম তিনটি সঙ্গীত রচনা ১৩১৬ সালে, যখন গীতাঞ্জলির গানগুলি রচিত হইতেছিল। গীতিমাল্য ও গীতালি রচনার মধ্যে কালের ব্যবধান নাই বলা চলিতে পারে, গীতিমাল্যের শেষ গান রচনার তারিখ ৩রা আষাঢ় ১৩২১ আর গীতালির প্রথম গান রচনার কাল শ্রাবণ ১৩২১ সাল। কাজেই গীতাঞ্জলির সূচনা হইতে গীতালির শেষ এক অনবচ্ছিন্ন সঙ্গীতপ্রবাহ, পূর্বোল্লিখিত উপমা অনুসারে একটি অখণ্ড দ্বীপ যদিচ তিনটি নামের খাতিরে ত্রিধাচিহ্নিত।

আরো একটি কথা। গীতিমাল্যের শেষ কয়টি রচনার তারিখ আর বলাকার প্রথম দিকের কয়টি রচনার স্থান ও কাল প্রায় এক, দুয়েরই হিমালয়ের অন্তর্গত রামগড় পাহাড়।[৩] মোটের উপরে বলা যায় যে, গীতিমাল্য ও গীতালির রচনাকাল প্রায় সমান্তরাল—যদিচ বলাকার রচনাকাল পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছে, শেষতম কবিতাটিকে ধরিলে আরো একটি বৎসরের প্রথম প্রভাত।[৪]

---

৩ এই লভিনু সঙ্গ তব, ৩১শে বৈশাখ ১৩২১
এইতো তোমার আলোকধেনু, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
গান গেয়ে কে জানায়, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
এরে ভিখারী সাজায়ে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
সন্ধ্যা হল গো, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
আকাশে দুই হাতে প্রেম, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
—গীতিমাল্য

এবার যে ঐ এলো সর্বনেশে গো, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
আমরা চলি সমুখ পানে, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
—বলাকা

৪ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ভরসায় স্থান-কালের সাম্যে রচিত গীতালি ও বলাকার কয়েকটি রচনার তালিকা দিতেছি। রচনাস্থান এলাহাবাদ, কাল রচনার সঙ্গে প্রদত্ত হইল—

কিন্তু এখানেই এই পর্বের চৌহদ্দির শেষ নয়। গীতালির শেষ গানটি লিখিত হইবার পরে, বলাকার কবিতাগুলি রচিত হইবার সময়ে, ১৩২১ সালের শেষভাগে কবি ফাল্গুনী নাটকখানি রচনা

অন্ধকারের উৎস হতে, ২৯শে আশ্বিন ১৩২১
গতি আমার এসে, ২৯শে আশ্বিন ১৩২১
ভেঙেছ দুয়ার, ৩০শে আশ্বিন ১৩২১
তোমায় ছেড়ে দূরে চলার, ১লা কার্তিক ১৩২১
যখন তোমায় আঘাত করি, ১লা কার্তিক ১৩২১
কেমন করে তড়িৎ আলোয়, ১লা কার্তিক ১৩২১
এই নিমেষে গণনাহীন, ২রা কার্তিক ১৩২১
যাসনে কোথাও ধেয়ে, ২রা কার্তিক ১৩২১
মুদিত আলোর, ২রা কার্তিক ১৩২১
এই তীর্থদেবতার, ৩রা কার্তিক ১৩২১

—গীতালি

ছবি, ৩রা কার্তিক ১৩২১
সাজাহান, ১৪ই কার্তিক ১৩২১

—বলাকা

এই তালিকা দুটি হইতে কিছু তত্ত্ব আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সম কালে, বিশেষ, স্থানও যদি সমান হয়, রচিত শিল্পকার্যে ভাবের সমতা থাকাই স্বাভাবিক। আর যদি নিতান্ত তাহা না থাকে তবে তাহাতেও স্রষ্টার মনের কিছু রহস্য প্রকাশ পায়। তালিকা দুটি পর্যবেক্ষণ করিলে ভাবের অসমতাই স্পষ্টতর হইয়া ওঠে, যদিচ কোথাও কোথাও ভাবসাম্যের আভাসও যে না আছে তাহা নয়।

বলাকার ২, ৩, ৪, ৫ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে গীতিমাল্যের ১০৮ সংখ্যক এবং গীতালির ৩, ৪, ৫, ১০ সংখ্যক গান তুলনীয়। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে প্রধানত মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ বর্ণিত, বলাকায় বর্ণিত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। কিন্তু এই পর্বটায় মানুষ ভগবান ও প্রকৃতি একীভূত হওয়ায় একটির কথাপ্রসঙ্গে অপরটি আসিয়া পড়িয়াছে।

করেন। গীতাখ্য কাব্যত্রয় আলোচনাকালে পরোক্ষে বলাকা ও ফাল্গুনীর প্রসঙ্গ মনে রাখা আবশ্যক। এতক্ষণে বোধ হয় আমাদের সীমাসরহদ্দ নির্ণয় শেষ হইল, এবারে এই মায়াময় মনোরম দ্বীপটির সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

॥ ৩ ॥

খেয়া কাব্য যদিচ গীতাঞ্জলির অগ্রজ তবু দুয়ে অনেক প্রভেদ; অবশ্য বংশপরিচয় তাহাদের মুখেচোখে বর্তমান, তবে আর কোনো মিল আছে মনে হয় না। খেয়া কাব্যে রাত্রির মুখ্যতা, নৈরাশ্য ও নৈরাশ্যজাত যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই গীতাঞ্জলিতে তাহার কিছুই নাই। গীতাঞ্জলি প্রভাতের কাব্য, 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে' সেখানকার কাব্য গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি। কাব্যের এই প্রভাত কবির মনের দিগ্‌দর্শন দেয়। যে-সব কারণে খেয়া কাব্য রচনাকালে কবির মনে অন্ধকার নামিয়াছিল, এখন তাহা গত, দ্বন্দ্বের অবসানে উপনীত কবির মনে নূতন জ্যোতির্লোক আবির্ভূত। এই দ্বন্দ্বটা কি আর তাহার অবসানটাই বা কি রকমে ঘটিল বুঝাইতে পারিলেই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বলা হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির একটি পরম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। তিনি জগৎ ও জীবনকে কখনো সীমার কোটি হইতে দেখেন, কখনো অসীমের কোটি হইতে দেখেন, আর এই দৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ফলে জগৎ ও জীবন নূতনরূপে প্রতিভাত হয়, সসীম আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়, অসীম করায়ত্তবৎ বোধ হইতে থাকে। সোনার তরী চিত্রা চৈতালির জগৎ অসীম হইতে দৃষ্ট হইবার ফলে ভূতলের 'স্বর্গখণ্ডগুলি' বলিয়া মনে হয় আর খেয়ার অতীন্দ্রিয়প্রায় অভিজ্ঞতাগুলি সীমার কোটি হইতে দৃষ্ট হইবার ফলে নিতান্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয়। এইভাবে কাব্য হইতে কাব্যান্তরে,

পর্ব হইতে পর্বান্তরে চলিতে থাকে তাঁহার 'ভাব হতে রূপে' আর 'রূপ হতে ভাবে' 'অবিরাম যাওয়া-আসা'। খুব সম্ভব এই প্রক্রিয়া স্মরণ করিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের প্রচেষ্টা তাঁহার কাব্যের একমাত্র পালা। সীমা ও অসীমের মসৃণ পদ্মপত্রে জগৎ, প্রকৃতি, মানুষ প্রভৃতি মুহূর্তের জন্য টলমল করিয়া উঠিয়া বিপরীত কোটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনটাই দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' এইজন্যই রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের ফলশ্রুতি একটি মহৎ অতৃপ্তি, একটি অকারণ ব্যাকুলতা। কবিচিত্তের অতৃপ্তি ও ব্যাকুলতা পাঠকচিত্তে সমীরিত হইয়া তাহাকেও অতৃপ্ত ও ব্যাকুল করিয়া তোলে। কবির পক্ষে এমন হইবার কারণ তিনি সীমা ও অসীমকে এক নীড়ে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। নৈবেদ্যে অবশ্য বলিয়াছেন যে 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়', কিন্তু তখনো ইহা জীবনের উপলব্ধি নয়। রবীন্দ্রকাব্যের যে সামগ্রিক ফলশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটি মহৎ ব্যতিক্রম আছে—সে ব্যতিক্রম আমাদের পূর্বকথিত মনোরম দ্বীপ বা গীতাখ্য কাব্যত্রয়। এই কাব্যগুলি পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এতদিনে এমন একটি সত্তার আবিষ্কার করিতে কবি সক্ষম হইয়াছেন যাহা সীমা হইতে দেখিলেও যেমন সত্য, অসীম হইতে দেখিলেও তেমনি সত্য, যাহা দূরেও যেমন সত্য নিকটেও তেমনি সত্য, যাহা প্রেমের দৃষ্টিতেও যেমন সত্য জ্ঞানের দৃষ্টিতেও তেমনি সত্য, সংক্ষেপে বলা চলে যাহার মধ্যে জগতের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে। তত্ত্ব হিসাবে ঔপনিষদ রসে বর্ধিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ এসব কথা জানিতেন, কিন্তু তত্ত্বের কথায় জীবনের চিঁড়া ভেজে না, ভেজে নাই, এই সময়ে ইহা সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তাহার এমন সার্থকতা। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের ভিত্তি এই অভূতপূর্ব সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা। "সীমার মাঝে অসীম তুমি" আর কথার কথা বা মনোরম

বৈচিত্র্যমাত্র নয়, সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা। গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে ইহার রস-রূপ, শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ইহার তত্ত্বরূপ, আর জীবনে ইহার সাধনরূপ। জীবন, শান্তিনিকেতন ও গীতাঞ্জলি সমসূত্রে স্থাপিত।

গীতাঞ্জলি-সাধনার বীজ শান্তিনিকেতন গ্রন্থ। এইজন্যেই বারে বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলিয়াছি। এবারে এই গ্রন্থ হইতে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। এই সব অংশ পড়িলে কবির অধ্যাত্মসাধনার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে—আর তাহার ফলে গীতাঞ্জলি বুঝিবার সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

॥ ৪ ॥

"বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি। তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

সংসারে সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্য আর একটা সত্যকে মানতে হয়। এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্য ঈশ্বরকে ও মৃত্যুর জন্য শয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি না—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্বকথা। তিনি সত্য একথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয়—এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়? এই সত্যের কি কোনো সই নেই?…"[৫]

৫ প্রেম, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

"কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনমতেই হতে পারে না।"[৬]

"এইরূপে তিনি আমাদের কর্মের মধ্যেই মুক্ত, কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়—কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তি বশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই, প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটাতে পারে। নৌকার যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।"[৭]

"তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? যখন জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়, প্রেমই এর নিগূঢ় ও চরম আশ্রয়, তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবো। তখনই বলে উঠবো 'প্রেম! আঃ! বাঁচা গেল! তবে আর কথা নেই। কেননা প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানবসমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তে আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।' যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে? তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার

৬ প্রেম, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

৭ শক্তি, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস। তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।"[৮]

"আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।...দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি পার্সোনেল কি ইমপার্সোনেল? প্রেমের মধ্যে হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে 'আমি আছি' আর একদিক বলে 'আমি নেই।' আমি না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে; সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।...ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন। তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা। এত বড়ো

৮ সমাজমুক্তি, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখাত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কারই আরো আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিত শাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি।—যেন সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করেছে। এ কী অনির্বচনীয়! এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ! এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়! এরই বা সীমা কোন্‌খানে! সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তন-পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি, কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।"[৯]

"বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় ধরে এনেছে তা তো নয়। তাঁর ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে; নতুবা এই ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেইজন্যেই বলেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌ বিভাতি।

৯ সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ; অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা; ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।... এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, যিনি অকাল-স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্র রূপে মূর্তিমান করছেন।"[১০]

"আমাদের ধ্যানের মন্ত্রের এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করেছেন আর একদিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করেছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যেই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, যারা অবিদ্যাকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা একদিকে অবিদ্যা, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে, সেখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত, নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত; চলার দ্বারা থামা বর্জিত, থামার দ্বারা চলা বর্জিত; অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত, বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু—

'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।'—তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে। তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি; কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।"[১১]

১০ পার্থক্য, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

১১ ওঁ, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড

॥ ৫ ॥

আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ ভগবানের যে স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সীমার কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও যেমন সত্য, অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য, আবার সীমা ও অসীমের মিলিত কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য। দৃষ্টির এই পূর্ণতা ইতি-পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে ছিল না। আর এই পূর্ণ দৃষ্টির ফলেই এই সময়ে জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এমন একটি ভারসাম্যে কবি উপনীত হইয়াছিলেন যাহা আগে দেখিতে পাই না। দৃষ্টির এই পূর্ণতার জন্য—অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভারসাম্যের ফলে—মানব, প্রকৃতি সমস্তই পূর্ণতায় আভাসিত হইয়া নবতর রূপে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। এবারে কাব্য হইতে কিছু কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সীমার কোটি হইতে কবি যখন ভগবানকে দেখিয়াছেন তখন তাঁহাকে নিতান্ত ঘরের মানুষ বলিয়া, মানুষের প্রেমভিক্ষু বলিয়া মনে হইয়াছে—

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।[১২]

সীমারূপে, আপনরূপে জানিলে সাধকের গর্বের অন্ত থাকে না, সে অকুতোভয়ে বলে—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।

১২ ৫৬ সংখ্যক,

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।[১৩]

প্রেমের কী দুঃসাহস।

তখন মনে হয়—

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই
মনের মতন করে।

তখন আর সন্দেহ থাকে না যে—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।[১৪]

তখন এতবড় বিশ্বব্যাপারটা কেবল দুজনের মিলনের জন্যই সুসজ্জিত মনে হয়—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।[১৫]

তখন নিতান্ত সীমাবদ্ধরূপে পাইতে সাধকের বড় আকিঞ্চন—

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাওগো আমার হাতে,
ধরবো তারে, ভরবো তারে,
রাখবো তারে সাথে।[১৬]

১৩ ১২১ সংখ্যক,
১৪ ৩৯ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
১৫ ৫২ সংখ্যক, গীতিমাল্য
১৬ ২৫ সংখ্যক, গীতালি

তখন মিলনের মুহূর্ত অবহেলায় গত হইল বলিয়া নিদ্রা বিস্মৃত হইতে থাকে—

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম
ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।[১৭]

এই ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ চিরকালের মানুষও বটেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে আসে আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে আসে আসে।[১৮]

আবার যখন তিনি অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট তখন তাঁহার আর এক রূপ—

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।[১৯]

তখন ঐ কাছের মানুষটির বিশ্বব্যাপী বিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে—

তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।[২০]

তখন আকাশব্যাপী নক্ষত্রের মণিকণিকাগুলি তাঁহার অঙ্গদের

১৭ ২৭ সংখ্যক, গীতালি

১৮ ৬২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

১৯ ২৫ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

২০ ৬৮ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

রম্য বলিয়া মনে হয়। আর সীমারূপে, বন্ধুরূপে পাইতে যে কেবল সাধকের আকাঙ্ক্ষা—তাহার রূপান্তর ঘটে—

সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে।[২১]

সীমারূপে যিনি বন্ধু, অসীমরূপে তিনি নির্বিকল্প নন, অসীমরূপের প্রেমটির জন্যও কবির সমান আকাঙ্ক্ষা। কেননা, দুটি রূপেই তিনি সত্য ; যিনি পূর্ণ—কোন্ রূপে তাঁর অপূর্ণতা ? যিনি প্রেমময়—কোন্ রূপে তাঁর প্রেমের অভাব ? একসঙ্গে তিনি সীমা ও অসীম।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।[২২]

তখন কবির চিত্ত ডুবুরীর মতো রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান করে—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।[২৩]

আবার—

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

২১ ২ সংখ্যক, গীতালি
২২ ১২০ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
২৩ ৪৭ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

সোনার ঘটে সূর্য তারা
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।[২৪]

উদাহরণের বহুলতা ঘটাইবার আবশ্যক নাই—অজস্র উদাহরণের কয়েকটি মাত্র দিয়া কবির সাধনার বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টির বৈচিত্র্যের একটা ইঙ্গিত দিলাম। এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাইতে পারে।

॥ ৬ ॥

দৃষ্টির পূর্ণতা বলিতে কি বুঝি তুলনায় স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। শেষজীবনে কবি লিখিয়াছেন 'ওরা কাজ করে'। এখানে 'ওরা' কোন্ মানুষ? মানুষের পূর্ণ রূপ কি ইহার মধ্যে আছে? এ নিতান্তই মেহনতী মানুষ। গীতাঞ্জলিতে যে মানুষকে তিনি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছেন সে স্বয়ং বিধাতার সহকর্মী।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার পরে।[২৫]

স্পষ্টত এ মানুষ বিধাতার সহকর্মী, আর 'ওরা' একপেশে মানুষ, সাময়িক আইডোলজি-র অঙ্গুলিহেলনে চালিত একপেশে মানুষ, ভগবানের বিভূতি তাহাকে দিব্যত্ব দান করে নাই।

২৪ ৯৬ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

২৫ ১১৯ সংখ্যক, গীতা॰

আর একটা উদাহরণ। শেষজীবনে তিনি সেই কবিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, 'কিষাণের শ্রমিকের শরিক যেজন'। গীতাঞ্জলির কবি তুলনায় পূর্ণতর, বস্তুত তাহার চেয়ে পূর্ণতর আর কিছু ভাবিতে পারা যায় কি? গীতাঞ্জলিতে 'কবি'—কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলোকে আসীন, একবার সে ভগবানকে গান শোনায়—ভগবান আর একবার তাঁহাকে গান শোনান—এমনি-ভাবে উতোরে চাপানে দুইজনে গানের সহযোগিতা চলিতে থাকে।

কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাবো গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।[২৬]

কবি বলিতেছেন—

তুমি যখন গান গাহিতে বলো
গর্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।[২৭]

অপর পক্ষে—

তুমি কেমন করে গান করো যে গুণী।[২৮]

আবার—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।[২৯]

গীতাঞ্জলির মানুষ যেমন ভগবানের সহকর্মী, গীতাঞ্জলির কবিও তেমন ভগবানের সহকর্মী, দুজনেরই গায়ে ধূলাবালি লাগিয়াছে,

---

২৬ ৮৩ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
২৭ ৭৮ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
২৮ ২২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
২৯ ৭৪ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

দুজনেরই কণ্ঠ সমান আনন্দে উৎসারিত হইয়াছে। ইহাকেই বলি দৃষ্টির পূর্ণতা, পূর্ণ দৃষ্টির ফলেই মানুষের পূর্ণতার উপলব্ধি ঘটে। আগেই বর্ণনা করিয়াছি—যিনি একই সময়ে সীমা ও অসীম, যিনি সীমার কোটি হইতেও যেমন সত্য, অসীমের কোটি হইতেও তেমনি সত্য—সেই পূর্ণের উপলব্ধিই দৃষ্টির পূর্ণতার হেতু—

মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।[৩০]

গীতাঞ্জলি পর্বের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আর কোন কাব্যে এমন উজ্জ্বলভাবে এমন সমধিকমাত্রায় আছে বলিয়া মনে হয় না। এই দৃষ্টির অধিকারী বুঝিতে পান, বুঝিয়া সান্ত্বনা পান—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।[৩১]

এই 'পূর্ণের পদ-পরশ' আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রিয়জন প্রণম্য হইয়া ওঠে,

আমার দেবতা নিল
তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর
তোমাদের সবারে প্রণাম।[৩২]

ঠিক এই একই কারণে ভৌগোলিক ভারত-ভূখণ্ডকে 'পুণ্যতীর্থ' বলা সম্ভব হইয়াছে, 'নমি নর-দেবতারে' আর 'মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার' বলা সম্ভব হইয়াছে।

'নর-নারায়ণ' দরিদ্র-নারায়ণের চেয়ে পূর্ণতর। আর 'মানুষের

৩০ ১২১ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

৩১ ১০৭ সংখ্যক, গীতালি

৩২ ১০৮ সংখ্যক, গীতালি

নারায়ণে'র কী ব্যবস্থা করিব? রবীন্দ্রনাথ অবতারবাদ মানেন না—আর ইহা অবতারবাদও নয়—মানুষের মধ্যে 'সীমার মাঝে অসীম'-রূপে নারায়ণ স্বতঃপ্রকাশ,—তাহাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোথায় এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব আর কোথায় 'ওরা কাজ করে'র ওরা!

॥ ৭ ॥

কাব্যবিচারে ব্যক্তিগত রুচি হইতেছে প্রধান বিচারক আর এই বিচারকটি বড়ই খামখেয়ালী, সমালোচক জুরিদের মত অগ্রাহ্য করিয়া যখন-তখন উল্টা রায় দিয়া বসে। কাজেই এহেন বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া অমুক কাব্যখানি উৎকৃষ্ট বা অমুক ধরনের কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট—এমন কথা বলা নিরর্থক। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের কোন্ শ্রেণীর গানগুলি শ্রেষ্ঠ এ তর্কে নামিবার চেয়ে কোন্ শ্রেণীর গানগুলি আমার ভালো লাগে বলা অনেক সহজ, অবশ্য 'আমার ভালো লাগা' 'সকলের ভালো লাগা' হইবে এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়। আমার ভালো লাগার ব্যক্তিগত ঝোঁকটা সেই শ্রেণীর রচনার দিকে যাহাতে নিসর্গকে কাব্যের প্রধান উপাদান রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোজাসুজি নিসর্গবিষয়ক বলিলে চলিবে না, কেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিসর্গের সহিত অপর একটি সত্তা, হয় মানুষ নয় ভগবৎসত্তা, মিশ্রিত হইয়াছে। এই মিশ্রণকার্যের নিপুণতা ও সূক্ষ্মতা গীতাঞ্জলি প্রভৃতির শিল্পকলার একটি প্রধান ঐশ্বর্য। শরতের সূর্যাস্তের সোনার মেঘ যেমন পরস্পরের সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়া যায়, বসন্তের বাতাসে বিচিত্র ফুলের গন্ধ যেমন অনায়াসে মিশিয়া যায়, দূরবর্তী পাহাড়ের কোমল বঙ্কিমরেখা যেমন নীলিমার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়া যায়, জ্যোৎস্নার আভা যেমন সমুদ্রতরঙ্গের শুভ্রতায় অনায়াসে মিশিয়া যায়, তেমনি অনায়াস, তেমনি চতুর, তেমনি সূক্ষ্ম অলক্ষ্য প্রায় বুদ্ধির অগম্য একটি নিঃশব্দ মিশ্রণপ্রক্রিয়া দেখা যায় গীতাঞ্জলির রচনাগুলিতে, নিসর্গের সঙ্গে নিসর্গ, নিসর্গের সঙ্গে মানুষ, নিসর্গের

সঙ্গে ভগবান রেখায় বর্ণে ছায়াতপে মিলিত। নিছক শিল্পকলার বিচারে কবির লিরিক-তুলির এখানে পরাকাষ্ঠা। এ ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টা নিরর্থক, বলিয়া বোঝানো যাইবে না, পড়িয়া বুঝিতে হইবে ; বলিয়া যাহা বোঝানো সম্ভব তাহারই চেষ্টা করিব।

নিসর্গ-চিন্তাতেও সেই পুরাতনী ক্রিয়া, সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিটি ঘটিয়াছে বলিয়াই নিসর্গের সীমার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অসীমের প্রক্ষেপ ঘটিতেছে, সীমা আপন সঙ্কীর্ণতাকে লঙ্ঘন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে অসীম রূপ ধারণ করিতেছে। নিছক তত্ত্ব হিসাবে এমন কথা তাঁহার আগের কাব্যেও আছে ; কাঁচা বয়সের কাব্য কবি-কাহিনীতে কবিপ্রিয়া নলিনী 'দেহকারাগার-মুক্ত' হইয়া প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে হৃদ্য করিয়া তুলিয়াছে। তত্ত্বরূপে ইহার যে মূল্যই হোক উপলব্ধিরূপে ইহার মূল্য অপরিসীম—আর ইহা উপলব্ধির সত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রকাশ এমন সুন্দর হইয়াছে।

অবশ্য এই কাব্য তিনখানিতে বিশুদ্ধ নিসর্গকবিতাও কয়েকটি আছে, কাব্যোৎকর্ষের বিচারে যাহাদের তুলনা নাই। কিন্তু এই বিশুদ্ধ সঙ্গীতগুলিকে পূর্বোক্ত উপলব্ধির ব্যতিক্রম মনে করার কারণ নাই। সীমা ও অসীমের উপলব্ধির ফলে কবির মনে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য ঘটিয়াছে তাহাতেই এই কবিতাগুলির প্রেরণা। শরতের নিরভ্র আকাশে ভারসাম্যে অবস্থিত ভাসমান চিল যেমন কখনো দ্যুলোকের বিস্ময় কখনো ভূলোকের বস্তু বলিয়া মনে হইতে থাকে —এই কবিতাগুলিতেও অনেকটা সেই রকম ভাব আনিয়া দেয় আমার মনে।[৩৩]

৩৩ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমার নয়নভুলানো এলে
এস হে এস সজল ঘন

এই কবিতাগুলিতে নিসর্গেতর কোন ভাবনা আসিয়া ইহাদের সমৃদ্ধতর করে নাই সত্য, কিন্তু সত্যের ঐ অমিশ্র সৌন্দর্যই বোধ করি ইহাদের গৌরব। কীট্‌সের Autumn কবিতায় যে নিগূঢ় ভাব-তন্ময়তা বিদ্যমান সেই গুণ যেন ইহাদের মধ্যে। কিন্তু নিসর্গবিষয়ক বাকি অধিকাংশ কবিতাই অন্য ভাবনার মিশ্রণে জটিলতর। এবারে তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

নিসর্গের সমস্ত মেজাজের, সমস্ত রূপের মধ্যে ভগবানের বিভূতির এমন প্রত্যক্ষ প্রকাশ আর কোন কাব্যে আছে কি না জানি না। কিম্বা বলা উচিত যে নিসর্গ যেন ভগবৎসত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে, নিসর্গে প্রকাশ বলিলে দুটি ভিন্ন বোঝায়—কিন্তু এখানে দুয়ে এক।

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়-হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।[৩৪]

এখানে তোমার প্রেম কি, না তুমি আর প্রভাতের আলো একীভূত।

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
—গীতাঞ্জলি

আজ প্রথম ফুলের পাবো প্রসাদখানি
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
—গীতিমাল্য

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
এই শরৎআলোর কমলবনে
তোমার মোহনরূপে—প্রভৃতি
—গীতালি

৩৪ ৩০ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে।[৩৫]

—বলিতে, ঠিক এ জিনিসটা বোঝায় না; শ্যামল ঘন সজল কাজল-আঁখিকে মনে করাইয়া দেয় মাত্র—কিন্তু গীতাঞ্জলিতে দেখি যে নিসর্গই যেন ভগবৎসত্তা। ইহা রূপান্তর মাত্র নয়—তাহার চেয়ে বেশি। এ হইতেছে সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব, যাহার ফলে সীমা আপন সঙ্কীর্ণতা হারাইয়া অসীমে পরিণত হয়। কবি-কাহিনীতে 'দেহহীন' নলিনীকে প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করিয়াছি—পরবর্তীকালের কাব্যে 'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল' দেখিতে পাইব। এখানকার উপলব্ধি গভীরতর ও ব্যাপকতর। এখানে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের প্রকাশ—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িতেছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ।[৩৬]

আবার কখনো বা প্রকৃতির মধ্যে মানুষের বিচিত্র ইতিহাসের আভাস—

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।[৩৭]

এখানে দেখিতে পাইব বর্ষা, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি যাবতীয় ঋতুর সমস্ত রূপ ও মেজাজের মধ্যে একটি রূপাতীতের আলোক। এ-সমস্ত রূপক, উপমা বা সমাসোক্তি জাতীয় কোন অলঙ্কার নয়, ইহা অরূপের রূপালোকে আবির্ভাব, সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ,

৩৫ নববিরহ, কল্পনা
৩৬ ৬ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি
৩৭ ১০০ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি। ইহা একটি বিশেষ উপলব্ধির ব্যাপার। কোন দার্শনিক ছাঁচ বা মনস্তত্ত্বের নিয়মের সঙ্গে মেলে কি মেলে না জানি না। কিন্তু প্রত্যক্ষত দেখিতেছি যে, ইহা সম্ভব হইয়াছে। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির এই বিশেষ উপলব্ধি প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবৎসত্তার মিলনে এমন গভীর, এমন সমৃদ্ধ একটি বিষয় যাহা ব্যাখ্যা, বর্ণনা করিয়া বোঝানো সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ কতকটা সাহায্য করিতে পারে, তাহার অধিক স্বয়ং কবিও চেষ্টা করেন নাই। এই অভিজ্ঞতার গভীরতা সাধারণ জীবনের ঠিক কাছাকাছি বস্তু নয়—সৌভাগ্যবশত এ অভিজ্ঞতা যাঁহার জীবনে ঘটে তিনিই সম্যক বুঝিতে পারেন।

"অদ্যাপি করয়ে লীলা সেই শ্যাম রায়
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

ইহাই শেষ কথা বলিয়া বৈষ্ণব সাধক এই উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে আর এক দিকের বিচারে গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের সঙ্গীতগুলি সহজগ্রাহ্য। এই সব সঙ্গীতে যে সহজ ভক্তিরস আছে, সমস্ত বৈষয়িক ও আন্তরিক বাধা অতিক্রম করিয়া ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের যে আকাঙ্ক্ষা আছে—তাহার তুলনা বৈষ্ণব মহাজন, শাক্ত সাধক ও বাউলদের সঙ্গীতগুলি। এ দিক হইতে দেখিলে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি তিনখানি কাব্য বাঙালীর ভক্তিসাধনার ও ভক্তি-সঙ্গীতাবলীর অন্তর্গত। তবে আমাদের কালের কবি বিংশ শতকের ব্যক্তি, তাই তাঁহার কাব্যে আরো এমন কিছু আছে, যাহা পূর্ববর্তীদের কাব্যে প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না। অভিজ্ঞতার গভীরতার সহিত আছে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য। ভগবান, মানব ও প্রকৃতির ত্রিবেণীসঙ্গমে এই ঐশ্বর্য বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। আর তাহার মূলে আছে 'সীমার মাঝে অসীমে'র উপলব্ধি। কবির মন এখানে দিব্য-গগনবিহারী বিস্তৃতপক্ষ বিষ্ণুবাহন গরুড়ের মতো ভারসাম্যে ভাসমান। পরবর্তী যুগের কাব্যে দেখিতে পাইব যে, এই ভারসাম্যের অপহ্নব

ঘটিয়া সীমা-অসীমের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া তাঁহার কাব্য সাধারণ জীবনের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে—তাঁহার কাব্য অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু গীতাঞ্জলি পর্বের অরূপ রশ্মির যেন অভাব। বুদ্ধির আলোতে ও অরূপরশ্মিতে অনেক প্রভেদ।

একাদশ অধ্যায়

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে"

॥ ১ ॥

গীতাঞ্জলি কাব্যের পিঠ-পিঠ যখন গীতিমাল্য ও গীতালি প্রকাশিত হইল, তখন রবীন্দ্রানুরাগী সুধী ও সুহৃদ্‌গণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন কবি বুঝিবা এমনি ছোট ছোট গান ও লিরিক লিখিয়া বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যে দিব্যপ্রতিভা ভাষা ও ছন্দের জাদুতে সোনার তরী, চিত্রা ও কল্পনা কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুঝি এতদিনে দেউলে হইয়া পড়িল। তাঁহাদের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল এমন মনে করা চলে না, কেননা, ১৯০১ সালের পরে এ পর্যন্ত কবি যে-সব কাব্য লিখিয়াছেন তাহাতে কবিত্ব আছে, সহৃদয়তা আছে, জীবনতত্ত্বের গভীরতা আছে, কিন্তু চিত্রা, সোনার তরী ও কল্পনার ঐশ্বর্যের যেন অভাব। মানসসুন্দরী, উর্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত প্রভৃতির কলম কি কবির হাত হইতে খসিয়া পড়িল? নৈবেদ্য কাব্যে গভীরতা আছে—কিন্তু এ যে চতুর্দশপদীর স্তিমিত স্রোতস্বিনী! খেয়া কাব্যের শান্ত লিরিক-প্রবাহে মানসসুন্দরীর পদ্মার উদ্বেল বর্ষাবেগ কোথায়? তার পরে চলিয়াছে অবিরল ধারায় গীতাঞ্জলি প্রভৃতির অঞ্জলিমেয় লিরিক। কল্পনা ও ক্ষণিকা প্রকাশের পরে পুরা দশটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। অনুরাগিগণের শঙ্কিত হইবার কথা বইকি। এমন কি, যাঁহারা ঠিক রবীন্দ্রানুরাগী নন তাঁহারাও রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে গীতাঞ্জলির গানগুলিকে বুঝিতেন না।[১]

১ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রপ্রতিভার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় নি। কারণ,

এমন সময়ে—

একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্‌, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্‌
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ॥[২]

বর্জিত প্রত্যাশা বিস্ময় বহন করিয়া বাঙালী পাঠকের সমক্ষে আবির্ভূত হইল। যাঁহারা সোনার তরী চিত্রাঙ্গদা চিত্রার স্মৃতি পোষণ করিতেছিলেন, নূতন উপাদানে রচিত, নূতন রসে রসিত

নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়বার সুযোগ পান নি। গীতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠ-কবিতার সঙ্কলন নয়। উর্বশী, চিত্রাঙ্গদা, পতিতা, সোনার তরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি গীতাঞ্জলিতে নেই।"—বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ: চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে এক সময়ে আমারও ধারণা প্রায় এইরূপ ছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলির তুলনা নাই—কবির লিরিক প্রতিভা এখানে তুঙ্গস্পর্শী।—লেখক

২ শা-জাহান, বলাকা

নূতনতর কাব্য পাইলেন তাঁহারা। আর যে নূতন পাঠকসম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল; রবীন্দ্রকাব্য-জগতে প্রবেশ করিয়াই আনকোরা নূতন বস্তু তাহারা পাইল। নূতন ও পুরাতন সকলেই দেখিল যে ঐন্দ্রজালিকের ঝুলি নিঃশেষ হইয়া যায় নাই—মন্ত্রপড়া জাদুযষ্টিখানার ইঙ্গিতে চৈতন্যের দিগন্ত হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটায় পূর্ণ হইয়া গিয়া অপরূপ তাজমহলের সৃষ্টি করিয়াছে। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির স্তিমিত লিরিক-প্রবাহ দেখিয়া যাহারা ভাবিয়াছিল কবির প্রতিভা দেউলে হইয়া গিয়াছে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে একই নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে, গ্রীষ্মের লুপ্তপ্রায় নদীপ্রবাহ-খাতেই বর্ষার বিজয়ী রাজতরঙ্গিণী দেখা দেয়। কবিজীবনের পালা সাঙ্গ হইয়া যাইবার পরে আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কবির দীর্ঘজীবনের বাঁকে বাঁকে এমন অনেক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সঞ্চিত ছিল। কাটাখালের সরল পথ বিস্ময়-বর্জিত, বহুভঙ্গ মহানদীর মোড়ে মোড়ে নূতন নূতন বিস্ময়। (রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে বলাকা কাব্যের বাঁক এমনি একটি বিস্ময়স্থল। নূতন না হইলে বিস্ময় সৃষ্টি করে না। বলাকা কাব্যে সেই নূতনটা কী তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব।)

॥ ২ ॥

(ইতিপূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ব্যক্তির সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, আবার ব্যক্তি বা মানবাত্মার সহিত ভগবানের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বলাকা কাব্যে আসিয়া কবি একটি নূতন সম্পর্ক আবিষ্কার করিলেন—ব্যক্তির সহিত বৃহৎ সমাজবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক আর সমাজবদ্ধ মানুষের সহিত সমাজবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক। বলাকার মানব গৃহাশ্রয়ী বা ভাবলোকাশ্রয়ী মানব নয়, এ মানব সমাজবদ্ধ জীব, দীর্ঘ-ইতিহাসের পটে যাহার আশ্রয়। ইহাই বলাকার প্রথম অভিনবত্ব।) মানসী সোনার তরী চিত্রা চৈতালি ও ক্ষণিকাতে কবি

সাধারণের অনুভবযোগ্য প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কর্মপথে সঞ্চরণ করিয়াছেন—এই সব কাব্যের মানুষ ব্যক্তিবিশেষ, আর সে ব্যক্তিকে কখনো পিতারূপে, কখনো স্বামীরূপে, কখনো প্রণয়ীরূপে আমরা দেখিয়াছি, তাহাকে চিনি, তাহার মনের কথা আমারই মনের কথা। এই সব কাব্যে কবি যখন প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছেন তখন দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিকে (যেমন বসুন্ধরা বা সমুদ্রের প্রতি কবিতায়) আমাদের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন। এই সব কাব্যে কল্পনার স্বর্ণরথারূঢ় হইলেও কবি পরিচিত মর্ত্যলোক হইতে খুব দূরে যান নাই—পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার বিমান পথ আবর্তিত হইয়াছে। এই কাব্যের বিশ্ব ভূকেন্দ্রিক। কিন্তু তার পরে একটা সময় আসিল, দীর্ঘ সময়, যখন কবি সাধারণের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে ব্যক্তির সহিত ভগবানের সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবতই ইহা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বস্তু নয়। আমাদের দেশের ভক্ত কবিগণ এই দুরূহ কাজটি করিবার সময়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট, পরিচিত, মানবরসাপ্লুত কাহিনীর ছাঁচকে গ্রহণ করিয়াছেন। মাতা যশোদা, গোপবালক, গোপবালা প্রভৃতির সুপরিজ্ঞাত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ মানবাত্মা ও ভগবানের সম্পর্কটি কবিরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাক্ত কবিগণ কালীকে অর্থাৎ আদ্যাশক্তিকে কখনো মাতা কখনো কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। উমা মেনকা গিরিরাজ ও শিবের কাহিনীটিও এমনি একটি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার রসে আপ্লুত ছাঁচ। এই সব কাহিনী ভূপ্রোথিত সেই লৌহশলাকার মতো যাহাকে অবলম্বন করিয়া আকাশের বিদ্যুৎ অনায়াসে ভূগর্ভে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই সব কাহিনীর মধ্যে দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব আরোপিত হওয়ায় সহজে মানুষের হৃদয়ে তাহা প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সব ছাঁচের কোনোটাই গ্রহণ করিলেন না। তিনিও ভগবানকে প্রণয়ীরূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে,

কখনো কখনো মাতারূপে কল্পনা করিয়াছেন সত্য—কিন্তু প্রচলিত কোনো ছাঁচকে গ্রহণ করেন নাই। করিলে হয়তো তাঁহার এই পর্বের কবিতা বাঙালী পাঠকের হৃদয়কে আরো গভীর ভাবে স্পর্শ করিত; 'তুমি' ও 'আমি' -রূপ সর্বনামের সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডল হইতে তাঁহার কাব্য নামিয়া আসিয়া পরিচিত প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে আশ্রয় পাইত। আবার হয়তো সেইজন্যই তাঁহার কাব্যের সার্বভৌম রূপ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইত। মোটের উপরে স্বীকার করিতে হয় যে নৈবেদ্য হইতে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত কাব্য ভূকেন্দ্রিক নয়, ভগবৎকেন্দ্রিক। এসব কাব্য পাঠকের সাধারণ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়—কারণ ইহার ব্যক্তি ভাবলোকাশ্রয়ী মানুষ।

('বলাকা'তে নূতন জগৎ, নূতন মানুষ। বলাকা না ভূকেন্দ্রিক, না ভগবৎকেন্দ্রিক, বলাকা কাব্য সমাজকেন্দ্রিক। বলাকার মানুষ না গৃহাশ্রয়ী মানুষ, না ভাবাশ্রয়ী মানুষ, বলাকার মানুষ সমাজাশ্রয়ী মানুষ। সে মানুষ একক সিদ্ধিতে, একক সাধনায়, ব্যক্তিগত মুক্তিতে বিশ্বাসী নয়। সে হয় সকলের সহিত যুক্ত হইয়া ভাসিবে, নয় সকলের সহিত যুক্ত হইয়া ডুবিবে। সে নিজের মধ্যে সমস্ত ইতিহাসকে ধারণ ও অনুভব করিতেছে। এ মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যে পূর্বে ছিল না, এবারে নূতন দেখা দিল।[৩])

(বলাকা কাব্যের দ্বিতীয় অভিনবত্ব—এখানে তিনি সহসা 'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র মুখোমুখি উপস্থাপিত হইয়াছেন।

> বহুদিনকার
> ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
> সহসা কী মনে ক'রে
> পত্র তার পাঠায়েছে মোরে

৩ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে এই সঙ্কল্প আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে কবিতাটি এককসিদ্ধির পথ অবলম্বন করিয়াছে।

উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।
লিখেছে সে
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
... ...
লিখেছে সে
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।[৪]

'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান এখন কবির মনে একটি রহস্যময় fact রূপে দেখা দিল ; এখন হইতে এই fact কবির জীবনে বিচিত্র ছায়াতপ রচনা করিয়া চলিতে থাকিবে ; দুর্জয় কাল যাহা এক হাতে হরণ করিয়াছে তাহার অন্য হাত হইতে তাহা ফিরিয়া পাইবার আশায় কবির কল্পনা আন্দোলিত হইতে থাকিবে ; আর সেই আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে 'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র আনন্দের দূতীদের চিন্ময়ী মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। মৃত্যুর অনতিপূর্বেও কবি যে-সব কাব্য লিখিয়াছেন তাহাতেও দুঃসাধ্য বেদনার সংবেদ।)

সেই অনেক বছর আগে ক্ষণিকা কাব্য লিখিবার সময়ে বিদায়ী যৌবনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকা হবে সোনা।

৪ ১৩ সংখ্যক, বলাকা

এতবারের পারাপারে
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে!
যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে—
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু-পারে ॥[৫]

সেদিনকার এই আকাঙ্ক্ষা একটা স্বপ্নমাত্র ছিল—কখনো সত্য হইয়া উঠিবে এমন ভরসা ছিল না, কিন্তু আজ হঠাৎ সেই নৌকার দিকে চোখ পড়িতেই—অনেককাল সেদিকে চোখ দিবার অবসর কবির ছিল না—তিনি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর মতো বিস্মিত হইলেন—

"সোনার সেঁউতি দেখি পাটুনীর ভয়
এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।"

কবির যৌবনতরী শুধু স্বর্ণময় হয় নাই, সেই তরীর ক্ষণিকের যামিনীটি দেবময় হইয়া উঠিয়াছে।

আবার অনেককাল আগে কল্পনা কাব্যে 'আদিম বসন্ত'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়
ওগো মধুমাস
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলেস্থলে
হইবে প্রকাশ।[৬]

আজ বহুদিন পরে স্মৃতির দিগন্তের দিকে তাকাইবামাত্র সেই বসন্তের আর এক রূপ দেখিতে পাইলেন—

৫ যৌবনবিদায়, ক্ষণিকা

৬ বসন্ত, কল্পনা

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
... ...
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।[৭]

ঘরের মানুষের দেবতা হইয়া ওঠার মতো বসন্তেরও একপ্রকার deification, দৈবীভবন, ঘটিয়াছে। কল্পনা, ক্ষণিকা লিখিবার পরে দীর্ঘকাল কবি আর জীবনের দেহাশ্রয়ী রূপটার দিকে তাকাইবার অবকাশ পান নাই, নৈবেদ্য খেয়া গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতি দেহাতীত রূপের কাব্য। তার পরে যখন দেহাশ্রয়ী রূপের দিকে চোখ পড়িল, কবি দেখিলেন fact হিসাবে যে-যৌবন চলিয়া গিয়াছিল, superfact হিসাবে আবার তাহার প্রত্যুদয় ঘটিয়াছে, fact হিসাবে যে-ব্যক্তি আর জীবিত নাই—superfact হিসাবে সে আজ সর্বময়।

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।[৮]

Fact-কে অস্বীকার না করিয়া superfactএর মূল্য উপলব্ধির

৭ ২৫ সংখ্যক, বলাকা

৮ ছবি, বলাকা

চেষ্টায় বলাকা কাব্যের দ্বিতীয় অভিনবত্ব।)

(বলাকার তৃতীয় অভিনবত্ব—এর নিয়মিতশ্লোকবন্ধ-মুক্ত ছন্দ, যাহা এখন বলাকার ছন্দ নামে চলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভবের পরে বলাকার ছন্দ উদ্ভব সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ আবিষ্কার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিকে পয়ারের নিয়মিত গতি হইতে মুক্তি দিয়াছিল, এবারে বলাকার ছন্দ কবিকে নিয়মিত শ্লোকবন্ধ হইতে মুক্তি দিল। অমিত্রাক্ষর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে স্বাধীন গতি দিয়াছে, এবারে বলাকার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ছন্দে গতিদান করিল। পয়ারে ও নিয়মিত শ্লোকবন্ধে কবি অনেক পরিমাণে ছন্দের অধীন, অমিত্রাক্ষরে ও বলাকার ছন্দে ছন্দ কবির অধীন। ইংরেজিতে যাহাকে verse paragraph বলে, ব্যাখ্যাচ্ছলে যাহাকে আমরা কবির প্রয়োজনানুযায়ী ছন্দের ব্যূহসজ্জা বলিতে পারি—এই দুই ছন্দ তাহার পত্তন করিল।)

বলাকার ছন্দ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

> ছাঁদনের বাঁধন খোলবার চেষ্টা আমার চিরকালের। সঙ্গীতেও এ কাজ আমি কালমৃগয়া, বাল্মীকি-প্রতিভার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত করে এসেছি, গালাগালিও খেয়েছি বিস্তর। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি বুঝতে পারলাম যে বাংলা ছন্দেও নতুন পথ মিলতে পারে। ইচ্ছে করে নয়, স্বভাবতই এটা ঘটে গেল। তারকার আত্মহত্যা কবিতায় পুরানো ছন্দের বাঁধন অনেকটা খসে গেল। প্রভাতসঙ্গীতে, ছবি ও গানে, শৈশবসঙ্গীতে এই চেষ্টা সমানভাবে চলেছে। মানসীর যুগে আমি যেন এই পথে আরও নতুন আলোক পেলাম। বলাকার ছন্দের পুর্বরূপ দেখতে পাবেন মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়। এখানে সাবেক ছন্দকে ভেঙে নতুন ক'রে ছন্দকে পেলাম।…এতকাল যা কৃত্রিম ভাবে কাটা সোজাসুজি খাল ছিল তা এখন বাঁকাচোরা নদী হল। জীবনের প্রবাহ তার স্বাভাবিক পথ পেলো।[১]

১ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৪০—ক্ষিতিমোহন সেন

কবি যে দুটি কবিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের কতক অংশের পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।—

জ্যোতির্ময়\তীর হতে আঁধার-সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্রতলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চিরনির্বাপিত ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান।[১০]

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা…
রবি অস্ত যায়,
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশের আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।[১১]

১০ তারকার আত্মহত্যা, সন্ধ্যাসঙ্গীত ১১ নিষ্ফল কামনা, মানসী

এবারে বলাকার 'ছবি' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধার করা যাক—

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?[১২]

তিনটি কবিতার মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার অবান্তর; প্রথম দুটি কাঁচা-হাতের পরীক্ষা, তৃতীয়টি পাকা-হাতের সাফল্য। তবু মিলাইয়া দেখিলে কিছু জ্ঞাতব্য পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম দুটির শ্লোকবন্ধ-মুক্ত রূপ অনেকটা accident, এক-আধ বারের জন্য কবি শ্লোকবন্ধ-মুক্ত ছন্দে আসিয়া আবার শ্লোকবন্ধে ফিরিয়া গিয়াছেন। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি শ্লোকবন্ধ-মুক্ত, আর সেই সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাসহীন। এখন, শ্লোকবন্ধ-মুক্ত ছন্দের সাফল্য নির্ভর করে verse paragraph রচনার কৌশলের উপরে। এই verse paragraphকে রূপান্তরে একপ্রকার শ্লোকবন্ধ বলা যাইতে পারে—যদিচ ইহা অনিয়মিত ও কবির ইচ্ছাধীন। 'তারকার আত্মহত্যা' ও 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি ক্ষণেকের জন্য শ্লোকবন্ধ-মুক্তি লাভ করিয়াছেন অথচ verse paragraphingএ পৌঁছিতে পারেন নাই—অর্থাৎ তিনি নিয়মের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন বটে কিন্তু যে অন্তর্নিহিত বৃহৎ বন্ধন স্বীকার না করিয়া লইলে মনের ভাব শিল্পকলা হইয়া উঠিতে পারে না সেই বন্ধনকে তিনি পান নাই। বলাকার প্রত্যেকটি শ্লোকবন্ধ-মুক্ত কবিতা যে সার্থক সৃষ্টি তাহার কারণ

১২ ছবি, বলাকা

ইহাদের verse paragraphing ত্রুটিহীন—ইহারা নিয়মিত শ্লোকবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়াও অন্তর্নিহিত বৃহৎ বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বোধ করি শ্লোকবন্ধের শিক্ষানবিশি সম্পূর্ণ না হইলে শ্লোকবন্ধমুক্ত কবিতা রচনার কলম খোলে না। দীর্ঘকাল কবি শ্লোকবন্ধযুক্ত কবিতা লিখিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ ১৩২১ সালের ৩রা কার্তিকে এলাহাবাদে এই সম্পূর্ণ নূতন পথ কেন গ্রহণ করিতে গেলেন? খুব সম্ভব প্রকাণ্ড ও অপ্রত্যাশিত একটি আঘাত ইহার কারণ। বহুকাল আগে পরলোকগত কোনো প্রিয়জনের ছবি কবির স্মৃতিলোকে অপ্রত্যাশিত আঘাত হানিয়া শ্লোকবন্ধের সংকীর্ণ জগৎ হইতে কবিকে মুক্তি দান করিল। এই মুক্তি ব্যাপারটাকে একটু বড় করিয়া দেখিতে হইবে—ইহা কেবল আঙ্গিকের রূপান্তর নয়, অন্তরেরও রূপান্তর। (বলাকা কাব্যের সময় হইতে কবির কাব্যজগতে যে সব নূতন ভাবের পদসঞ্চার দেখা যায়, তাহার প্রথম নিশ্চিত পদপাত এই 'ছবি' কবিতায়। আগে বলিয়াছি কবি বলাকা কাব্য রচনাকালে সহসা 'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র মুখোমুখি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ছবিখানি সেই 'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র সমস্ত মাধুর্য সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত আনন্দ ও করুণা বহন করিয়া 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল একবিন্দু নয়নের জলে'র মতো দেখা দিল। এই ছবির আঘাতে 'ছাঁদনের বাঁধন মুক্ত' কবিকে নৈবেদ্য খেয়া গীতাঞ্জলি প্রভৃতির উচ্চবায়ুমণ্ডলের অতীন্দ্রিয় লোক হইতে সাধারণের অনুভবগম্য ইন্দ্রিয়লোকের কাছাকাছি নামাইয়া আনিল। পাঠকে যেন পুরাতন দিনের পরিচিত কবিকে নূতন ভাবে পাইল।)

॥ ৩ ॥

(এবারে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলিকে বিশদতর করিতে প্রয়াস পাইব। বলিয়াছি যে বলাকার কতকগুলি কবিতার প্রেরণা হইতেছে

বিশ্বব্যাপী একটি সামাজিক বেদনা—এই বৃহৎ পটভূমি সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে কবিতাগুলির যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও বলিয়াছি যে—এ ব্যাপারটি রবীন্দ্রকাব্যে নূতন বটে। বিশ্বব্যাপী যে সামাজিক বেদনা হইতে কবিতাগুলি উদ্ভূত, কবি-কথিত সেই ইতিহাসটি শোনা যাক।)

কবি বলিতেছেন—

> ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। হিমালয় রামগড়ে আছি; মীরা ও বৌমা আমার সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে-সব কথা তারা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম। খবর পাই নি, প্রমাণ পাই নি, তবু মনে হচ্ছিল সারাজগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলেছে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কাবতা একে একে এলো। বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পঙ্‌ক্তিগত যোগ রয়েছে। তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে। তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এদেশে আসেনি—আমার চার নম্বর কবিতা লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম। তবু কি এক অব্যক্ত কারণে আমার মনের সেই বেদনা এই কবিতাগুলিতে বেরিয়ে এসেছে।[১৩]

১৩ চার নম্বর কবিতা লিখিত হয় ১২ই জ্যৈষ্ঠ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে তার অনেক পরে ১লা আগস্ট তারিখে। কবির এই সময়ের মনের অবস্থা ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্কলিত বলাকা-কাব্য-পরিক্রমায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সামাজিক অশান্তির প্রেরণামূলক কবিতা কেবল ২, ৩, ৪ নয়—আরো অনেকগুলি, যথা—৫, ১১, ৩৭, ৪৫ নম্বর প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৫৯।

হঠাৎ মনে হইতে পারে এ রকম কবিতা তো রবীন্দ্রকাব্যে নূতন নয়, আগেও আছে, যথা—চিত্রা কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে', কল্পনা কাব্যের 'অশেষ' প্রভৃতি। কিন্তু কেন যে এসব কবিতা বলাকা পর্যায়ের কবিতা হইতে ভিন্ন 'এবার ফিরাও মোরে' প্রসঙ্গে আগে বলিয়াছি—'অশেষ' প্রসঙ্গে আবার বলা যাইতে পারে।

বলো তবে কী বাজাবো,
ফুল দিয়ে কী সাজাবো
তব দ্বারে আজ,—
রক্ত দিয়ে কী লিখিব,
প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ।[১৪]

তোমার কাছে আমার চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।[১৫]

—বুঝি একই ভাবপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পটভূমি সম্বন্ধে খেয়াল না করিয়া কেবল আক্ষরিক অর্থ করিলে এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুত এ দুটি কবিতার প্রেরণা সম্পূর্ণ পৃথক। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া দিলে ভেদটা বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ সালের ও ১৯১৩ সালের পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের তুলনামূলক আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি বলিতেছেন—

> সেবার গীতাঞ্জলিতে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন, ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারকার সামাজিক জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্যসহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার

১৪ অশেষ, কল্পনা

১৫ ৪ সংখ্যক, বলাকা

সমাজজীবনের নিত্যসহচর The Eternal Individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।[১৬]

বিষয়টা গভীর ও জটিল—অথচ যথার্থ পণ্ডিতের হস্তক্ষেপে কত স্বল্প-পরিসরে, কত অনায়াসে স্বচ্ছ ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

(বলাকা যে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে একটি প্রকাণ্ড মোড় ঘুরিবার স্থান তাহা এই জন্যে। ইহার পূর্বে ছিল কবির সঙ্গে জগতের ও ভগবানের লীলা। এ কবি ততটা সামাজিক মানুষ নন যতটা মানবাত্মার বা ব্যক্তিগত সত্তার প্রতিনিধি। বলাকায় পাইলাম সেই কবিকে যিনি সামাজিক মানুষ, সমাজের ও কালের প্রতিনিধি, বিশেষ সমাজের ও বিশেষ কালের প্রতিনিধি। আগে দেখিয়াছি লীলা, এখানে দেখিতে পাইলাম সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব। ব্রজেন্দ্র শীলের ভাষায়—এখানে 'সমাজজীবনের নিত্যসহচর The Eternal Individual'-এর সংগ্রাম। কাহার সহিত? সমাজের অকল্যাণ, অন্যায়, অবিচার, অব্যবস্থতার সহিত। সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সমাজকে আঘাত করিয়াছে—'সমাজ-জীবনের এই নিত্যসহচর'; এখানে কবি সমস্ত সংগ্রামী সামাজিক মানুষের প্রতিনিধি। সে মুক্তধারা নাটকের স্বব্যবস্থাবিদ্রোহী রাজপুত্র অভিজিৎ। ভাবনার এ পর্যায় বলাকায় নূতন, বলাকার পরে এ ভাবটি আর রবীন্দ্রকাব্যকে পরিত্যাগ করে নাই—নিতান্ত ঘরের কথার দেয়ালেও হঠাৎ যখন চিড় খাইয়াছে, অমনি সেই বিশ্বব্যাপী সামাজিক বেদনার অগ্নিশিখা চোখে পড়িয়াছে—)

ফিনল্যাণ্ড হল ধ্বংস সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।[১৭]

১৬ রবীন্দ্রজীবনকথা, পৃ ১৩১, ১ম সং—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৭ যাঁরা উত্তর-রবীন্দ্রকাব্যকে সাম্যবাদী সাহিত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাম্যবাদী সাহিত্যে সমাজজীবনের নিত্যসহচর "The Eternal Individual"-এর স্থান নাই—সে স্থান গ্রহণ করিয়াছে "The State"! রবীন্দ্রসাহিত্যের, তথা বিশ্বের যাবতীয় শাশ্বত সাহিত্যের, অবলম্বন

(বৃহৎ বিশ্বের সামাজিক বেদনার প্রেরণায় লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'দূর হতে শুনিস কি মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন' (৩৭ সংখ্যক কবিতা)। নিয়মিত শ্লোকবন্ধে রচিত কবিতাগুলিতে এই বৃহৎ বেদনা তেমন উৎকট-ভাবে প্রকাশ পায় নাই—খুব সম্ভব নূতন বেদনার জন্য নূতন আধারের আবশ্যক ছিল, তাহা ছাড়া এই কবিতাটি লিখিবার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বেদনার রূপ যে কি ভয়ানক হইতে পারে সে সংবাদ নিত্য পাওয়া যাইতেছে—সেই বেদনার প্রেরণায় ছন্দ এখানে 'উঠিছে তরঙ্গিয়া, কূল উল্লঙ্ঘিয়া', ঝড়ের হাওয়ায় উন্মত্ত ছন্দের সমুদ্রতরঙ্গ নিরন্তর পাঠককে আঘাত করিতে থাকে। বর্ষশেষ কবিতায় ছন্দের দুর্জয় ঝাপটা আছে সত্য, কিন্তু সেখানে নায়ক কবি, এখানে নায়ক বিশ্ব-মানব, দুয়ে প্রকাণ্ড ভেদ। এই ভেদটা বলাকা কাব্যের একটি প্রধান সত্য, একটি উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব।[১৮] এবারে অভিনবত্বটির আলোচনা করা যাইতে পারে।)

॥ ৪ ॥

৬, ৭, ৮ সংখ্যক কবিতার এক সঙ্গে এক সূত্রে আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমটির বিষয় একখানি ছবি।[১৯]

হইতেছে—The Individual, সে কেবল Eternal বা চিরন্তন নয়—সে চিরজয়ী, চিরযুবা এবং সর্বপ্রকার বিভূতির চিরস্থির আশ্রয়। এই দুস্তর ভেদ যাঁহারা গোঁজামিল দিয়া মীমাংসা করিতে চান খুব সম্ভব বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন নন।

১৮ কবিকৃত ৩৭ সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যা—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ১৯৭, ১ম সং—ক্ষিতিমোহন সেন

১৯ ছবিটি কাহার তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। এখন সে বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) "চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই ছবি খুব সম্ভব কবির পত্নীর।

(দ্বিতীয়টির বিষয় তাজমহল। তৃতীয়টির বিষয় এলাহাবাদের নদী।[২০] তিনটি কবিতার আলোচনা একসঙ্গে একসূত্রে করা উচিত বলিয়াছি, সেই সঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে রচনার কালানুক্রমে

(রবিরশ্মি—পৃ ১৩৬)। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতে ছবিখানি কবির বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আলেখ্য।" (রবীন্দ্রজীবনী, পৃ ৩৬২, পরিবর্ধিত সং, —প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

(২) "সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে তাঁর বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর ছবি সুপ্রকাশের (ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের পুত্র) ঘরে দেখে বহুকালের ভুলে-যাওয়া কথা মনে হল।" (রবীন্দ্রজীবন-কথা, পৃ ১২৬, ১ম সং—প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

(৩) "ভাগ্নে সত্যপ্রকাশের জামাতা শ্রীমান্ প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রয়েছি। এইখানে একটি ছবি দেখে (তাঁরই পরলোকগতা পত্নীর ছবি—পাদটীকা) আমার মন মহাযুদ্ধ ও বিশ্বসমস্যার পথ হতে মুক্তি পেয়ে নূতন পথ ধরল। ছবি কবিতায় আমার নিজের মনের বেদনার প্রকাশ।" (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৬৮, ১ম সং—ক্ষিতিমোহন সেন)

ছবি কাহার এ সমস্যা সমাধানের পথ এতগুলি মতামতের পরে সত্যই দুর্গম। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মহলানবিশ রবীন্দ্র-জীবন-বিশেষজ্ঞ—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ও তাই। তবে তাঁহাদের মতের সমর্থনে প্রমাণ তাঁহারা দেন নাই। অপর পক্ষে ক্ষিতিমোহন সেন স্বয়ং কবির জবানী উদ্ধার করিতেছেন। তবে এখানেও একটু গোলযোগের স্থান আছে বলিয়া আশঙ্কা—পাদটীকা কবি-কথিত না লেখকের অনুমান প্রকাশ নাই। সাধারণের ধারণা ছবিখানি কাদম্বরী দেবীর। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমায় প্রকাশিত মন্তব্য ঐ ধারণার প্রতিকূল—অবশ্য যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পাদটীকা কবি-কথিত বা কবি-সমর্থিত।

২০ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কবিতাদুটির নামান্তর। শা-জাহান কবিতার পূর্বনাম ছিল তাজমহল আর চঞ্চলা কবিতার ছিল নদী। আবার ইহাদের রচনাকালও মনে রাখিবার মতো। ছবি—রাত্রি, ৩রা কার্তিক, ১৩২১; শা-জাহান—রাত্রি, ১৪ কার্তিক, ১৩২১; চঞ্চলা—রাত্রি, ৩রা পৌষ, ১৩২১। তিনটিরই রচনাস্থান এলাহাবাদ। তিনটিরই রচনাকাল রাত্রি। আকস্মিক? দিনের বেলায় লোকসমাগমে সময়াভাব না অন্য কোন কারণ আছে?

আলোচনা হওয়া উচিত। প্রথমে ছবি কবিতাটি, কবির প্রিয়জনের ছবি। নিজের প্রিয়জনের ছবি হইতে এক পা বাড়াইয়া শা-জাহানের প্রিয়জনের স্মৃতিমন্দিরে পৌঁছানো অসম্ভব নয়—বস্তুত সেইভাবেই কবি পৌঁছিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। এবারে তৃতীয় কবিতাটির বিষয়ে পৌঁছিবার সূত্র কি? ছবি ও তাজমহল শিল্পবস্তু। শিল্পবস্তুতে যে সত্য কবি দেখিতে পাইলেন বাস্তবে তাহাকে পরখ করিবার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের সতত প্রত্যক্ষ বাস্তব নদীর দিকে কবির চোখ পড়িবে ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। ছবির বিষয় যেমন ছবির পটকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, শা-জাহানের প্রেম যেমন তাজমহলের পাথরগুলাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—নদীর প্রবাহকে তেমনি ছাড়াইয়া গিয়াছে নদীর অন্তর্নিহিত সত্তা যাহাকে কবি নাম দিয়াছেন 'চঞ্চলা'।[২১])

(কবিতার বিষয়টি নদী—তাহার ভাবপরিণাম যাহাই হোক না কেন—এই কথাটির উপরেই আমি কিছু জোর দিতে চাই, তাই কিছু বিস্তারিত ভাবেই কবিকৃত স্বীকৃতি ও ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

> আট নম্বরের কবিতার ব্যাখ্যা শুনলে মনে হতে পারে যেন আমি প্রাণ ও জীবনের তত্ত্ববাদের (abstract of life and spirit) রহস্য বা ঐ রকম আর একটা কিছু বলতে চাই। কিন্তু আসলে সে-সব কিছুই নয়।
>
> পৌষ মাস। এলাহাবাদের পৌষ মাস। খুব শীত। পরিষ্কার আকাশ। ছাতে বসে আছি। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকুও মিলিয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো। তার পর আকাশের পটে পুঞ্জ পুঞ্জ তারা ফুটে উঠলো। কাছে কেউ ছিল না। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমার মন যেন অসীমের অপূর্ব পরশ পেয়ে রসের গভীরতায়

২১ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বস্তু হইতে তত্ত্বে যায়, তত্ত্ব হইতে বস্তুতে নয়। কাজেই তাজমহল ও নদী নাম দুটাই অধিকতর ইঙ্গিতসূত্রী ছিল বলিয়া মনে হয়।

একেবারে ডুবে গেল। আকাশব্যাপী অন্ধকারকে মনে হল যেন অদৃশ্য সৃষ্টিধারা, যার বেগ অবোধ্য। এই দৃশ্য নক্ষত্রতারার পুঞ্জগুলি সেই বিরাট সৃষ্টিধারার উপরকার ফেনপুঞ্জ।

পদ্মাতে স্রোতের এই লীলাটি দেখে দেখে আমি অসীম অনন্তের এই রহস্য বুঝি। দেখতাম পদ্মার অবোধ্য বারিবেগ ক্রমাগতই চলেছে, তার বেগের একটু-আধটু অনুমান করা যাচ্ছে তার উপরকার ফেনা দেখে। সেই ফেনাও পদ্মারই বেগে সৃষ্ট। আকাশের এই তারাপুঞ্জের ফেনাগুলিও হয়তো সৃষ্টির বেগেই প্রকাশমান। এদের দিয়েই অদৃশ্য বিরাট বিশ্বধারার পরিচয়। জ্যোতির্বিদেরা এই প্রকাশটুকুই অনুভব করেন, কিন্তু বিরাট বিশ্বগতিকে কি তাঁরা অনুভব করেন? সেই গতি কি শুধু দৃশ্যমান এই পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রে?

তা নয়। কখনোই নয়। বিশ্বের বিরাট গতির পরিচয় আমরা কি জানি? সেই গতি চলেছে সর্ব চরাচর সব অদৃশ্য বিশ্বকে ভরে নিয়ে। তাকে কালই বল, আর যা-ই বল, সর্বচরাচর ভরেই সেই অদৃশ্য গতিবেগ, দৃশ্যজগৎ কতটুকু? সদাসচল বিরাট অদৃশ্য বেগপ্রবাহের উপরে তা শুধু একটুখানি ফেনার মতোই ভেসে চলেছে। ঐটুকু দৃশ্য ফেনামাত্র দিয়ে আমরা তার তলায় চলমান অগাধ অদৃশ্য বিশ্বধারার একটু সূচনা পাই মাত্র। চলেছে যে অসীম চরাচর তার সন্ধান আমরা পাই না। আমরা দেখি তার উপরকার ফেনপুঞ্জের গতিটুকু মাত্র। তার তলায় যে অসীম অগাধ গতি রয়েছে সেটা শুধু ধ্যানযোগে উপলব্ধি করতে হয়।

সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে বিরাট অন্ধকারকে দেখেছিলুম মনে হচ্ছিল, সেই তিমির রাত্রিই যেন এই অদৃশ্য অতল অপার বিরাট বিশ্বনদী। জলে একটা ঢেলা ফেললে প্রথম একটি তরঙ্গচক্র হয়। সেই তরঙ্গচক্র আর একটি বৃহত্তর তরঙ্গচক্রকে উৎপন্ন করে, এমনি করে চক্রমালা বেড়েই চলতে থাকে। অকূল অপার জলে তার শেষ দেখবার মতো শক্তি আমাদের নেই। এরই নাম সংস্কৃতে বীচি-তরঙ্গমালা। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, সৌরজগৎ ঘুরছে আর কোনো তারাকে ঘিরে। আবার সেই তারামণ্ডল ঘুরছে আর কোনো

কিছুর চারদিকে, কোথাও কি তার শেষ আছে? এই ভ্রাম্যমাণ চক্রমালার কোথায় অবসান সেটাও আমাদের ধ্যানগম্য সত্য, প্রত্যক্ষ তার নাগাল পায় না।

প্রাণের অসীম জগতেও চলেছে ঘূর্ণায়মান অনন্ত চক্রমালা। কুঁড়ি হতে ফুল, ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে বনস্পতি—এক অবোধ্য বিরাট ধারা সদাই প্রাণবেগে প্রবহমাণ। আমার শরীরে আমার সর্বাঙ্গে আমার শিরায় শিরায় অণুপরমাণুতে বিশ্বব্যাপী এই তরঙ্গমালা চলেছে। কায়াযোগবাদীরা এই রহস্যের কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই বাউলেরা বলেন—

যা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

বিশ্বজগতের মতো প্রাণজগৎ যে অপার অনন্ত, এই কথা দেখছি আমাদের দেশে অতি পুরাতন। বিশ্বের প্রচণ্ড গতির তালেই আমার মধ্যে প্রচণ্ড গতিবেগ নিরন্তর চলেছে।

আবার জগতের মধ্যে এই যে বসে আছি, মনে হচ্ছে কি শান্ত কি স্থির বসে আছি অথচ অহরহ অসীম বেগে চলেছি। আমার চারিদিকে দূরাৎ সুদূর বিরাট জগতে যেমন নিরন্তর গতি, আমার ভেতরেও দেহের অণুপরমাণুতে তেমনি নিরন্তর অদৃশ্য গতি। কী বিরাট এই বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহ তাই ভাবি। সূর্য চন্দ্র তারাতে তার উপরকার একটু আভাস মাত্র দেখা যাচ্ছে। অতল ধারার ফেনাতে সূচিত যেন তার একটু ইশারা। আবার আমাদের জনমে মরণে উত্থানে পতনে আমাদের ইতিহাসে সেই অতল অপার অদৃশ্য প্রাণধারার উপরকার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র পাই। সবই সেই সৃষ্টির উপরকার একটুখানি ফেনা। আমরা তার শান্ত মূর্তিটুকু মাত্র দেখি কিন্তু বস্তুত সব শূন্য পূর্ণ করে ভেসে চলেছে অন্তহীন প্রাণধারা। সেই অন্তহীন বিকাশ-বিলয় উত্থান-পতনের কতটুকুই বা ফেনা হয়ে আমাদের ধরা দেয়?

ভ্রাম্যমাণ নিখিল চরাচরের এই অদৃশ্য বিরাট প্রবাহকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে পুলকিত হয়ে লিখেছিলাম—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিস্তব্ধ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

কাজেই এই কবিতাটি একটি তত্ত্বমাত্র নয়, এ আমার আনন্দরূপ। তবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো এটাই তত্ত্ব হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত পদ্মার প্রবাহের মতো সৃষ্টির অসীম অনন্ত প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করে অপূর্ব আনন্দে তাকে প্রকাশ করেছিলাম। এর সত্যরূপ আনন্দরূপ অনুভব করা চাই। নইলে আমার এই কবিতাটির স্বরূপ ঠিক উপলব্ধি হবে না।

আমি বহুকাল ছিলাম নদীর উপরে, তাই এই বিশ্ববেগ সেদিন আমার কাছে কালোরাত্রির পদ্মানদীর মতোই বোধ হল। সেই অদৃশ্য বিরাট বিশ্বনদীর উপরকার ফেনা যেন থেকে থেকে আমার কাছে দীপ্যমান হয়ে উঠছিল, যেন gleam করছিল।[২২]

(ছবি, শা-জাহান ও চঞ্চলা একসূত্রে অধ্যয়ন করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে তিনটি কবিতার মধ্যেই একবার করিয়া মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা আছে, পূর্বকথনকে অস্বীকার করিবার প্রয়াস। আপাত-দর্শনে ইহা এক প্রকার অসঙ্গতি—কিন্তু উহাতেই কবিতাগুলির রহস্য আরো জমাট হইয়া উঠিয়াছে।)

ছবি কবিতার মাঝামাঝি আসিয়া কবি হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছেন—

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।[২৩]

আবার অনুরূপ ভাবে শা-জাহান কবিতায় কথিত হইয়াছে—

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই।
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।[২৪]

---

২২ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৭২-৭৫, ১ম সং—ক্ষিতিমোহন সেন

২৩ ছবি, বলাকা ২৪ শা-জাহান, বলাকা

আর চঞ্চলা কবিতায়—

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।[২৫]

ছবির বিষয় পট, রেখা, রঙকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই সত্য, শা-জাহানের মানবাত্মার প্রবাহ তাজমহলের উপলখণ্ডগুলিকে ডিঙাইয়া গিয়াছে বলিয়াই সত্য; আর নদীর নিত্যবহমানা ধারা তাহার কূলের বন্ধনকে চরম বলিয়া গ্রহণ করে নাই বলিয়াই সত্য। তবে সেই সত্যের উপলব্ধিটা কোথায়? বিশ্বসৌন্দর্যের মাঝে, বিশ্বচ্ছন্দের মাঝে তাহাদের সৌন্দর্য ও গতি সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে—তাহারই উপলব্ধিতে সেই সত্যের উপলব্ধি।

আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।[২৬]

আবার—

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে।[২৭]

আর—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

২৫ চঞ্চলা, বলাকা

২৬ ছবি, বলাকা

২৭ শা-জাহান, বলাকা

নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর ওঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;[২৮]

কবিতা তিনটির বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে তিনটিতেই কবির মনে একই প্রেরণা, একই অভিজ্ঞতা, একই ফলশ্রুতি। ছবি ও তাজমহল শিল্পবস্তু, গঙ্গানদী বাস্তব ;—ছবি ও তাজমহল কৃত্রিম ও স্থাণু, গঙ্গা নৈসর্গিক ও চঞ্চল—কিন্তু কবির চক্ষে তাহারা সত্যের একই পর্যায়ভুক্ত। সেই সত্যটি হইতেছে লক্ষ্য-হীন 'অকারণ অবারণ চলা'। সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপার কবির কাছে একটি নিরবচ্ছিন্ন অন্তহীন গতি রূপে ধরা পড়িতে চলিয়াছে। তবে এখনো ইহার পূর্ণ উদ্ভাস কবির কাছে ঘটে নাই—খণ্ডশ ঘটিতেছে মাত্র, পূর্ণ উদ্ভাস ঘটিবে আরো একটা বছর পরে শ্রীনগরে বলাকার পক্ষ-বিধূননের ফলে। এ সমস্তই সেই অনাগতবিধাতার ভূমিকামাত্র।[২৯]

সেই বৃহৎ প্রসঙ্গে প্রবেশ করিবার আগে ছবি কবিতাটি সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা সারিয়া লই। ছবি কবিতাটির গুরুত্ব আগেই নির্দেশ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের অনুমানের চেয়েও অনেক বড় প্রমাণ আছে ইহার অনুকূলে। স্বয়ং কবি বলিতেছেন—

> এইখানে একটি ছবি দেখে আমার মন মহাযুদ্ধ ও বিশ্বসমস্যার পথ হতে মুক্তি পেয়ে নূতন পথ ধরল। ছবি কবিতায় আমার নিজের মনের বেদনার প্রকাশ।[৩০]

২৮ চঞ্চলা, বলাকা

২৯ ছবিখানি যে কবিপত্নীর এই ধারণা শা-জাহান-পত্নীর সমাধি তাজমহলকে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ সমর্থন করে। ইহা গতানুগতিক অর্থে logic নয়—কিন্তু passion যে-logic-কে অনুসরণ করে ইহা তাহাই।

৩০ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৬৮, ১ম সং—ক্ষিতিমোহন সেন

প্রিয়জনের এই ছবিখানি কবির মনকে অতীতের বেদনালোকে নিক্ষিপ্ত করিল—সোনার তরী চিত্রা চৈতালিতে যে বেদনালোকের বিস্তারিত অভিব্যক্তি, ক্ষণিকা ও কল্পনা কাব্যের পরে যে বেদনা-লোকের সন্ধান আর লওয়া হয় নাই, যে বেদনালোকের অস্তিত্ব কবি এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, যাহার পালা চুকিয়া গিয়াছে বলিয়াই কবি ধরিয়া লইয়াছিলেন। আজ ঐ চিত্রদূত অতর্কিত ইঙ্গিতে কবির মনকে আবার সেই বেদনালোকে আকর্ষণ করিল; চোখে পড়িল, জীবনের পূর্বাচলের মেঘমালা অস্তাচলের মূলে সোনার বাসর রচনা করিয়া একটি অলৌকিক মায়া সৃজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই মুখগুলি অথচ ঠিক সেই নয়, সেই যৌবন অথচ ঠিক সেই নয়, সেই প্রেম অথচ ঠিক সেই নয়। কোথায় যেন একটুখানি অনির্বচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়া সমস্ত এক দিব্যবিভূতি লাভ করিয়াছে। বিস্মিত কবির মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরিতে চাহে না। এই মুগ্ধ বিস্ময়ের প্রকাশ—বলাকার যৌবন-সংক্রান্ত কবিতাগুলিতে।[৩১]

প্রিয়জনকে নূতনভাবে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিগত যৌবনকেও নূতন ভাবে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কাছে দুই-ই মহৎ আবিষ্কার, মহৎ বিস্ময়। একদিন যে যৌবন চল্লিশের দিগন্তের অশ্রুবাষ্পমধ্যে কাঁদিয়া অস্ত গিয়াছিল পঞ্চাশের দিগন্তের পরপারে তাহার নূতন অভ্যুদয়ে কবির বিস্ময়ের অন্ত থাকে না; কবি দেখিতে পান এ সেই যৌবন বটে—অথচ ঠিক সেই নয়।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।

৩১ বলাকা—১৩, ১৪, ২১, ২৫, ২৬ সংখ্যক কবিতাগুলি

গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
... ...
লিখেছে সে—
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।

এ কি অপ্রত্যাশিত আহ্বান।

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।[৩২]

এ কি আনন্দময় সুসংবাদ। সেদিনের যৌবনের এ কি নূতন রূপ। কবি ইহাকে প্রৌঢ়ের যৌবন অভিহিত করিয়াছেন, যে যৌবন ভোগবতীর পারে আনন্দলোকের ডাঙা দেখিয়াছে বলিয়া আর ফল চায় না 'একেবারে ফলতে চায়'।

সেই সঙ্গে আরো চোখে পড়িল এই প্রৌঢ়ের যৌবনের প্রতিষ্ঠা-ভূমিস্বরূপ বসন্তের আর এক নূতন মূর্তি। সেদিনের বসন্তের প্রগল্‌ভতা আজ কোথায়? আজ যে বসন্ত ও যৌবন দুই-ই অপ্রগল্‌ভ ও অপ্রমত্ত। আজ সেই বসন্ত —

অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে এ বসন্ত 'প্রৌঢ়ের

৩২ ১৩ সংখ্যক, বলাকা

৩৩ ২৫ সংখ্যক, বলাকা

বসন্ত'—আর ইহাই হইতেছে সেই ভোগবতী-পরপারবর্তী সেই আনন্দলোকের ডাঙা ক্ষণে ক্ষণে যাহা প্রৌঢ়ের বসন্তের চোখে পড়িতে থাকে। কালিদাসের ভাষায় ইহাদের উত্তরযৌবন ও উত্তরবসন্ত বলা যাইতে পারে। ঐ ছবিখানির সূত্রে[৩৪] কবির এই নব আবিষ্কৃতি। আর ইহার জের কবির জীবনশেষের কাব্য পর্যন্ত চলিয়াছে; বলাকা, ফাল্গুনী, পলাতকা, পূরবীতে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ।

এ ছবি দর্শনের অভিজ্ঞতায় কবির মন যখন বিশ্ববেদনার প্রকাশ্য ভূমি হইতে অন্তর্বেদনার গোপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, দুই ভিন্ন জগতের দোটানায় যখন তিনি দোমনা—সেই চিত্তসন্ধির উপরে একটি সুমহৎ অভিজ্ঞতা সোনার কাজ করা বৃহৎ হাতুড়ির মতো নিক্ষিপ্ত হইল—কবির চিন্তার যে জোড় ভাবনাচক্রে শিথিলপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল —ঐ অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া গেল; কবির জীবনে আর এক নূতন ভাবপর্যায়ের সৃষ্টি হইল।

॥ ৫ ॥

ঠিক এক বৎসর পরেকার ঘটনা। কবি তখন আছেন কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপরে হাউস বোটে। এবারে কবির মুখের কথা শোনা যাক।

কবি বলিতেছেন—

> কাশ্মীরে ছিলুম ঝিলমের উপরে। পদ্মায় থাকতে যেমন মনোভাব হত সেইমতো আবার একটা ভাব মনকে ভরপুর করে রয়েছে। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ আমার মাথার উপর দিয়ে একদল বলাকা চলে গেল। চারিদিকের মৌনস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো বলেই যে বলাকা আমার মনকে টানলো তা নয়। বলাকার মধ্যে একটি মর্মকথা (Idea) আছে যার জন্যে এই 'বলাকা' লেখা। নদীর চরে পাখী

৩৪ ঐ ছবিখানির অভিজ্ঞতা হইতেই লীলাসঙ্গিনী কবিতাগুলির সৃষ্টি

বাসা নিলো, ডিম পাড়লো, সব ঠিক করে বসলো। তখন আবার কোথা হতে তার কিসের আবেগ এলো যে এক অজ্ঞাত বাসার দিকে সে উড়ে চললো। সর্বত্রই তো এই চলবার লীলা। নদীগিরি অরণ্য জীব চরাচর সবাই চলেছে। পৃথিবী সূর্য সৌরজগৎ নীহারিকা সবাই মিলে বলাকার মতো কোন্ এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে উড়ে চলেছে। কেনই বা চলবার এমন ব্যাকুলতা—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,
অন্য কোন্‌খানে।

এই যে সার বেঁধে চলা এই তো বিশ্বসঙ্গীতের স্বরপংক্তি।[৩৫]

ঐ প্রসঙ্গে কবি আবার বলিতেছেন—

আমি চিরদিনই নিজেকে নদীর চরের হাঁসের মতো দেশান্তরের পাখী মনে করেছি। হংসের মতো আমিও যেন এসেছি কোন্ মানসলোক হতে। যেদিনই অজানার ডাক আসবে, সেদিনই আবার উড়ে চলে যেতে হবে। এই জন্য দীর্ঘদিন আমি কোনো কিছুতে বাঁধা পড়তে পারি নি। আমার জীবনে নিত্য-নূতনের ডাক আছে। মুকুলকে বিদীর্ণ করে ফুল আসে, ফুলকে অতিক্রম করে আসে ফল, ফলকে ছাড়িয়ে বীজ, বীজের বাঁধন ভেঙে বের হয় অঙ্কুর।[৩৬]

বলাকা কবিতাটি রচনার মূলে যে ঘটনা—হংসপংক্তির পক্ষ-বিধুননে কবিচিত্তের অকস্মাৎ চমক, ইহাকে অর্থাৎ এই ঘটনাজাত অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের দ্বিতীয় সুমহৎ অভিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। প্রথম সুমহৎ অভিজ্ঞতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার প্রেরণার অভিজ্ঞতা। একটি যৌবনের প্রারম্ভে, আর একটি প্রৌঢ়ত্বের অবসানে; একটি বৃহত্তম নগরের রাজপথের পার্শ্বে, আর একটি বৃহত্তম গিরিমালার নির্জন নদীপথে; একটির কাল প্রভাত, অপরটির সন্ধ্যা। পার্থক্যের আর অন্ত নাই। তৎসত্ত্বেও দুটিই মহত্তম সম্ভাবনায়

৩৫ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ৮৪, ১ম সং—ক্ষিতিমোহন সেন

৩৬ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ১ম সং, পৃ ৮৩—ক্ষিতিমোহন সেন

পূর্ণ। ইহাদের অন্তর্গূঢ় সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি নিজেও সচেতন। এই দুটি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাই তাঁহার বিচার-আলোচনার আর অন্ত নাই। পার্থক্যের কথা বলিয়াছি—আরো পার্থক্য আছে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতা কবির নীহারিকাশ্রয়ী কল্পনাকে একটা বিশিষ্ট গতি ও অভিপ্রায় দান করিয়াছিল। সে গতি ও অভিপ্রায় মানবসংসারাভিমুখী। যে নির্ঝর এতকাল নীহারিকার ক্রোড়ে আত্মবিলীনরূপে ছিল এবার জাগ্রত হইয়া সে বৃহৎ মানবজগতের দিকে চালিত হইল। নদীর রূপকে কবি জগৎ-প্রয়োজনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

বলাকা কবিতার মূলগত অভিজ্ঞতার ধাক্কা কবিকে জগৎবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কানে কানে মন্ত্র দিল—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে"। এই মন্ত্র কবির কল্পনাকে 'হেথা'র ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিয়া নিরুদ্দেশের মধ্যে উধাও করিয়া দিল। অপর পক্ষে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রেরণা কবিকে 'হেথা'র অভিমুখে আকর্ষণ করিয়াছিল—

জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে কবি যে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, যাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টত জগতের আকর্ষণ—অর্থাৎ সীমার আকর্ষণ। আর বলাকা কবিতার মূলে যে প্রেরণা, তাহা ঠিক বিপরীত, তাহা নিরুদ্দেশের আকর্ষণ—অর্থাৎ অসীমের আকর্ষণ। জাগ্রত নির্ঝর যদি 'হেথা'র সন্ধানে বাহির হইয়া থাকে তবে বলাকাপংক্তি বাহির হইয়াছে লক্ষ্যহীন 'হোথা'র সন্ধানে। 'হেথা'কে যদি সীমা বলিয়া ধরি, 'হোথা'কে যাহার সীমা নাই কিনা অসীম বলিয়া ধরিতে হয়।

এবারে এই সূত্রটি অবলম্বনে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাইবে—তজ্জন্য গীতাঞ্জলিপাঠের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত পিছাইয়া যাইতে হইবে।

এ রকম বিরাট অভিজ্ঞতা কাহারো কাহারো জীবনে কখনো কখনো কেন যে ঘটে তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। ওটা দৈবের ব্যাপার। কিন্তু স্পষ্ট দেখিতেছি যে ঘটে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুই-দুই বার ঘটিল।

এবারে গীতাঞ্জলি পর্বে আসা যাইতে পারে। গীতাঞ্জলি পর্বের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে অসীমের ধনুকে কবি সীমার জ্যা আরোপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি তাঁহার ঘটিয়াছে— 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'। তিনি দেখিয়াছেন যে অসীম পরম প্রেমে সীমার দিকে নামিয়া আসিতেছেন—'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে'। আর সংসারের দিকে চোখ পড়িতে কবি দেখিতে পাইয়াছেন—'হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে'। কবির দিব্যদৃষ্টিতে সীমা ও অসীমের বাঁধে পরিধৃত ভারসাম্যে সুন্দর এই বিশ্ব। ইহাই গীতাঞ্জলি পর্বের সাধনার বৈশিষ্ট্য।

এবারে এই ভারসাম্যে বিধৃত বিশ্বসরোবরের উপরে বলাকার অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড অভিঘাত আসিয়া পড়িয়া বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া সীমা-অসীমের জোড় আলগা করিয়া দিল—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে"। 'হেথা' গৌণ হইয়া গিয়া প্রবল হইয়া দেখা দিল নিরুদ্দিষ্ট দুর্জ্ঞেয় 'হোথা', সীমার দুর্গের উপরে অসীম তাহার চঞ্চল জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল। তাহা যেন নিরন্তর আকাশের কিনারা সন্ধান করিতেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে মানবমুখী অভিজ্ঞতার যে প্রবাহ দেখিয়াছিলাম—এখানে তাহার বিপরীত ক্রিয়া লক্ষ্য করিলাম, গতিমাত্রস্বরূপ বিশ্বপ্রবাহ অনন্তের অভিমুখী। গীতাঞ্জলির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে সীমাকেও দেখিতে পাইব, অসীমকেও দেখিতে পাইব, কিন্তু সীমা-অসীমের সমন্বয় আর দেখিতে পাইব না।

বৃহৎ বিশ্ববেদনার সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা এমন এক আকাশে উধাও হইয়া গিয়াছে যাহার সীমা-সরহদ্দ সুনির্দিষ্ট নয়, এমন এক মহৎ বেদনা তিনি অনুভব করিতেছেন যাহার বিশল্যকরণী আজিও সৃষ্টি হয় নাই, এমন বিপুল সমস্যার আভাস তিনি পাইয়াছেন যাহার সমাধান হয়তো আদৌ নাই। ভালোই হইয়াছে। সমাধান-হীন মহাসঙ্কটের পথে তিনি আধুনিক মনের কাছে আসিয়া পোঁছিয়াছেন। অভিজ্ঞতাচক্র পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য এইটুকুর আবশ্যক ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

"এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার ?"

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে বলাকার যে স্থান, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে ফাল্গুনী নাটকের সেই স্থান ও সেই গুরুত্ব। দুইখানি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবন মোড় ঘুরিয়াছে। অনেকে ইহাকে অপ্রত্যাশিত মনে করেন—কিন্তু মূলের গতি ও প্রকৃতি স্মরণ রাখিলে তেমন অপ্রত্যাশিত মনে হইবে না। বলাকাতে ও ফাল্গুনীতে রবীন্দ্র-জীবন পুনরায় স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা লাভ করিয়াছে। এই সময়ের পূর্ববর্তী পর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া কবির জীবনে একটা অস্বাভাবিকতার ভাব চলিতেছিল। ডাকঘর নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি অস্বাভাবিকতার স্বরূপটা কি। এখানে তাহার পুনর্বিবরণ দান অনাবশ্যক—ইঙ্গিত মাত্র দিলেই চলিবে।

ডাকঘর নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে কবির একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই চিঠিখানার বিষয়ে পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে।[১] এই চিঠিখানা কবির আত্মিক ব্যাধির পূর্ণ বিবরণ বহন করিতেছে। এই সময়ে কবি এক প্রকার আত্মিক ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এখন মৃত্যুই একমাত্র কাম্য—এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই অস্বাভাবিকতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একটা চেষ্টাও তাঁহার মনে ছিল। পরবর্তী চিঠিখানিতে আসন্ন মুক্তির স্বাদ রহিয়াছে।[২]

১ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃ ২৭-৩২, ১৯১৫ সাল

২ চিঠিপত্র, ২য়, পৃ ৩৩, ১৯১৫ সাল, জুলাই

কবির আত্মিক ব্যাধির অভিজ্ঞতা হইতে ডাকঘর নাটকের জন্ম; ডাকঘরের বালক-নায়ক কবিরই ব্যাধিগ্রস্ত স্বরূপ, ডাকঘরের মুক্ত-পুরুষ ঠাকুরদা কবিরই কল্পিত মুক্ত জীবনের প্রতীক।

বলাকা কাব্যে এবং ফাল্গুনী নাটকে দেখা যাইবে যে, ব্যাধিমুক্ত কবি পুনরায় জীবনের স্বাভাবিক উদারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এই আত্মিক ব্যাধিটা কি ? প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে, বিশেষ যাঁহারা কল্পনাপ্রবণ আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদের জীবনে প্রৌঢ় বয়সে এমন একটা অস্বাভাবিকতার সময় আসিয়া থাকে। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, 'এতকাল নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'—সমস্তই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। বস্তুত ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ঐরূপই তাঁহাদের ধারণা হইয়া থাকে। ইহাকে প্রৌঢ় বয়সের গোধূলি সময়ের অনিশ্চয়তা বলা যায়। মনীষী ব্যক্তিরা সাধনবেগে এই সময়টাকে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন স্বস্তি, নূতন শান্তি এবং নবতর ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথও হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে সেই নূতন ক্ষেত্র বলাকা ও ফাল্গুনী। দুটি রচনাই সমসাময়িক।

এই ব্যাধির পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহগত যৌবন তো অপনীত হইল—কিন্তু তার পরিবর্তে নূতন কোনো স্বাদ, মহত্তর কোনো ইঙ্গিত তো জীবনে উপনীত হইল না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের তাঁহার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখা আবশ্যক। স্ত্রী-বিয়োগ, পুত্র ও কন্যা -বিয়োগ, নিজের শারীরিক পীড়াদায়ক ব্যাধি—তাহার সঙ্গে রহিয়াছে আসন্ন বার্ধক্যের প্রসারিত-প্রায় ছায়া। চল্লিশের কোঠা হইতে যেদিন যৌবনকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেটা ছিল কল্পনার ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে সেই মুহূর্ত যখন আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন আর তেমন প্রসন্ন মনে বলিতে পারিলেন না—'যা রে সোনার জন্ম নিয়ে, সোনার মৃত্যুপারে।'

বরঞ্চ যৌবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার একটা ইচ্ছা যেন তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছা তো সফল হইবার নয়। দেহের যৌবনের চলিয়া যাওয়াই তো ধর্ম, তাহাকে রাখিতে গেলেও থাকিবে না। তখন এই অবস্থায় দেহের যৌবনের বিকল্প অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন। যতদিন এই বিকল্পের সন্ধান তিনি পান নাই, ততদিন তাঁহার মন সুস্থ হয় নাই, ততদিন তাঁহার জীবনে অশান্তি ও অস্বাভাবিকতা ছিল। ইহাই তাঁহার ব্যাধি। ডাকঘরে এই ব্যাধির পরিচয়। বলাকা ও ফাল্গুনীতে তাঁহার ব্যাধিমুক্তি, কারণ তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পের সন্ধান পাইয়াছেন, তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পকে আবিষ্কার করিয়া অলকনন্দার সুদৃঢ় পাষাণভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বলাকা ও ফাল্গুনী বিকল্প যৌবন বা প্রৌঢ়ের যৌবনের কাব্য।

> প্রৌঢ়দের যৌবনটিই নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।[৩]

এ দুখানি বই নিরাসক্ত যৌবনের আনন্দলোকের কাব্য।

দৈহিক যৌবনের বিদায় ও নিরাসক্ত যৌবনের আবির্ভাব ফাল্গুনী নাটকের সূচনায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার বিশদ আলোচনার পূর্বে বলাকা কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণ করা যাইতে পারে।

> পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
> আজি কী কারণে
> টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
> বহুদিনকার
> ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
> সহসা কী মনে ক'রে
> পত্র তার পাঠায়েছে মোরে।

৩ সূচনা, ফাল্গুনী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড

লিখেছে সে—

আজি আমি অনন্তের দেশে।

লিখেছে সে—

এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণপথ শেষে

মরণের সিংহদ্বার

হয়ে এসো পার।

শুধু আমি যৌবন তোমার

চিরদিনকার,

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার

জীবনের এপার ওপার।[৪]

কবি বলিতে চান, বয়োধর্মেই দৈহিক যৌবন গত হয় বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না, সে যৌবন নবতর মূর্তিতে, দিব্যরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে; তার পর মানুষ যখন 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করে, তখন যৌবনের বরমাল্য সে পুনরায় লাভ করে।

এই আশ্বাসে সান্ত্বনা থাকিলেও সে সান্ত্বনা সুদূরপরাহত; কেন না, 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করিতে না পারা অবধি পুরাতন যৌবনকে নূতনভাবে লাভ করা তো চলিবে না।

আর একটি কবিতায় দেখিতেছি কবি আরো অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল

লয়ে দলবল

আমার প্রাঙ্গণতলে—

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে…[৫]

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নিরাসক্ত যৌবনকে লাভ করিবার জন্য মরণের সিংহদ্বার পার হইবার আর প্রয়োজন নাই। নিরাসক্ত

৪ বলাকা, ১৩ সংখ্যক কবিতা

৫ বলাকা, ২৫ সংখ্যক কবিতা।

যৌবন অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া কবির কাছে আসিয়াছে। নিরাসক্ত যৌবনের বিবর্তনের ইতিহাসে কবি এখানে আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই বিবর্তনের ইতিহাসের পূর্ণ পরিণতি ফাল্গুনী নাটক। এই দুই যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বতন্ত্র। দৈহিক যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী উর্বশী, আর নিরাসক্ত যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যাও বলাকা কাব্যে বর্তমান।[৬]

কবির ব্যক্তিগত বেদনা কিভাবে ফাল্গুনী নাটকের সূচনার কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবারে তাহা বিচার করা যাইতে পারে। ইক্ষ্বাকুবংশের এক রাজা একদিন সন্ধ্যায় মাথায় একটি পাকা চুল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন যে, মৃত্যুর পত্র বহন করিয়া ঐ পাকা চুলটি আসিয়াছে। বার্ধক্যের ঐ পরওয়ানা দেখিয়া জীবন সম্বন্ধে তিনি বিতৃষ্ণা অনুভব করিলেন। জরুরী রাজকার্যে আর তাঁহার মন বসিল না। তিনি শ্রুতিভূষণের সাহচর্যে বৈরাগ্যসাধন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রাজ-কবি আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, বৈরাগ্যসাধনে প্রকৃত সহায় তিনিই হইতে পারেন। কবি বলিলেন যে, কবিরাই প্রকৃত বৈরাগী ; কারণ সংসারটাকে তাঁহারা পথ বলিয়া মনে করেন, সংসারকে নিত্য মনে করিয়াও, তাহার দাবীদাওয়া পালন করিয়াও তাহাকে বর্জন করিতে শেখাই প্রকৃত বৈরাগ্য। কবি আরো বলিলেন, যে পাকা চুলটি দেখিয়া রাজা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই পাকা চুলের ভূমিকার উপরেই নূতন যৌবনের মল্লিকার মালা স্থাপিত হইবে।

কবি বলিলেন—

> মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী

৬ বলাকা, ২৩শ সংখ্যক কবিতা

আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

কবির উক্তিতে রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্যসাধনের সংকল্প বুঝি-বা বিচলিত হয়, তিনি শ্রুতিভূষণকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া কবি বলিলেন—

তাঁকে কেন মহারাজ ?

—বৈরাগ্যসাধন করবো।

—সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

—তুমি ?

—হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো আছি পৃথিবীতে মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

—বুঝতে পারলুম না।

—এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না ? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেই জন্যই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

—তোমাদের মন্ত্রটা কি ?

—আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি খালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে, বেরিয়ে পড প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

—সংসারের পথটাই বুঝি বৈরাগ্যের পথ হল ?

—তা নয় তো কি মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা কেবলি চলা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো পথিক, সেই তো কবি বাউলের চেলা।

কবি বুঝাইলেন যে নিরাসক্ত যৌবন কর্মকে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে শেখায়, আর নিরাসক্তভাবে কর্মকে গ্রহণ করাই তো প্রকৃত বৈরাগ্য।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল। যে-দুর্ভিক্ষকাতর প্রজার দল অন্ন প্রার্থনায় রাজসমীপে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি রাজা কর্তব্য পালনে সচেতন হইলেন। পরে রাজার আদেশে কবি রাজসভাতে ফাল্গুনীর গীতিনাটিকা অভিনয়ের আয়োজন করিলেন।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে তৃষ্ণা ঠিক পূর্ববর্তী তৃষ্ণা আর হইল না। পূর্ববর্তী যৌবনের মধ্যে সম্ভোগের ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল, এবারে যে মহত্তর যৌবনের পালা আরম্ভ হইল, তাহার মধ্যে ত্যাগের ইচ্ছাটাই প্রবল। ত্যাগ মানে ছাড়া নয়, 'ছাড়তে ছাড়তে পাওয়া'। ত্যাগের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিলে জীবনের কর্তব্যপালন সহজ হইয়া আসে।

> নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখছেন তো? মাটির পাকা রাস্তা হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে সে কেবলি ভারি করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাইতো সে আপনার ভার লাঘব করছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখদুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক।

কবির মতে দৈহিক যৌবন পথ, আর প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত যৌবন নদী। একটির ধর্ম সুখ বা সম্ভোগ, আর একটির ধর্ম আনন্দ বা ত্যাগ। এই ধর্মকে যে গ্রহণ করিতে পারে সেই তো বৈরাগী। জীবনধর্ম-পালনই যথার্থ বৈরাগ্য-সাধন।

নিরাসক্ত বা মহত্তর যৌবনের মধ্যে একটি বৃহৎ কর্মের আহ্বান আছে। এই কর্মসাধনাতেই মানুষের মুক্তি। বৃহৎ কর্মসাধনার জন্য প্রয়োজন বীর্যের—বৈরাগীই প্রকৃত বীর। কবিশেখরের ভাষায়—

> যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়,

তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে, সৃষ্টি করে তারাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ফাল্গুনী নাটকের বাউল বলিয়াছে—

যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।… যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তাহলে বসন্তের দশা কি হত ?

এবারে রবীন্দ্রনাথ কি বলিতেছেন দেখা যাক—

ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনবো সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়, তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত।[৭]

সমসাময়িক বলাকা কাব্যের উক্ত ভাবদ্যোতক কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৮]

৭ আত্মপরিচয়, ৩, পৃ ৭১

৮ বলাকা, কবিতা-সংখ্যা ৪৪, ৪৫, সবুজের অভিযান, সর্বনেশে, আহ্বান, পাড়ি

মহত্তর যৌবনের কর্মসাধনায় আপাতদৃষ্টিতে উন্মত্ততা থাকিলেও তাহার পরিণামে একটি শান্তি ও স্নিগ্ধ সাফল্য বিরাজিত, কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কাজেই মহত্তর যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী শেষ পর্যন্ত কর্মসাধনার গতিকে

…ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়.
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে…
… … …
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুরে
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ-তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।[১]

এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কবি নিজের জীবনবেদনাকে রাজার জীবনে প্রক্ষেপ করিয়া একটি সমাধানে পেঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে সমাধানটি হইতেছে যে, দৈহিক যৌবন গত হইলেই মানুষের আশা ভরসা, উৎসাহ উদ্যম অন্তর্হিত হইবার কারণ নাই। বরঞ্চ নূতন যৌবনলক্ষ্মী প্রদত্ত মহত্তর যৌবনের কৃপায় জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তখন মানুষের জন্মে। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি বলিতে রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্তভাবে কর্মসাধনা বুঁঝিয়া থাকেন। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা কবির উপদেশে বিষাদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন ; অবসাদগ্রস্ত অর্জুনও নিরাসক্তভাবে কর্মসাধনার উপদেশে জড়তা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন ; বর্তমান কবি মুক্তি পাইয়াছেন কি ? তাঁহার পরবর্তী কাব্যসাধনার ও কর্মসাধনার যে চিহ্ন বর্তমান তাহাতে মনে হয় যে, এই মুক্তির

১ বলাকা, কবিতা-সংখ্যা ২৩

দিকেই তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অন্তত যে জড়তা ও বিষাদ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদের কবল হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

॥ ৩ ॥

কবির উপদেশে রাজার জীবনে বিতৃষ্ণা ঘুচিলে ফাল্গুনের দিনে কোনো কিছু একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে রাজা কবিকে অনুরোধ জানাইলেন। কবি রাজসভায় ফাল্গুনী গীতিনাট্যের আয়োজন করিলেন। এই নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা রাজার জীবনসমস্যার অনুরূপ। কবি রাজাকে বুঝাইলেন যে, রাজার নিজের বা যে-কোন মানুষের জীবনে যে লীলা চলিতেছে বিশ্বেও সেই লীলাই অভিনীত হইতেছে। নাট্যের বিষয় সেই বিশ্বলীলা। তাহা হইলে দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে যে-সমস্যা রাজার জীবনেও সেই সমস্যা—আবার সেই সমস্যাই রূপান্তরে বিশ্বজীবনে। এইভাবে রাজার জীবনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বা যে-কোন মানুষের জীবন বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সহিত সংপৃক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার দেখা যাক, বিশ্বজীবনে কোন্ সমস্যার সমাধান হইতেছে, বা কোন্ লীলার অভিনয় হইয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

> ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ হয়। জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়, আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, শ্যামলতা অম্লান, অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি

অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত, তাহলে অনাদিকালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়তো, এর উপরে যেখানেই পা দিতুম ধ্বসে যেতো। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও সে লীলা চলেছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না। ফাল্গুনীর যুবকদল প্রাণের উদ্দামবেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে—আচ্ছা দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[১০]

রাজা মাথায় পাকা চুল দেখিয়া খেদ করিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ আসন্ন বার্ধক্যের ছায়ায় বিষণ্ণ, ফাল্গুনীর কবিশেখর দুই জনের উদ্দেশেই বলিতেছেন—

এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

১০ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৭, রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড

রাজা যেখানে জরা দেখিতেছেন, কবিশেখরের দূরতরপ্রসারী দৃষ্টি সেখানে নূতন রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইতেছে, রাজার দৃষ্টি যেখানে বিনাশ ও Fact-কে দেখিতেছে কবিশেখরের দৃষ্টি সেখানে নূতনতর জীবনের সূত্রপাত ও Truth-কে দেখিতেছে।

রাজা শুধাইলেন—গানের বিষয়টা কি ?

কবি বলিলেন—শীতের বস্ত্রহরণ।

—এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায়নি।

—বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে দিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি, পুরাতনটাই নূতন।

—এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?

—বাকিটা প্রাণের কথা।

—সে কি রকম ?

—যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরবে তখন—

— তখন কি দেখলে ?

—কি দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি ?

—না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতি-কাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

এবারে নাটকটির সংগঠনরীতি স্মরণ করা আবশ্যক। নাটকটির প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা আছে। গীতিভূমিকায় আছে প্রকৃতির লীলা, নাটকে আছে মানবজীবনের লীলা—আর যে রাজসভায় এই অভিনয় চলিতেছে সেখানে আছে রাজার ব্যক্তিগত জীবনের লীলা। তিন লীলাকে সুকৌশলে একটি

শিল্পের ফ্রেমে আঁটিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তিনকে এক দেখাইয়াছেন; তিনি যেন বলিতে চান যে, তিন লীলার ধর্ম শুধু এক নয় বস্তুত তাহারা এক।

কবি বলিতে চান যে, চরম বিচারে প্রকৃতির মধ্যে জরা মৃত্যু নাই; শীত আসিয়া যখন সব শেষ হইয়া গেল মনে করিতেছি, তখনই দেখিতেছি বসন্তের আবির্ভাব—এইভাবে বিশ্বে বসন্তচক্রের চিরন্তন আবর্তন চলিতেছে।[১১] মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য দুই ভাগে বিভাজ্য। সমষ্টিগতভাবে মানবজগতেও জরা মৃত্যুর চরম স্থান নাই, কারণ জরা মৃত্যু সত্ত্বেও মানবসংসার নবীন। কিন্তু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে তো এমন বলা যায় না। সেখানে দেখি চুলে পাক ধরে, বার্ধক্যের ছায়া যৌবনের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দেয়—ইহার সমাধান কোথায়? কবি বলিতে চান যে, অনায়াসলব্ধ দৈহিক যৌবনের পরিবর্তে মানুষ ইচ্ছা করিলে সাধনলব্ধ যৌবনের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে। সে যৌবন অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্য নামের অভাবে কবি ইহাকে নিরাসক্ত যৌবন বলিয়াছেন। ইহার অপর ব্যাখ্যাগত নাম আসক্তি হইতে মুক্তি বা আত্মার চিরানন্দ অবস্থা। ইহাকে জীবন্মুক্তি নাম দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। ইহা আত্মার যৌবন।

মানবজীবনত্রিভুজের এক কোণে দৈহিক যৌবন, আর এক কোণে বার্ধক্য—আর এই দুয়ের ঠেলাঠেলির ফলে তৃতীয় কোণে বিরাজ করিতেছে মহত্তর যৌবন। ইহা সাধনলভ্য এবং দুর্লভ বলিয়াই সকলে এ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। এই অবস্থাকেই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন।

১১ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনী নাটকের ইংরেজী অনুবাদের The Cycle of Spring নামটি স্মরণীয়।

॥ ৪ ॥

এবারে নাটকটির পাত্রপাত্রীর পরিচয় লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে নাটকের মর্মের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। রাজা শুধাইলেন—

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে ?

কবি বলিলেন—এক হচ্ছে সর্দার।

—সে কে ?

—যে আমাদের কেবল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

—সে কে ?

—যাকে আমরা ভালোবাসি, আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

—আর কে আছে ?

—দাদা, প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই সে সার মনে করেছে।

—আর কেউ আছে ?

—আর আছে এক অন্ধ বাউল।

—অন্ধ ?

—হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

এবারে কবিকৃত ব্যাখ্যা শোনা যাক।—

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এই জন্যই সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে ; বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে। ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।…এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে

> পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না, ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।[১২]

ফাল্গুনীর পাত্রগণের তালিকায় কবি তাহাদের যে বিশেষ পরিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি সর্দারকে জীবন সর্দার বলা হইয়াছে। এই জীবন সর্দার নামটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হয়।

ফাল্গুনী নাটক পুরাপুরি 'এলিগরি' বা রূপক নাট্য না হইলেও কোনো কোনো স্থলে 'এলিগরি' বা রূপকের ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে। জীবন সর্দার, চন্দ্রহাস, দাদা ও অন্ধ বাউল চারজনকেই রূপক মনে করা যাইতে পারে।

জীবন সর্দার বলিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন বা 'লাইফ প্রিন্সিপল' বুঝিয়াছেন। 'এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়।' ইহা কি জীবনেরই স্বভাব নয়? অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাই জীবনের ধর্ম, গতিই জীবন, স্থিতিই জীবনহীনতা।[১৩] জীবন সর্দার বা জীবনই নবযৌবনের দলকে পথে বাহির করিয়া দুস্তরের অভিমুখে চালিত করিয়াছে, চিরকালের বুড়াকে ধরিয়া আনিতে সেই তো নবযৌবনের দলকে উৎসাহিত করিয়াছে, তার পরে মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হইতে চিরকালের বুড়ার পরিবর্তে যে বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল—সে তো এই জীবন সর্দার বা জীবন ছাড়া অপর কেহ নহে।

গুহা হইতে সর্দারকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত চন্দ্রহাস বলিয়া উঠিয়াছে—

১২ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৯৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

১৩ বলাকার চঞ্চলা কবিতা স্মরণীয়

তবে তুমিই চিরকালের ?

—হাঁ।

—আর আমরাই চিরকালের ?

—হাঁ।

—এ তো বড় আশ্চর্য ! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম !

সংসারে বার্ধক্য নাই, আছে চিরন্তন জীবন, পিছন হইতে ধূলা-বালির আড়াল হইতে কখনো কখনো তাহাকে বুড়া বলিয়া মনে হইলেও সম্মুখ হইতে দেখিবামাত্র জীবনের চিরনবীনরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কবি চন্দ্রহাসকে নবযৌবনের দলের প্রিয় সখা বলিয়াছেন। চন্দ্রহাসকে আমরা প্রেম বলিতে পারি। প্রেম আছে বলিয়াই নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও জীবনের প্রতি আসক্তি আছে। শুধু তাহাই নয়, একমাত্র প্রেমই মৃত্যুর অন্ধকারে তলাইয়া গিয়া জীবনের রহস্যভেদ করিতে সক্ষম। নাটকের শেষ অঙ্কে নবযৌবনের দল অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়ল, তখন চন্দ্রহাস সাহস করিয়া অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিয়া আশার সংবাদ শুনাইয়া দিল—'ধরেছি, তাকে ধরেছি'। এই ইঙ্গিত হইতে মনে হয় যে কবির মতে জীবনের কাজ চালাইয়া লওয়া, আর প্রেমের কাজ সেই চলাকে মধুর করিয়া তাহাকে অর্থময় করিয়া তোলা। প্রেমের স্পর্শ না পাইলে জীবনের দুর্বারগতি নিরর্থক ও বিড়ম্বনা হইয়া ওঠে। চন্দ্রহাস সঙ্গে না থাকিলে নবযৌবনের দল অনেক আগেই খেলায় ভঙ্গ দিত, জীবনের তাগিদও তাহাদের চালিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

দাদা নবযৌবনের দলের প্রবীণ যুবক। বয়স তাহার অল্প—তবু তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়, ভিন্নার্থে 'বার্ধক্যং জরসা বিনা'। বয়স অল্প হইলেও যে জরার কবলিত হওয়া যায়, জরা যে মনের ধর্ম, ইহা

দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি দাদাকে প্রবীণ যুবক করিয়া আঁকিয়াছেন। আমাদের জন্মজরাগ্রস্ত দেশে দাদার অভাব নাই। পাঠশালার বয়স হইতেই তাহারা প্রাজ্ঞের মতো কথা বলিতে শুরু করে। ইহাদের দেহের বয়সে আর মনের বয়সে খাপ খাইতে চায় না—সেই তরুণ বৃদ্ধদের রূপক করিয়া কবি দাদাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আর আছে এক অন্ধ বাউল। এই লোকটি চোখ দিয়া দেখে না বলিয়াই বুড়ার (আসল জীবনের) সন্ধান জানে। এই প্রসঙ্গে 'রাজা' নাটকের বিষয় স্মরণীয়। 'রাজা' চোখে দেখিবার নহেন, রানী চোখে দেখিতে চাহিয়া ভুল করিয়াছিল। রানী চোখে দেখার আশা ছাড়িলে তবে 'রাজা'কে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। অন্ধ বাউল অনেক দিন হইল চোখে দেখার প্রথা ছাড়িয়াছে—তাই সে এখন জীবনের স্বরূপ অবগত। 'রাজা' নাটকের রানী সুদর্শনা অনেক দুঃখ ভোগের পরে নাটকের অন্তে যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, অন্ধ বাউলের আজ সেই অবস্থা, তাহার সাধনার পর্ব শেষ হইয়াছে, সে এখন সিদ্ধকাম। অন্ধ বাউলকে প্রজ্ঞার রূপক বলিতে পারা যায়।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, জীবন সর্দার বা জীবন নবযৌবনের দলকে চালিত করিতেছে, চন্দ্রহাস বা প্রেম সেই চলাকে মধুর করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, প্রজ্ঞা ব্যতীত প্রেমও পথ দেখিতে পায় না। অন্ধ বাউল সেই প্রজ্ঞা, যাহার নিকটে সন্ধান পাইয়া চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিবার আশায় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রূপকটিকে পূর্ণতর করিবার জন্য দাদারও প্রয়োজন ছিল। মানুষের বা নবযৌবনের দলের মানসিক জরার বাহ্যরূপ দাদা। নবযৌবনের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, আর তাহাদের মনে যে জরা আছে, যে-নিরুৎসাহ আছে, যে-সন্দেহ আছে, যে-অপরিণত অভিজ্ঞতা আছে—সে-সমস্ত দাদার মধ্যে মূর্তিমান হইয়া চৌপদী রচনা করিতে

করিতে নবযৌবনের দলের পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

পূর্ণাঙ্গ 'এলিগরি' বা রূপক-নাট্য রবীন্দ্রনাথ কখনো লেখেন নাই, তাহা তাঁহার শিল্পস্বভাবসঙ্গত নয়, বিশেষ একটা বাঁধানো রাস্তায় অধিকক্ষণ তিনি চলিতে পারেন না—কিন্তু তত্ত্বনাট্য বলিয়া পরিচিত নাটকগুলির অনেকস্থলে তিনি রূপকের আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফাল্গুনী অন্যতম প্রধান বলিয়া মনে হয়।

॥ ৫ ॥

ফাল্গুনী নাটকের কাল ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল। বসন্তকালে ঋতুচক্র পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আবার নূতন বৎসরে প্রবেশ করে। শীতের জরাতে পৃথিবীর দীনতা প্রকাশিত হয়—কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়, তার পরেই আবির্ভূত হয় বসন্ত, বসন্তের পৃথিবী আবার নূতনভাবে নবীন হইয়া দেখা দেয়। এই সত্যটিকে কবি মানবজীবনের বার্ধক্যজাত জরা ও তদুত্তর নূতন জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃতির জীবনে ও মানবজীবনে একই লীলার ধারা বহমান—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি বসন্ত ঋতু নাটকের কাল হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এ বসন্ত মানুষের মহত্তর যৌবনের প্রতীক—ইহার মধ্যে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও অশ্রু দুই-ই আছে ; ইহাতে আনন্দের উল্লাস যেমন আছে, তেমনি কর্মের আহ্বানও আছে—তাহা না থাকিলে এ বসন্তের বাণী মানুষের মনকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না।

> —এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কি রকম সুর লাগছে। এ যেন ঝরা পাতার সুর।[১৪]
>
> —এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

১৪ তুলনীয় 'রাজা' নাটকের বসন্তের রূপ—'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।'

—ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

—আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

আর বসন্তের মধ্যে যে কর্মের আহ্বান নিহিত তাহাও জানিতে পাই।—

বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।

—তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ, খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয়নি।

—বসন্তের এই কি খবর?

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহা বসন্তের আদর্শায়িত রূপ, মানুষের যৌবনের আদর্শায়িত রূপ। এ বসন্ত কেবল পার্থিব নয়, এ যৌবন কেবল দৈহিক নয়। এ বসন্ত কবির চোখে দেখা বসন্ত, এ যৌবন পরিণত মনে অনুভব করা যৌবন। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলই তারুণ্যের জয়গান করিয়াছেন। এ উক্তি আংশিক সত্য মাত্র। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি দৈহিক তারুণ্যের উদ্দেশে তেমন নয়, যেমন আদর্শায়িত তারুণ্যের উদ্দেশে। কিংবা বলা উচিত, বলাকা ও ফাল্গুনীতে আসিয়া কবি দৈহিক তারুণ্যের অনুকল্পরূপে প্রৌঢ়ের যৌবনকে নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার কণ্ঠে প্রতিভার স্বয়ংবরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন।

এখানে সংক্ষেপে নাটকের স্থানের আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি বলিয়াছেন যে—'এই নাট্যকাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাঁদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই।' ইহার বিস্তৃতরূপ নাট্যদৃশ্যগুলিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম দৃশ্যের স্থান পথ, দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ঘাট, তৃতীয় দৃশ্যের স্থান মাঠ, চতুর্থ দৃশ্যের স্থান গুহাদ্বার। অর্থাৎ ঘটনাস্রোত পথে ঘাটে মাঠে চলিতে চলিতে চরম দৃশ্যে গুহাদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ নবযৌবনের দল পথের টানে ভাসিতে ভাসিতে

গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যথাস্থানে পথ ও গুহাদ্বারের আলোচনা করা যাইবে।

॥ ৬ ॥

ফাল্গুনী নাটকখানিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিবার স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এবারে সে বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এখানে তিনি প্রকৃতিকে মানুষের অনুকল্পরূপে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী কাব্যে ও নাটকে আর এই ভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই।

প্রকৃতির জীবনে যে লীলা চলিতেছে মানবজীবনে যে ঠিক তাহারই অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ফাল্গুনীতে এক অভিনব শিল্পরীতিকে কবি আশ্রয় করিয়াছেন। নাটকটির প্রত্যেক দৃশ্যের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা সংযোজিত। গীতিভূমিকার নায়কনায়িকা প্রকৃতির পাত্রপাত্রী, নাট্যদৃশ্যে নায়ক মানব পাত্রগণ। গীতিভূমিকায় যাহা ভাবাকারে উক্ত, নাট্যদৃশ্যে তাহাই ঘটনাকারে বিবৃত, গীতিভূমিকা যদি হয় সূত্র, নাট্যদৃশ্য তবে তাহার টীকাভাষ্য।

নবীনের আবির্ভাব, যুবকদলের প্রবেশ ॥
প্রবীণের দ্বিধা, সন্ধান ॥
প্রবীণের পরাভব, সন্দেহ ॥
নবীনের জয়, প্রকাশ ॥

গীতিভূমিকা ও নাট্যদৃশ্যের পূর্বোক্তরূপ পরিচয়বিবৃতি কবি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আর ইহাই স্মরণ করিয়া কবিশেখর রাজাকে বলিয়াছিল—'হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'

শেষজীবনের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নাট্যদৃশ্যের ঘটনাস্থানরূপে একটি আদর্শায়িত পথের কল্পনা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর ঘটনাস্রোতও

একটি পথকে অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত। যৌবনের দল কর্তৃক চিরন্তন বৃদ্ধের অনুসন্ধান নাট্যবিষয়, কাজেই নাট্যবিষয়ের সঙ্গে নাট্যদৃশ্যের সুসঙ্গতি হইয়াছে। নাট্যদৃশ্যে পথের ভাবটা দর্শকদের চোখে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কবি নাট্যব্যবস্থাপকগণকে নির্দেশ দিতেছেন—'রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by-play-টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।'[১৫]

॥ ৭ ॥

ফাল্গুনীতে প্রতীক-ভাবসম্পন্ন বস্তুর অভাব নাই। পূর্বোক্ত পথটাই প্রতীক-ভাবসম্পন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রতীক বলিতে শেষ দৃশ্যের গুহাটিকে বুঝি। এই গুহা কিসের প্রতীক?

কবির ভাষায়—

> প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নতুন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে, জীবনকে, যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[১৬]

এই গুহা যে মৃত্যু, গুহার অন্ধকার যে মৃত্যুর রহস্য, তাহার সপক্ষে কবির আরো উক্তি পাওয়া যায়।—

> জীবনকে সত্য বলে জানতে পেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে, সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে

১৫ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০১, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

১৬ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিক থেকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভয়িয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ-তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়।[১৭]

ইহার পরে গুহাটার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার পরে যখন মনে পড়ে যে, গুহাকে মৃত্যুর প্রতীকরূপে তিনি আগেও ব্যবহার করিয়াছেন—তখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

১৭ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

একটি পথকে অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত। যৌবনের দল কর্তৃক চিরন্তন বৃদ্ধের অনুসন্ধান নাট্যবিষয়, কাজেই নাট্যবিষয়ের সঙ্গে নাট্যদৃশ্যের সুসঙ্গতি হইয়াছে। নাট্যদৃশ্যে পথের ভাবটা দর্শকদের চোখে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কবি নাট্যব্যবস্থাপকগণকে নির্দেশ দিতেছেন—'রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by-play-টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।'[১৫]

॥ ৭ ॥

ফাল্গুনীতে প্রতীক-ভাবসম্পন্ন বস্তুর অভাব নাই। পূর্বোক্ত পথটাই প্রতীক-ভাবসম্পন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রতীক বলিতে শেষ দৃশ্যের গুহাটিকে বুঝি। এই গুহা কিসের প্রতীক?

কবির ভাষায়—

> প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নতুন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে, জীবনকে, যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[১৬]

এই গুহা যে মৃত্যু, গুহার অন্ধকার যে মৃত্যুর রহস্য, তাহার সপক্ষে কবির আরো উক্তি পাওয়া যায়।—

> জীবনকে সত্য বলে জানতে পেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে, সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে

১৫ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০১, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

১৬ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিক থেকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ-তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়।[১৭]

ইহার পরে গুহাটার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার পরে যখন মনে পড়ে যে, গুহাকে মৃত্যুর প্রতীকরূপে তিনি আগেও ব্যবহার করিয়াছেন—তখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

১৭ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

ত্রয়োদশ অধ্যায়

"আমি নারী, আমি মহীয়সী"

॥ ১ ॥

বলাকা কাব্যের শিখর হইতে দুটি নির্ঝরিণী নামিয়া আসিয়াছে, বলাকার ঐশ্বর্যে অভিভূত পাঠকের চোখে সে দুটি বড় পড়িতে চায় না। কিন্তু বলাকার মহিমা বুঝিতে হইলে ও-দুটিকে বাদ দেওয়া যায় না, একটু কান পাতিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে নির্ঝরিণী-দুটির তরল কল্লোলে বলাকার বাণীই ধ্বনিত। উহারা বলাকা কাব্যেরই বাঙ্ময় রূপ। কথিত কাব্য দুখানি ফাল্গুনী ও পলাতকা। এখানে আমরা পলাতকার আলোচনা করিব।

পলাতকা কাব্য কেন অবহেলিত হইল? খুব সম্ভব দায়ী ইহার আয়তনের ক্ষীণতা আর কবিতাগুলির বিশেষ প্রকৃতি, অধিকাংশ কবিতাই গল্পচ্ছলে কথিত। কিন্তু এই অতিপ্রকট কারণ দুটিকে চরম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না। পলাতকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অতি শ্রেষ্ঠ চার-পাঁচটি কবিতা বিদ্যমান। আর, দুটি প্রধান কবিতা বাদ দিলে সবগুলি কবিতাতেই নারী সম্বন্ধে কবির এক নূতন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাকেই আমরা বলাকা কাব্যের অন্যতম বাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।[১]

১ প্রধান দুটি কবিতা বলিতে নাম-কবিতা পলাতকা, আর শেষের দিকের শেষ গান। শেষ গান কবিতাটির অনিবার্য স্থান পলাতকা কাব্যে নয়, কবির শেষজীবনের যে-কোনো কাব্যে স্থান পাইতে পারে। বস্তুত তাহাই পাইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত পূরবী কাব্যের ইহা প্রথম কবিতা, নাম হইয়াছে পূরবী, যদিচ কবিতাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের পলাতকা কাব্যে আপন স্থান রক্ষা করিয়াছে—খুব সম্ভব মৌলিক দাবির খাতিরে।

পলাতকা কাব্যের নাম-কবিতা ও শেষ গান যে কারণে বাদ দিয়াছি, বলিলাম। এ দুটি ছাড়া, শেষ প্রতিষ্ঠা আর হারিয়ে-যাওয়া কবিতা-দুটি কবির প্রথমা কন্যার মৃত্যুর পরে লিখিত। আর, ঠাকুরদাদার ছুটি কবিতার মূলে আছে কবির শিশু-দৌহিত্রীর প্রেরণা। বাকি দশটি কবিতাই গল্পচ্ছলে কথিত, কোনো কোনোটিতে—যেমন

শেষ গান যদি কবির শেষজীবনের যে-কোনো কাব্যে স্থান পাইতে পারে, নাম-কবিতা পলাতকা কবির যে কোনো বয়সের যে-কোনো কাব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কবিতাটির গল্পাংশে আছে একটি শিশুহরিণ আর একটি কুকুরছানা, গল্পটি তাহাদের অসম বন্ধুত্বের আর বিষম বিচ্ছেদের। একদিন যখন 'ফাগুন মাসে জাগলো পাগল দখিন-হাওয়া' তখন 'হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী, হঠাৎ কখন শুনতে পেল'—বন্ধু কুকুরছানার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া 'মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটলো হরিণ নিরুদ্দেশের আশে'। (কুকুরছানা ও হরিণছানার কাহিনীর মূলে সত্য আছে, শান্তিনিকেতন-পল্লীর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের হরিণ নিরুদ্দিষ্ট হইবার পরে কবিতাটি লিখিত।) বন্ধুবিচ্ছেদে ম্রিয়মাণ কুকুরছানা 'আতুর চোখে' জনে জনে প্রশ্ন করিয়া বেড়ায় 'নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে'।

হরিণ ও কুকুরের বন্ধুত্বকে অসম বলিয়াছি, হরিণ কখনো পোষ মানে না আর কুকুর স্বভাবতই পোষমানা, একজন মানুষ-ঘেঁষা, একজন মানুষ-ছাড়া প্রাণী। একজন ঘরের, একজন দূরের। এমন অসমে ক্ষণকালের জন্য মিলিতে পারে কিন্তু স্থায়ী মিলন সম্ভবে না। এ যেন সীমা-অসীম-তত্ত্বের কাহিনীময় রূপ। রবীন্দ্রকাব্যে সীমা ও অসীম নিবিড় প্রেমে বারম্বার পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ কখন আকাশে দূরের নিশ্বাস সমীরিত হয়, অমনি সীমা-অসীমের ক্ষণিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। 'সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনে'র প্রচেষ্টা আছে রবীন্দ্রকাব্যে—পরিণতি আছে বলিয়া মনে হয় না। কবি সাধক, তিনি যে সিদ্ধপুরুষ হইবেনই এমন কথা নাই। এখন, কবিতাটিতে এই ব্যঞ্জনার আরোপ স্বীকার করিলে ইহাকে সাধারণভাবে রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকারূপেও স্বীকার করিতে হয়।

ফাঁকি, নিষ্কৃতি ও মায়ের সম্মানে—গল্পটা বেশ পরিস্ফুট ; বাকিগুলিতে গল্পের সূত্র ক্ষীণ। গল্প প্রকট হোক বা প্রচ্ছন্ন হোক একটি লক্ষণে কবিতাগুলির মধ্যে মিল আছে—সবগুলিতেই নারী নায়িকা বা প্রধান পাত্রী, এমনকি হারিয়ে-যাওয়া, শেষ প্রতিষ্ঠা ও ঠাকুরদাদার ছুটি কবিতাগুলিও এই লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো একখানি কাব্যে নারীকে এমন সর্বৈব প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। পলাতকা কাব্যজগতের প্রমীলারাজ্য।

পলাতকা কাব্যের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহা কতকটা এই জন্য, কিন্তু ইহাই বৈশিষ্ট্যের সবটা নয়। নারীজীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে কাব্যখানিতে, আর সে দৃষ্টির মূল প্রেরণা আছে বলাকা কাব্যে। বলাকার শিখর হইতে ফাল্গুনী ও পলাতকার ধারা নামিয়া আসিয়াছে—একটিতে যৌবনের নূতন আদর্শ, আর-একটিতে নারীজীবনের নূতন আদর্শ।

চিরদিনের দাগা কবিতার নায়িকা শৈলবালা অবাঞ্ছিত কিশোরী নারীর প্রতিনিধি, যে নারী জন্মক্ষণ হইতেই অভিভাবকের মনে বিবাহ-দানের উদ্বেগ জাগাইয়া দিয়া প্রতিমুহূর্তে অবহেলিত হইতে থাকে।

মুক্তি ও ফাঁকি কবিতার বধূদ্বয় বৃহৎ সংসারের জটিল কর্তব্যভারে চাপাপড়া সুকুমার ফুলের গাছ—তাহারাও অবহেলিত। অবশেষে এক সময়ে দারুণ ব্যাধি আসিয়া নিরেট কর্তব্যের দেয়ালে জানলা ফুটাইয়া দেয়—শেষনিশ্বাস ফেলিবার আগে তাহারা একবার মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ পায়, যদিচ তাহার মধ্যেও কখনো কখনো 'পঁচিশ টাকার ফাঁকি' লুকাইয়া থাকে।

মায়ের সম্মান কবিতার কানাই-বলাই-এর জননী অদৃষ্ট-নিগৃহীতা রমণী, তাহার একমাত্র সম্বল চারিত্র-মহিমা। ঐ মহিমার বলেই সুদিনের মুখ দেখিয়াছে, আবার ঐ মহিমার বলেই আপনার দুঃখের আলোয় অপরের দুঃখের নিদারুণতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে।

নিষ্কৃতির মঞ্জুলী হিন্দু ঘরের বালবিধবা, 'ভরা ভোগের মধ্যখানে' ব্রহ্মচর্যের আদর্শ পালন করিতে যে বাধ্য হয়। হয়তো এইভাবেই তাহার জীবন শেষনিশ্বাস পর্যন্ত চলিত, এমন সময়ে বাপের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আর পুলিনের প্রত্যাশিত আহ্বানে নূতন ঘর পাতিবার আশায় সে ফরাক্কাবাদে চলিয়া গেল।

মালা কবিতাটির নায়িকা 'সিংহাসনে একলা ব'সে রানী, মূর্তিমতী বাণী'। এই রানীর প্রসাদ পাইবার আশায়

> কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
> বহুমুখী জনধারার স্রোতে
> দলে দলে যাত্রী আসে
> ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।[২]

রানীর দেওয়া মণিমালার জ্বালায় যখন জীবন পরিতপ্ত হইয়া ওঠে তখন হঠাৎ চোখে পড়ে মণিমালাই রানীর চরম দান নয়, তাঁহার হাতে আরো কিছু আছে, ফুলের মালার প্রসাদ। সে মালা জোটে কবির ভাগ্যে—এ শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে আরো অনেক আছে, একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোনার তরীর বিখ্যাত কবিতা পুরস্কার; প্রভেদ এই—পুরস্কার কবিতায় যিনি রাজা, মালাতে তিনি রানী; আরো একটু প্রভেদ আছে—পুরস্কারের রাজা লৌকিক ব্যক্তি, মালার রানী সেভাবে লৌকিক নন।

ভোলা কবিতার নায়িকা বালিকা কন্যা বিজু, সে 'যখন চলে গেল মরণপারের দেশে'। বিজুর মৃত্যুর পরে যখন ঘরের আবহাওয়া শূন্যতায় ও অশ্রুর ভারে থম্ থম্ করিতেছে তখন দমকা হাওয়ার মতো পাড়ার ভোলা নামে বালকটির আবির্ভাব। বিজুর যোগ্য প্রতিনিধি রূপে সে বিজুর স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

ছিন্ন পত্র কবিতার নায়িকা কিশোর বয়সের বিস্মৃতা সখী মনোরমা। সেদিনের কিশোর আজ প্রখ্যাত পাবলিকম্যান, তায়

---

২ মালা, পলাতকা

প্রৌঢ়। এমন কত জনেই কত চিঠিই তাহাকে লেখে। হঠাৎ সেই ছিন্ন চিঠির একটি টুকরা বাতাসে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির করিয়া দেয়—ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা—'মন্নুরে কি গেছ এখন ভুলে'। মন্নুর অব্যক্ত আবেদন শত খণ্ড হইয়া ধারণার অতীতে বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে—যে ফুল ছিন্ন তাহার রিক্ত বৃন্তটি প্রশ্ন হানিতেছে 'মন্নুরে কি গেছ এখন ভুলে'। মনোরমাও অবহেলিতা, না, তার চেয়েও অধিক—বিস্মৃতা। পারিবারিক প্রতিকূলতা ইহার কারণ।

কালো মেয়ের নায়িকা নন্দরানী, গায়ের রঙ যাহার বিবাহের প্রতিবন্ধক, এমন মেয়ে সংসারে অবহেলিত না হইয়া যায় না। কবিতাটিতে গল্পাংশ নাই। পাশের মেসের দরিদ্র ছাত্রটি ঐ মেয়ের মধ্যে আপনার সহায়সম্বলহীন কালো ভবিষ্যতের রূপ দেখিতে পায়।

আসল কবিতার নায়ক কোনো নারী নয়, যদিচ সুর্মি নামে একটা বেগানা মেয়ে আছে, আর তার স্থানও নিতান্ত নগণ্য নয়। কবিতাটির নায়ক মহেশ নামে একটা পাগল। সেই পাগলটা হইতেছে ষাট বৎসর বয়স্ক কর্মব্যস্ত পলিটিশানের মনের পোড়ো জমি —যেমন এক খণ্ড পোড়ো জমি ছিল আট বৎসরের বালকের জানলার সম্মুখে। সেই অনাদরের জমিতে ছিল বালকের ভূস্বর্গ, আর এই অনাদরের মানুষটিতে বৃদ্ধের অবকাশের স্বর্গ, আর সেই স্বর্গের মন্দাকিনী কুড়াইয়া-পাওয়া কলস্বরা সুর্মি।

॥ ২ ॥

পলাতকা কাব্যের বিস্তৃততর আলোচনার মধ্যে প্রবেশের আগে পরবর্তী শিশু ভোলানাথ কাব্যের সঙ্গে এর সম্বন্ধটা বর্ণনা করিতে চাই। যদিচ পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ কাব্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অল্প নয়,[৩] তবু দুখানি কাব্যই অল্পবিস্তর কবির ব্যথাক্লিষ্ট

৩ পলাতকা প্রকাশকাল ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ প্রকাশকাল ১৯২২- যদিচ অধিকাংশ কবিতাই ১৯২১ সালে লিখিত।

চিত্তের অভিজ্ঞতা বহন করিতেছে। শিশু ভোলানাথে ব্যাপারটা বেশ প্রকট, পলাতকায় আংশিক ও প্রচ্ছন্ন।

> আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি ক'রে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড় আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।[৪]

উদ্ধৃত অংশে যে বেদনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে শিশু ভোলানাথের জন্ম সেই বেদনায় বা সেই বেদনা হইতে মুক্তি পাইবার আশায়। পলাতকা কাব্যেরও কোনো কোনো কবিতাতেও এই বেদনার অভিজ্ঞতা, ভোলা ও আসল প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, যদিচ ছিন্ন পত্র ও ঠাকুরদাদার ছুটিও উল্লেখযোগ্য।[৫]

ভোলা কবিতার বালক ভোলা, আসল কবিতার পাগল মহেশ ও শিশু ভোলানাথের নাম-কবিতার শিশু ভোলানাথে প্রভেদ অল্পই, সে প্রভেদটুকুও আবার বিবর্তনের। ভোলা কবিতায় বালকটির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

> আমার প্রাণের চিরবালক নতুন ক'রে বাঁধল খেলাঘর
> বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।

৪ গ্রন্থপরিচয়, শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড

৫ শেষ গান যেমন পরবর্তী কাব্যে স্থানান্তরিত হইয়া যথাস্থান লাভ করিয়াছে, ঠাকুরদাদার ছুটিও তেমনি যথাস্থান লাভ করিতে পারিত শিশু ভোলানাথ কাব্যে স্থানান্তরিত হইলে।

আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।[৬]

বালকটি এখানে স্পষ্টতই idealised হইয়াছে।

আসল কবিতার মহেশ পাগলের কাঁধে সুর্মির বর্ণনা দিতে গিয়া কবির মনে পড়িয়াছে—'ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরো ফুলের কুঁড়ি'। এখানেও মহেশ উপমায় idealised হইয়াছে, আর একটু পরেই প্রত্যক্ষত idealised—

চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।[৭]

শিশু ভোলানাথ কাব্যের শিশু idealised শিশু, তাই সে শিশু ভোলানাথ, এখানেই শিশু কাব্যের সহিত শিশু ভোলানাথ কাব্যের প্রভেদ। শিশুর বালক-বালিকা লৌকিক, real ; শিশু ভোলানাথের ideal, অন্তত অধিকাংশ কবিতাতেই। এখন, শিশু ভোলানাথের পূর্ববর্তী কাব্যে—পলাতকায়—এই idealisationএর সূচনা, যে শিশু কখনো পাগল, যে পাগল কখনো শিশু ; পরবর্তী কাব্যে আসিয়া এই প্রক্রিয়া পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে—শিশু ও পাগল অর্ধনারীশ্বরের মতো একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

॥ ৩ ॥

এবারে বিশিষ্ট কবিতাগুলির আলোচনা করিব। প্রথম পর্যায়ে কালো মেয়ে, ছিন্ন পত্র ও চিরদিনের দাগা কবিতা-তিনটি লওয়া যাইতে পারে। তিনটিতেই নারী অবহেলিত, কিন্তু তিন ক্ষেত্রেই সামাজিক পারিবারিক ও সাময়িক (সময় সংক্রান্ত) প্রতিকূলতা এমন প্রবল যে নন্দরানী মনোরমা ও শৈল নিতান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, দৈব এখানে প্রবলতর।

৬ ভোলা, পলাতকা

৭ আসল, পলাতকা

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।[৮]

নন্দরানী শুকনো ডাঙায় ঠেকা নৌকা, জোয়ারের জল তাহাকে আর ভাসমান করিল না, ঐখানে ডাঙায় পড়িয়া থাকিয়াই একদা তাহার অসহায় জীবনের অবসান ঘটিবে।

মনোরমা প্রৌঢ় পলিটিশানের বাল্যকালের সখী, কিছুকালের জন্য এক দিগন্তে তাহারা কাছাকাছি হইয়াছিল তার পরে দুরন্ত পারিবারিক স্বার্থ ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে। সেই ঘটনার পরে বয়সের বেশ কয়েকটা দশক গত, সেদিনের বালক আজ প্রৌঢ় কর্মবীর, এমন লোকের পক্ষে বাজে চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলা একটা প্রাত্যহিক কর্ম। ভিক্ষাপ্রার্থী কোনো বিধবার পত্র মনে করিয়া মনোরমার চিঠিখানিও ছিন্ন হইল। এমন সময়ে ক্ষণিক অবসরের সুযোগ লইয়া দক্ষিণবাতাসের এক দমকায় কাগজের যে টুকরোখানা কর্মবীরের কোলের উপরে আসিয়া পড়িল—'মনুরে কি গেছ এখন ভুলে' অক্ষর বহন করিতেছে।

সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে ?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি ? ক্ষতি সে কি ? সে কি অত্যাচার ?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে ?
ছিন্ন চিঠির বাকি,
বিশ্ব-মাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি ?[৯]

৮ কালো মেয়ে, পলাতকা

৯ ছিন্ন পত্র, পলাতকা

কিন্তু আর অনুশোচনা বৃথা। ঝড়ের কপোতের মতো এক জানলায় প্রবেশ, অন্য জানলায় প্রস্থান—এমন একটি ঘটনা ঐ ছিন্ন পত্রখানি। দুঃখের এ আর-এক চিত্র। ভবিতব্যের পর্দাখানা একটুখানি তুলিয়া শঙ্কাপাণ্ডু মুখের ছবিখানি এক লহমার জন্য কবি আমাদের দেখাইয়াছেন।

তিনটি মেয়ের পিঠে জন্মগ্রহণের দোষে অপরাধী শৈলবালা বৃদ্ধের বুকে চিরদিনের দাগা রাখিয়া গিয়াছে। অদৃষ্ট বড়ই রসিকপুরুষ। যাহার বর জুটিতেই চায় না, বিবাহ হওয়াই যাহার দায়, তাহার বর জুটাইয়া দিয়া, বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিয়া অদৃষ্ট আর-এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খেলা দেখাইয়া দিল—বরবধূ স্বগৃহে পৌঁছিবার আগেই—

> খবর এলো, ইরাবতীর সাগর মোহানাতে
> ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।[১০]

এখানে অদৃষ্টই প্রবল ও প্রকট। নন্দরানী ও মনোরমার ক্ষেত্রেও হয়তো সে বর্তমান, কিন্তু নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবেই। তিনটি ক্ষেত্রেই দুঃখের তিন মূর্তি, সর্বত্রই নারী নির্যাতিত ও নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু সমস্ত কবিতার নায়িকা এমন নিষ্ক্রিয় মনে করিলে ভুল হইবে, সকলেই অদৃষ্টের শাসন বা সমাজের অনুশাসন নতভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে নাই, কেহ বা চরিত্রশক্তিতে কেহ বা প্রেমের শক্তিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। মায়ের সম্মানের মাতা দুর্ধর্ষ চরিত্রবলে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে মস্তক উন্নত করিয়াছে, তাহার স্থান রাসমণির ছেলে গল্পের রাসমণির সহিত। নিষ্কৃতি কবিতার নায়িকা মঞ্জুলীও শেষ পর্যন্ত সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হইয়াছে, এখানে তাহার সহায় পুলিনের প্রতি অন্তঃসলিল অনুরাগ। অনেককাল হইতেই সে ভিতরে ভিতরে অনুরাগের টান

১০ চিরদিনের দাগা, পলাতকা

অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে পিতার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ দমকা বাতাসের মতো তাহার সংকুচিত ইচ্ছাশক্তির উপরে আসিয়া পড়িয়া ঘাটের রশি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফাঁকি কবিতার বিনু জীবনের শেষ দুটি মাস স্বামীকে একান্তভাবে কাছে পাইয়াছিল—ঐ মাস দুটিকেই দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের সার বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে, মনে হইয়াছে যে এতদিনের শূন্যতা বিধাতা অপ্রত্যাশিত ভাবে শেষ দানে পূর্ণ করিয়া দিলেন। বিনুর স্বামী 'পঁচিশ টাকার ফাঁকি'র অভিশাপে ভুগিয়াছে কিন্তু বিনু 'এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে' সান্ত্বনা বহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মুক্তি কবিতার নায়িকা রুগ্‌ণা পত্নী বিনুর মতোই রুগ্‌ণা। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সে বন্দিনী, স্বামীকে একান্তভাবে পাইবার উপায় তাহার ছিল না, আর-দশজনের চেয়ে বেশি অধিকার তাহার ছিল না। মায়ের সম্মানের মাতার মতো দুর্ধর্ষ চারিত্রশক্তির অধিকারিণী সে নয়, মঞ্জুলীর মতো প্রেমের নোঙরছেঁড়া প্রচণ্ড আকর্ষণই বা তাহাতে কি ভাবে সম্ভব, এমন কি বিনুর মতো 'শেষ দুটি মাসে'র সান্ত্বনাও তাহার ভাগ্যে জোটে নাই—তবু তাহাকে বিদ্রোহিণী বলিতে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ একদিকে যেমন তাহার রক্তমাংস শোষণ করিয়াছে আর-একদিকে তেমনি তাহার মনের ও চোখের উপর হইতে সংস্কারের জড়তার ও অভ্যাসের পর্দাগুলি অপসারিত করিয়াছে, রোগ একপ্রকার দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি দিয়াছে তাহাকে।[১১]

---

১১ রবীন্দ্রসাহিত্যে রুগ্‌ণ নায়কনায়িকার আচরণ ও মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাকঘরের অমল, মাসির যতীন, ফাঁকির বিনু, দুই বোনের শর্মিলা, মালঞ্চের নীরজা, ব্যবধান ও নিশীথের যথাক্রমে বনমালী ও মনোরমা। রোগযন্ত্রণায় রক্তমাংসের ঐকান্তিক দাবি শিথিল হইলে তবেই কি ভিতরকার মানুষটি আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। কবি কি বলিতে চান অনুসন্ধান আবশ্যক।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোল দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল—
হেঁকেছিল, 'খোল্ রে দুয়ার খোল্।'

এ তো পরোক্ষজ্ঞানের কথা, এতদিন পরে রোগযন্ত্রণার পাথর-কাটা পথে—

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননের ফুল ফোটা।[১২]

এই নারীকে বিদ্রোহিণী বলিয়াছি, কিন্তু বস্তুত সে বিদ্রোহেরও উর্ধ্বে, সে পরমমুক্ত। বিদ্রোহী অহং-এর শৃঙ্খলে বদ্ধ, সেই শিকল-ঝন্‌ঝনানিটাই দূর হইতে মুক্তিসংগীতের মতো শ্রুত হয়। এই রুগ্‌ণা নারী কোন্ রহস্যময় প্রক্রিয়ায় প্রত্যহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনেশ্বরের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। স্বামী কর্তৃক অবহেলিত পত্নী চূড়ান্তভাবে অবহেলিত নয়, তাহার পত্নীরূপের অন্তরে তাহার নারীরূপ—সেই নারীরূপের অপেক্ষায় যিনি আছেন শেষ মুহূর্তে তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি অবমানিতার মুখের উপরে পড়িয়া ধন্য করিয়া দেয় তাহার জীবন যৌবন সর্বস্ব—

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।

১২ মুক্তি, পলাতকা

তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে থাক।
মরণ-বাসর-ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।[১৩]

মায়ের সম্মানের মাতার জীবনের সার্থকতা গৌরবময় মাতৃত্বে, মঞ্জুলীর জীবনের সার্থকতা প্রেয়সীত্বে আর বিন্নুর জীবনের সার্থকতা পত্নীত্বে। কিন্তু বর্তমান নায়িকার জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাহার সার্থকতা মাতৃত্বে নয়, প্রেয়সীত্বে নয়, পত্নীত্বে নয়—তাহার সার্থকতার ক্ষেত্র অস্তিত্বের মূলগত ক্ষেত্রে, নারীত্বে। এই বোধটা তাহাকে জাগতিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে—সেইজন্যই সে মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই মুক্তির অন্তরায় অনেক, একটি প্রধান—আমাদের একান্নবর্তী পরিবার; যে প্রথা একসময় প্রাণবন্ত ছিল তখন প্রাণদান করিত, এখন প্রাণহীন বলিয়া কেবল প্রাণহরণেই

১৩ মুক্তি, পলাতকা। এই প্রসঙ্গে স্ত্রীর পত্র গল্পটি স্মরণীয়। দুটি রচনায় ভাবের বিস্ময়জনক মিল, ভাষার মিল অধিকতর বিস্ময়জনক। বস্তুত কবির শেষজীবনে লিখিত অনেক রচনাতেই এই ভাবটি বর্তমান। তিনি যেন বলিতে চান পত্নীত্বে ও মাতৃত্বেই নারীর চরম মূল্য নয়, নারীত্ব বলিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেই মূল্যেই তাহার বিচার। তিনি আরো বলিতে চান সে মূল্য যদি সংসার দিতে অক্ষম হয় স্বয়ং বিধাতা দেন, তিনি কৃপণতা করেন না।

সক্ষম। পলাতকা কাব্যের কাহিনী-কবিতাগুলির সর্বত্র একান্নবর্তী পরিবার; তাঁহার শেষজীবনের অধিকাংশ ছোটগল্পের পরিবেশ একান্নবর্তী পরিবার। কি কবিতায় কি ছোটগল্পে সর্বত্র দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে ব্যক্তির সঙ্গে একান্নবর্তী-প্রথায়, individualএর সঙ্গে জড়সমষ্টিতে।[১৪]

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনা ব্যক্তির বন্ধনমোচনের আহ্বানে পূর্ণ। তিনি দেখিয়াছেন জরা জড়তা অভ্যাস সংস্কার একান্নবর্তী-প্রথা —বন্ধনের আর অন্ত নাই, সমস্তই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিকে, individualকে, পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানের একপ্রান্তে মুক্তি নামে কবিতাটি; হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতি—অন্যপ্রান্তে; শেষপ্রান্তে ল্যাবরেটারি গল্প।[১৫]

॥ ৪ ॥

গোড়াতে পলাতকা কাব্যকে বলাকার বাঙ্ময়রূপ বলিয়াছি। তবে বলাকার বাণী কি? বলাকার বাণী নবতর যৌবনের বাণী। নবতর যৌবন বলিতে কবি বুঝিয়াছেন 'প্রৌঢ়ের যৌবন', যে যৌবন 'ফল চায় না, ফলতে চায়', যে যৌবন ভোগবতীর পরপারবর্তী 'আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে', যে যৌবন তাজমহলের মতো অপূর্ব শিল্প-বস্তুকেও অনায়াসে উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মতো অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ত্যাগ করিতে দ্বিধা করে না, যে যৌবন বলে

আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।[১৬]

১৪ হালদারগোষ্ঠী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৫ পলাতকা কাব্যের পলাতকা কবিতার হরিণশিশু আর হালদারগোষ্ঠীর বনোয়ারীলাল দুইজনেই নববসন্তের হাতছানিতে ঘর ছাড়িয়া উধাও হইয়াছে।

১৬ বলাকা

যে যৌবনের আহ্বানে পরিচিত অভ্যস্ত আরাম ছাড়িয়া অনিশ্চয়ের মধ্যে মানুষ উধাও হয়—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'। এই বাণীর শিখর হইতে দুটি ধারা নির্গত, একটি ফাল্গুনী, অন্যটি পলাতকা। ফাল্গুনীতে মানুষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা কথিত, পলাতকায় তাহাই বিশেষ ভাবে নারী সম্বন্ধে কথিত। ফাল্গুনীর নবযুবকের দল চিরযৌবনের দল—তাহারা শেষ মুহূর্তে আবিষ্কার করে বিশ্বে 'বুড়ো' বলিয়া কেউ নাই, আর জীবন সর্দার, 'বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম'। আর পলাতকা কাব্যের নারীনায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব-পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয়—তখন বুঝিতে পারে "আমি নারী, আমি মহীয়সী"।

চতুর্দশ অধ্যায়

"যে নারী বিচিত্রবেশে"

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য আলোচনা করিবার মস্ত একটা সুবিধা এই যে, অনেক কাব্যের কবিকৃত পটভূমি পাওয়া যায়। সোনার তরী চিত্রা চৈতালির রচনাকাল ব্যাপ্ত করিয়া আছে ছিন্নপত্র গ্রন্থখানা। ঐ কাব্য তিনখানা রচনাকালীন কবির মনের গতিবিধির পদাঙ্ক রহিয়াছে ছিন্নপত্রে। এ যেন আকাশে উড়ো মেঘের মাটিতেপড়া চলতি ছায়া। মেঘেতে আর ছায়াতে মিলাইয়া লইলে সবটা অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। আবার গীতাঞ্জলি কাব্য রচনার পটভূমি শান্তিনিকেতন নামে উপদেশসংগ্রহ গ্রন্থ। এখানে কাব্য ও পটভূমির মধ্যে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ, মাটির নীচেকার মৃণাল ও জলের উপরকার শতদলের যোগ। যে-সাধনার তত্ত্বরূপ শান্তি-নিকেতন গ্রন্থে—তাহারই কাব্যরূপ গীতাঞ্জলি কাব্যে। আরো পরে লিখিত পূরবী কাব্যেরও এমনি একখানি পটভূমি পাওয়া যায় যাত্রী গ্রন্থের পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী অংশে। পূরবী কাব্য রচনাকালে কবির মনে যে-সব ভাবের ওঠাপড়া চলিতেছিল তাহারই কতক ছাপ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে, কতক ছাপ পূরবী কাব্যে। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী ও পূরবী কাব্যের দুই কূলের মধ্যে প্রবাহিত তৎকালীন রবীন্দ্রনাথের কবিমন। কাব্য ও তাহার পটভূমির অন্তরঙ্গতার এমন দৃষ্টান্ত আরো সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখন পূরবী কাব্যের আলোচনায় নামিবার আগে তাহার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা সারিয়া লইতে ইচ্ছা করি।

পূরবী কাব্যের প্রধান অংশ লিখিত হয় কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাকালে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে। অর্থাৎ ইহা সমুদ্রের উপরে ও সমুদ্রপারে লিখিত কাব্য। প্রথম দিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত ষোলটি কবিতা আছে, যাহার মধ্যে চার-পাঁচটি মাত্র পূরবীর বিশিষ্ট সুরে বাঁধা। কাজের সুবিধার জন্যে পূরবী কাব্যের বিভিন্ন অংশের একটা খসড়া তালিকা পাদটীকায় প্রদত্ত হইল।[১]

আমাদের বিবেচনায় পাদটীকায় উল্লিখিত শেষোক্ত ষাটটি কবিতাই যথার্থ পূরবী কাব্য, প্রথম ষোলটির চার-পাঁচটির সঙ্গে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যোগ আছে—যথাস্থানে সে যোগ দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহার আগে কাব্যরচনার ইতিহাস বিবৃত করি—ইহাও বহিরঙ্গের কথা।

কবি ১৯২৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলম্বো বন্দরে জাহাজে চাপিলেন। প্রথম দিন-দুই বাদলা ছিল, কাজেই কবির মন প্রসন্ন ছিল না। তার পরে সূর্যের আলো দেখা দিতেই প্রসন্ন কবিমন আপন কল্পনার মহিমায় জাগিয়া উঠিল—লিখিত হইল সাবিত্রী কবিতাটি। কলম্বো হইতে মার্সাই বন্দরে পৌঁছিবার মধ্যে ছয়টি কবিতা লিখিত হইল। এই ছয়টি কবিতার সমান্তরালে চলিয়াছে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী—যাহাকে আমরা এই কাব্যের পটভূমি বলিয়াছি।

ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বুয়োনেস এয়ারিস পর্যন্ত সমুদ্রপথে অনেকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে। আবার বুয়োনেস এয়ারিসে থাকাকালীন আরো অনেকগুলি কবিতা

---

১ প্রথম অংশে ষোলটি। তন্মধ্যে শেষ ছয়টি ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিত। অন্য দশটি তার আগে বিভিন্ন সময়ে রচিত।

প্রধান অংশে ষাটটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী, মোট চার মাস কাল।

লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার মতো এই যে ইহাদের সমান্তরাল ভাবে গদ্যের কলম চলে নাই। আবার বুয়োনেস এয়ারিস হইতে ইটালী ফিরিবার পথে কবির গদ্যের কলম বেশ সচল—নাই কবিতা। তার পরে ইটালী হইতে বোম্বাই ফিরিবার পথে সমুদ্রপথে লিখিত হয় তিনটি কবিতা, সঙ্গে অবশ্য ডায়ারী আছে, তবে দুয়ের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়। একটি কবিতা ইটালীর মিলান শহরে লিখিত। ইহাই পূরবী কাব্যরচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পাঠকের সুবিধা হইবে আশায় পাদটীকায় আমরা কবিতা ও গদ্যের জোড়-মেলানো রূপের একটা খসড়া দিলাম।[২]

পূরবীর বহিরঙ্গের আলোচনা একরকম শেষ করিয়া এবারে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। বলাকা কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, তার পরে পূরবীর প্রকাশ ১৯২৫ সালে। মধ্যবর্তী নয় বৎসরে

২

পূরবী কাব্যের কবিতা	পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর পৃষ্ঠাঙ্ক
সাবিত্রী	৩৭৬-৩৭৮
পূর্ণতা	৩৮৬-৩৯৬
আহ্বান	৩৮৬-৩৯৬
ছবি	৩৯৬-৩৯৮
লিপি	৩৯৯
ক্ষণিকা	৪০৩
খেলা	৪০৩-৪০৯
পদধ্বনি	৪৩৮-৪৪০

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী রবীন্দ্ররচনাবলী উনবিংশ খণ্ডের যাত্রী গ্রন্থের অন্তর্গত। পৃষ্ঠাঙ্কগুলি সেই গ্রন্থভুক্ত।

এই সব কবিতার প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াও রক্তকরবী, শিশু ভোলানাথ প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা আছে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব ও নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ক বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা পাওয়া যাইবে গ্রন্থখানির মধ্যে।

কবি গান লিখিয়াছেন অনেক—আর কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন দুইখানি, পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ; প্রথমখানি নারী-বিষয়ক, দ্বিতীয়খানি শিশু-বিষয়ক। এ দুখানার গুরুত্ব হ্রাস না করিয়াও বলা চলে যে, বলাকার পরে পূরবী রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রধান কাব্য। আর এ কাব্যখানি বলাকার মতো মিশ্র ভাবোপাদানে গঠিত নয়—ইহা অমিশ্র প্রেমের কাব্য। কিন্তু আলোচনার পথে আরো একটু অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে এই চারখানি কাব্যে, বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ ও পূরবীতে যোগটা ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

বলাকা কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে পৃথিবীর বৃহৎ সামাজিক সমস্যায় কবির মন যখন উত্তেজিত ছিল তখন হঠাৎ বহুকাল পূর্বে পরলোকগত প্রিয়জনের একখানি ছবির সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত হইলেন। সেই মানসিক ভূমিকম্পে প্রিয়জনের স্মৃতি ও সেই স্মৃতির সূত্রে তাঁহার 'ভুলে-যাওয়া যৌবন' কবির কাছে এমন একটা মহত্তর বাস্তবসত্তা লাভ করিল যে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ইহার একমাত্র তুলনা প্রথম যৌবনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন বহন করিতেছে পরবর্তী কাব্যসমূহ, বলাকার এই অভিজ্ঞতার ছাপ তেমনি বলাকা-পরবর্তী কাব্যসমূহে। বলাকা-পরবর্তী অধিকাংশ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা এই অভিজ্ঞতার শিখর হইতে নির্গত। সে অভিজ্ঞতার মূল কথা প্রেম, অধিকাংশ পরবর্তী কাব্য ও কবিতা প্রেম-বিষয়ক। পূরবী এই শ্রেণীর কাব্যের পুরোভাগে অবস্থিত। বলাকার অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় যৌবনের সিংহদ্বারে জীবনের এক রহস্যময় নিকেতনে কবি প্রবেশ করিয়াছেন।

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর ভূমিকাস্বরূপে কবি বলিতেছেন যে, ডায়ারী লেখা তাঁহার অভ্যাস নয়, কিন্তু এবারে ডায়ারী লিখিবেন। উপলক্ষ্যটা তুচ্ছ, একটি মেয়ের অনুরোধ। ইহা নিতান্তই উপলক্ষ্য

—আসল কথা, অনেক বিষয় মনের মধ্যে জমিয়া ছিল, সেগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক। ঐ অনুরোধটুকু না থাকিলেও, খুব সম্ভব অন্য একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া লইয়া তিনি ডায়ারী লিখিতেন। কিন্তু এই রচনাটিকে কবি কেন ডায়ারী অভিধা দিলেন জানি না, ডায়ারীতে যে প্রাত্যহিক পরিবেশ প্রত্যাশিত, দৈনন্দিনের সঙ্গে চিরন্তনের যে মিশ্রণ স্বাভাবিক—ইহাতে তাহার কিছুই নাই। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী প্রাত্যহিক পরিবেশ -বিমুক্ত চিন্তাধারা। সন-তারিখের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহা একখানি অবিচ্ছিন্ন দার্শনিক সন্দর্ভ —যাহার মূল বক্তব্যবিষয় প্রেমতত্ত্ব ও নরনারীর সম্পর্ক। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিষয়টা ব্যাপকভাবে তাঁহার মনের মধ্যে ছিল —এবারে অনবচ্ছিন্ন অবকাশের সুযোগে প্রকাশের পথ পাইল। বলাকা কাব্য রচনার সময় হইতেই এ দুটি বিষয় কবির মন অধিকার করিয়াছিল, তাহারি কাব্যময় প্রকাশ পলাতকা ও শিশু ভোলানাথে পাইয়াছি—এখন গদ্যে, পদ্যে, তত্ত্বে, কাব্যে পূর্ণাঙ্গ রূপে পাইলাম পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে ও পূরবীতে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে দ্বিতীয় যৌবনটা, যাহাকে তিনি 'প্রৌঢ়ের যৌবন' বলিয়াছেন, অধিকতর সার্থক। এই 'প্রৌঢ়ের যৌবনে'র পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে ফাল্গুনী নাটকে—আর ইহার প্রথম অতর্কিত সাক্ষাৎ বলাকা কাব্যে। এই সূত্রটি হইতে একাধিক উপসূত্র বাহির হইয়াছে। তাঁহার কল্পনার উপরে রূপান্তরপ্রাপ্ত নারীর প্রভাব সমধিক। আমরা আগে প্রসঙ্গান্তরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কোনো বস্তু, ঘটনা বা মানুষ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে তেমন করিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এখানে দূরত্ব বলিতে মৃত্যুকেও বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে যে কয়জন মানুষ বার বার উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সকলেই তরুণ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছে। আর এই লোকান্তর-প্রাপ্তির পরে তাহারা যেন অধিকতর দিব্যমূর্তি গ্রহণ করিয়া কবির

চিত্তাকাশে উদিত হইয়া আলোছায়ার লীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বলাকার সেই ছবিখানা যাহারই হোক সে ব্যক্তি মৃত, দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত—তাই সে কবির জীবনে এমন প্রোজ্জ্বলভাবে সফল। যৌবন দেহের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া মনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে তবে প্রৌঢ়ের যৌবন—ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই প্রিয়ব্যক্তি জীবলোক হইতে অপসৃত হইয়া স্মৃতিলোকে পুনরুদিত হইলে তবেই যেন তাহার পূর্ণ প্রভাব প্রকট হয়। 'স্মৃতির চেয়ে আসলটিতে আমার অভিরুচি'—এ ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের কথা; কবি-রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক উল্টা। বস্তু, ঘটনা ও মানুষ একবার বিস্মৃতিসাগরে ডুব দিয়া উঠিয়া দিব্যমূর্তি না ধারণ করা পর্যন্ত তাঁহার কল্পনার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায় না। এই জন্যেই ডায়ারী ও সাময়িক কবিতা রচনায় তাঁহার আগ্রহের অভাব। ডায়ারী দিনের সঞ্চয় তথ্যের ডালায় ধরিয়া রাখে; সাময়িক কবিতা সময়ের অঙ্কপাত ভুলিতে দেয় না। আর জীবন্ত মানুষ সন তারিখ ও তথ্যপুঞ্জের সহিত এমন জড়িত যে তাহার সম্যক্ রূপটি, বিশুদ্ধ রূপটি পড়িতে চায় না কবির চোখে—সেজন্য তাহাকে মরিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইবে কবির জগতে। তাই পূর্বোল্লিখিত মূল সূত্রের উপসূত্র হইতেছে কবির কাছে মিলনের চেয়ে বিরহের মূল্য বেশি।

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।[৩]

'শুধু এক ঠাঁই' দেখা নিতান্তই আংশিক দেখা, তাহাতে তৃপ্তি নাই; সম্যক দেখাই সত্য দেখা, সে-দেখা একমাত্র বিরহেই সম্ভব।

> বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেথানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে

৩ মানস-সুন্দরী, সোনার তরী

পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে—

"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
তুমি সে নয়নের তারা"—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।[৪]

তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এলো বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।[৫]

পূরবী কাব্য তথা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমকাব্য বিরহের শূন্যতা-মন্থন-জাত 'স্বপ্নের ভুবন'। এখন, এই যে রূপান্তরপ্রাপ্ত নারী, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাম দিয়াছেন লীলাসঙ্গিনী। জীবলোক ও স্মৃতিলোক ব্যাপিয়া কবি ও কবিপ্রেয়সীতে যে নিত্যলীলা চলিতেছে,

৪ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ ৩৯৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড

৫ পূর্ণতা, পূরবী

সেই লীলাসহচরীর অন্য আর কোন্ নাম সম্ভব? মূল সূত্রের ইহা আর একটি উপসূত্র। পূরবী কাব্যের বিস্তারিত আলোচনাপ্রসঙ্গে লীলাসঙ্গিনী তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কাজেই এখন তাহাতে বিরত থাকিলাম। এবারে পূরবী কাব্যের বিশদ পরিচয়ে অবতীর্ণ হওয়া যাক।

বলাকা কাব্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গ বারে বারে উল্লেখ করিয়াছি। বলাকা-পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সহিত বলাকা কাব্যের নিবিড় যোগ—বস্তুত বলাকার শিখরেই ইহাদের উদ্ভব। ফাল্গুনী নাটকে প্রৌঢ়ের যৌবনের বিশদ চিত্র—তাহার মূলে বলাকার 'ভুলে-যাওয়া যৌবনে'র অতর্কিত আহ্বানের অভিজ্ঞতা। পলাতকা কাব্যে নারীজীবন সম্বন্ধে যে নূতন ধারণা কবির মনে দেখা দিয়াছে—বলাকা-পূর্ব-জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাধান্য নারীর মাতৃ-মূর্তির, বলাকা-পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই প্রাধান্য পাইয়াছে নারীর প্রেয়সী মূর্তি—পলাতকায় প্রথম স্পষ্টভাবে সেই প্রেয়সী নারীকে দেখিতে পাই—এই পলাতকা কাব্যখানির উৎসও বলাকার নিভৃত গহ্বর। ১৯২২ সালে শিশু ভোলানাথ কাব্যে যে শিশুকে পাই, শিশু কাব্যের শিশুর ন্যায় সে real নয়—সে আগাগোড়া ideal, সে কবির বৃদ্ধবয়সের দ্বিতীয় শৈশবের লীলা-সহচর। শিশু ভোলানাথ কাব্য রচনার বিস্তারিত পটভূমি পাওয়া যাইবে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারীতে।[৬] কৌতূহলী পাঠকদের পূর্ণ বিবরণ পড়িবার ভার ছাড়িয়া দিয়া এখানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

> তার পরে কথাটা এই যে, ঐ 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

৬ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ ৪০৩-৪০৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকায় প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, কিছুই জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণীপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে-যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড় করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড় বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ'

লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে, সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

এই কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে-লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, সে-লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল। সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে।'

রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই লীলারহস্য বোঝা অত্যাবশ্যক। কবির দৃষ্টিতে এই বিশ্বব্যাপারটাই লীলা, যাহার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ভগবানের লীলাময় রূপ। মানুষ নিজের স্বরূপ বুঝিলে দেখিতে পায় যে সে বিধাতার লীলাসহচর। এই বিশ্বব্যাপী লীলানিকেতনেরই একটা ক্ষুদ্রতর রূপ মানুষের সংসার। সেখানে কবি লীলানায়ক, তাহার সহচর যে শিশু সে-ও লীলাময়—তাই সে ideal। এই লীলাতত্ত্ব নারীর উপরে আরোপ করিলে যে নারীকে পাই সে 'বিশ্বের কবিতা' বা 'গৃহের বনিতা' নয়—সে নিতান্তই লীলাসহচরী, লীলাসঙ্গিনী। বলাকা-পরবর্তী কবির মানসী হইতেছে কবির লীলাসঙ্গিনী। সেই লীলাসঙ্গিনীর প্রথম নিঃসংশয় উজ্জ্বল প্রকাশ পূরবী কাব্যে। তাই পরবর্তী সমস্ত কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূরবীর এত মূল্য।—এই লীলাসঙ্গিনী নারী 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের শিশুর মতোই ideal। এই লীলাসঙ্গিনী

৭ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ ৪০৮-৪০৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড

কোনো বিশিষ্ট নারীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছে না—এ কথা একমুহূর্তের জন্যও ভুলিলে চলিবে না। কবির জীবনে পর্বে পর্বে যে-সব নারীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাদের স্মৃতি, মাধুর্য, করুণা, সৌন্দর্য প্রভৃতি উপাদান লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে থাকিতে পারে, বস্তুত তাহাদের উপাদানেই লীলাসঙ্গিনীর মিশ্র মূর্তি গঠিত, তৎসত্ত্বেও সে ক, খ, গ প্রভৃতি কোনো বিশিষ্ট মহিলা নয়। Real যখন ideal হইয়া ওঠে তখন এই নিয়মেই ওঠে।

এখন, এই লীলাসঙ্গিনী-তত্ত্বটা, লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপটা বেশ ভালো করিয়া না বুঝিলে রবীন্দ্রপ্রেমতত্ত্ব বোঝা সহজ হইবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে তাহাতে যেন মানবিক স্পর্শের অভাব। চণ্ডীদাসের অনেক পদ পড়িতে পড়িতে মনে হয় কবি যেন আমাদের হৃদয় নিঙড়াইয়া শেষ বিন্দু রস নির্গত করিয়া লইতেছেন, কবিতার ধ্বনি যেন 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর'—তার পরে অতর্কিত পাঠক দেখিতে পায় কখন যেন রাধিকার আর্তির আগুনের তাপে নিজের দেহ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথে এ-সমস্তর কিছুই নাই। তাঁহার নায়িকা যেন স্ফটিকের প্রাচীরের অন্তরালে। হাত বাড়াইলে তাহাকে পাই না, হাতে ঠেকে স্ফটিকের শীতলতা। তাঁহার প্রেমের কবিতার উপবনে যে বসন্তের হাওয়া বহিতেছে তাহাতে ফুলের পরাগ, জীর্ণ পাতা ও পাঠকের মন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়—সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা বাসন্তিক উদ্‌ভ্রান্তি ও দীর্ঘনিশ্বাসের উদাসীনতা। এখন, এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাঁহার অধিকাংশ প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্য, শেষজীবনের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে তো নিঃসন্দেহ সত্য, তাঁহার প্রেমের কবিতা যদি 'বিশ্ব হতে হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নলোকের চাবি'—খুঁজিতে উদ্যত হইয়াই ইশারায় জানাইয়া দেয় যে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়—তবে তাহার প্রধান কারণ কবির মানসী লীলাসঙ্গিনী, ideal-এর

রসে সে গঠিত, বিরহের পটে সে অবস্থিত। স্মৃতির ক্ষুধিত পাষাণের ছলনাময়ীর মতো সেই নারীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে কবি বিস্মিত হন—

এলো চুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?[৮]

তার পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া যেন চিনিতে পারেন—

দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।[৯]

পূরবী কাব্যের গোড়ার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রার পূর্বে লিখিত কবিতাগুলি যে অংশে স্থান পাইয়াছে তাহাতে এই তিনটি কথাই সংক্ষেপে বর্তমান। এই অংশটাকে সমগ্র পূরবী কাব্যের ভূমিকা বলিলে মন্দ হয় না। বলাকা কাব্যে 'ভুলে-যাওয়া যৌবন' কবিকে অক্ষয় মন্দারের মালা পাঠাইয়াছে। তপোভঙ্গ কবিতায় সেই ভুলে-যাওয়া যৌবনের দিনগুলি হঠাৎ ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।

৮ লীলাসঙ্গিনী, পূরবী
৯ লীলাসঙ্গিনী, পূরবী

আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?[১০]

সে-সব দিন কি একেবারেই চলিয়া গিয়াছে ?

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।[১০]

বলাকা কাব্যে যৌবন নিজে জানাইয়াছে সে আছে,—নূতনতর, উজ্জ্বলতর মূর্তিতে আছে। এখানে কবি জানাইতেছেন সে আছে, স্বয়ং মহাপ্রেমিক আদি দম্পতির ধ্যানের অন্তর্গত হইয়া আছে। 'নাই' এ কথাটা শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসীদের অহমিকা-সঞ্জাত ভ্রান্তি। এখন, এই রূপান্তরিত যৌবনের অমরাবতীই হইতেছে রূপান্তরিত মানসীর খেলার ঘর—লীলাসঙ্গিনীর লীলাভূমি। গানের সাজি ও লীলাসঙ্গিনী কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে পাঠ্য।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।[১১]

সে-সব দিন বিস্মৃতির টানে চলিয়া যায় নাই বলিয়াই আজ পায়ে রাখিয়া আসা সম্ভব হইতেছে। 'রসে বিলীন' দিনগুলি ভাবলোক উত্তীর্ণ হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আর বকুলবনের পাখী কবিতাটিতে কবির চোখে হঠাৎ পড়িয়াছে নিজের বহুকাল আগেকার বালকমূর্তিটি।

১০ তপোভঙ্গ, পূরবী

১০ তপোভঙ্গ, পূরবী

১১ গানের সাজি, পূরবী

বালক ছিলাম কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।[১২]

এখানেই সেই সংশয়ভরা প্রশ্ন—সে-সব দিন কি সত্যই চলিয়া গিয়াছে?

যায়নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।[১৩]

না, কিছুই যায় নাই, পৃথিবীর আনন্দের সহিত মিশিয়া সর্বব্যাপী হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। বালকের আনন্দ আজ সর্বলোকের আনন্দ। কাজেই দেখা যাইতেছে রূপান্তরিত যৌবন, মানসী ও বালক অর্থাৎ প্রৌঢ়ের যৌবন, লীলাসঙ্গিনী ও শিশু ভোলানাথ এই তিনটিই সমসূত্রে উপস্থিত। এখন এই তিনটি আইডিয়াকে মনের মধ্যে লইয়া কবি দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষ্যে জাহাজে চড়িয়াছেন। আর সমুদ্রপথের সুদীর্ঘ অবকাশের সুযোগে এই ভাব তিনটি অবাধে শাখাপ্রশাখা মেলিয়া দিয়া পূরবী কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

পূরবীর আহ্বান কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব তথা রূপান্তরিত প্রেয়সীতত্ত্ব বীজাকারে

১২ বকুলবনের পাখী, পূরবী
১৩ বকুলবনের পাখী, পূরবী

রহিয়া গিয়াছে।[১৪] তপোভঙ্গ কবিতা যদি ভুলে-যাওয়া যৌবনের পুনঃস্মরণে লিখিত হয়—আহ্বান কবিতা ভুলে-যাওয়া নারীসমূহের, যাহারা এখন মিলিয়া মিশিয়া গিয়া The woman বা আদর্শ নারীতে পরিণত হইয়াছে—পুনঃস্মরণ। উষা যেমন অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত জগৎকে সম্বিৎ দান করিয়া আত্মস্থ করিয়া তুলিয়া গানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে—তেমনি

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী
দেবতার দূতী।
মর্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।

* *

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সঙ্গীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।[১৫]

সেই অভিসারিকা নারীর জন্যই কবির চিত্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। সে আসিবে, কবিকে দিয়া জীবনের চরম গান গাওয়াইবে—তার পরে এই লীলার অবসান। সেই নারীকে আহ্বান এই কবিতায়।

১৪ সাবিত্রী একটি সার্থক ও উচ্চাঙ্গ কবিতা। কিন্তু যে ভাবসূত্রে আমরা পূরবী কাব্যের অধিকাংশ কবিতা গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি—সাবিত্রী তাহাদের অন্তর্গত নয়। সূর্যের আলোর সঙ্গে কবির ইন্দ্রিয়সমূহের, সবিতৃদেবের সঙ্গে কবির মনের যে নিগূঢ় যোগ আছে—এই কবিতায় তাহারই প্রকাশ। ওটিকে পূরবী কাব্যের উদ্বোধনী কবিতা মনে করা উচিত। এই উদ্বোধনী কবিতা কবিকল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়া পূরবী কাব্যের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

১৫ আহ্বান, পূরবী

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্রবেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।[১৬]

এখানে "সে নারী বিচিত্রবেশে"—এই শব্দকয়টির উপরে একটু জোর দিতে চাই। এখানে একসঙ্গে এক এবং অনেককে পাইলাম। আমরা আগে বলিয়াছি যে কবির জীবনে যুগে যুগে যে-সব নারী আসিয়াছে—তাহাদের উপাদানে একটি মিশ্র নারীসত্তা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা একরকমের স্মৃতির তিলোত্তমা। ইহাকেই রূপান্তরিত নারী বা আদর্শ নারী বলিয়াছি। 'বিচিত্রবেশ' বলিতে নিশ্চয় কেবল বহিরঙ্গের প্রসাধন বা সাজসজ্জা মাত্র বুঝাইতেছে না। বাস্তবের ক্ষেত্রে ইহারা বিচিত্র বা বহু বা women, কল্পনার ক্ষেত্রে ইহারা এক বা The woman! এই The woman পূরবীর নায়িকা, তাহার সঙ্গেই কবির লীলা, সে-ই কবির লীলাসঙ্গিনী। তাহাকেই এই কাব্যে তিনি ফিরিয়া ডাকিয়াছেন—আবার কখনো বা তাহার 'পরশরসতরঙ্গে' পুলকিত হইয়া কবি গান রচনা করিয়াছেন। লিপি কবিতায় পৃথিবীকে বিরহিণী নারী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে এবং অতঃপর পৃথিবী জীবজননী রূপে কল্পিত হইয়াছে। এখানে বিরহিণী রূপে তাহার কল্পনা অভিনব—এই অভিনবত্বের কারণ আর কিছুই নয় এখানে পৃথিবীতে আদর্শ নারীরূপ আরোপিত হইয়াছে—কেননা, এখন চরাচরের চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই ঐ একমাত্র প্রসঙ্গেই সত্য। পরবর্তী ক্ষণিকা, খেলা, অপরিচিতা, আনমনা, ও বিস্মরণ প্রভৃতি কবিতা লীলাসঙ্গিনীর সহিত বিচিত্র লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ণ। তন্মধ্যে ক্ষণিকা কবিতাটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

এবারে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী হইতে যে অংশ উদ্ধার করিতে

---

১৬ আহ্বান, পূরবী

যাইতেছি তাহাতে অনেকগুলি বিষয়ের মীমাংসা হইবে। কবি লিখিতেছেন—

> এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।…মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটলো। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। …তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিলে ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেলে।' মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল, তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বলছে, একদিন যারা ছোটো হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোটো হয়ে তাঁদের কাছে আর একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভান করে এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর একবার যেন তারা আমাকে বলে 'তোমাকে চিনেছি', আমি যেন বলি 'তোমাদের চিনলুম'।[১৭]

এই অংশটির বিস্তারিত আলোচনায় নামিবার আগে সমান্তরালে লিখিত ক্ষণিকা কবিতার একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

১৭ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ, ৪০৩, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৯শ খণ্ড

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।[১৮]

মনে রাখা আবশ্যক ক্ষণিকা কবিতাটি ও ডায়ারীর পৃষ্ঠোক্ত অংশ একদিনের ব্যবধানে লিখিত।[১৯]

আমরা আগে বলিয়াছি যে শিশু ভোলানাথের লীলাসহচর তত্ত্ব ও পূরবীর লীলাসহচরী বা লীলাসঙ্গিনী তত্ত্ব একই প্রেরণা হইতে সঞ্জাত। ডায়ারীর পৃষ্ঠোক্ত পাঠের পরে আর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

> মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটলো।

দেখা যাইতেছে দুটি ভাবের মূলেই কবিচিত্তের একই প্রেরণা। ঐ দিনে লিখিত ডায়ারীর অংশেই শিশু ভোলানাথের বিস্তৃত আলোচনা আছে—তাহাও আমার মতের সমর্থক। প্রবন্ধমধ্যে বলিয়াছি যে কবির জীবনে যুগে যুগে যে-সব নারী আসিয়াছে, লীলাসঙ্গিনী তাহাদেরই মিশ্র একটা রূপ—অর্থাৎ সে এক হইলেও উপাদান রূপে অনেক আছে তাহার মধ্যে। সে একটি composite

১৮ ক্ষণিকা, পূরবী

১৯ ডায়ারীর অংশ, ৫ই অক্টোবর, ১৯২৪; ক্ষণিকা কবিতা—৬ই অক্টোবর, ১৯২৪।

এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 'তারা' কবিতাটি।

personality। ইহার অনুকূলেও প্রমাণ মিলিবে উদ্ধৃত অংশে—'কিশোর বয়সে যারা আমাকে',...আবার 'তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়।' কবিতায় যে নারী একবচনের চৌদোলে অধিষ্ঠিতা, বাস্তবে তাহাদের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল বহুবচনের বৃহৎ ময়ূরপঙ্খী নৌকার। আরো দেখা যাইবে যে কৈশোরে ও যৌবনে যে-সব নারী ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া অস্ত গিয়াছিল কবির জীবনে, জীবনের উত্তরার্ধে তাহারাই যখন নক্ষত্ররূপে উদিত হইল তখন দেখা গেল যে দিবসের এলোমেলোর মধ্যে যাহাদের ক্ষণিকা মনে হইয়াছিল বস্তুত তাহারা চিরক্ষণিকা—তাহারাই নক্ষত্রের মতো শাশ্বত। পূরবী কাব্যের কবিতার পর কবিতা এই লীলাসঙ্গিনীর পদাঙ্কমেখলা রচনা করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্তে আর একটু আলোচনা করিতে চাই, তার আগে লীলার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা দেখা আবশ্যক। খুব সম্ভব কিশোর প্রেম কবিতাটিতে কবি আপনার অগোচরে ব্যাখ্যার সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াছেন।

অনেকদিনের কথা সে যে অনেকদিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?[২০]

কবির পক্ষে এ লীলা সম্ভব হইয়াছে, কেন না, 'পুরানো সেই ঘাটের ধারে, ফিরে এল কোন্ জোয়ারে'—পুরাতন কিশোর প্রেমের দরুন ব্যাকুলতার স্মৃতি।

আমার মনে হয় মানুষের চৈতন্যের স্রোতে রীতিমতো জোয়ার ভাটা খেলে। ভাটার টানে যাহা ভাসিয়া গিয়াছে জোয়ারের ঠেলায় তাহা মাঝে মাঝে পুরাতন ঘাটের ধারে ফিরিয়া আসে। ইহাকে স্মৃতির খেয়াল বলিয়া লঘু করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই 'জোয়ার'

২০ কিশোর প্রেম, পূরবী

স্মৃতির চেয়েও কিছু বেশি। কালিদাস দুষ্মন্তকে দিয়া বলাইয়াছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

'ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি'—এ কি কেবল স্মৃতির খেয়াল? স্মৃতি কি জন্মান্তরের সংস্কার টানিয়া আনিতে পারে? না। রবীন্দ্রনাথ যে জোয়ারের কথা বলিয়াছেন খুব সম্ভব কালিদাস এখানে তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই জোয়ারের টানে রবীন্দ্রনাথের মনে 'কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা' 'আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা'। অবশ্য কিশোর প্রেমের এই স্মৃতি ইহজীবনেরই বস্তু। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের দুষ্মন্তের মতোই জন্মান্তরের রহস্যের আবির্ভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। বসুন্ধরা, ও সমুদ্রের প্রতি শ্রেণীর কবিতায় কবি যে 'মহাব্যাকুলতা'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি' পর্যায়ের বস্তু। উহার আর কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না—উহার আর কোনো প্রমাণও সম্ভব নহে। চৈতন্যের মধ্যে এইরূপ একটা প্রক্রিয়া আছে বলিয়াই আপনার অতীতের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া ও তাহাকে বাস্তবের সীমানাভুক্ত করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে লীলার সম্পর্ক স্থাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। 'আজ বেদনায় উঠল ফুটে—তার সেদিনের ব্যথা'।

ব্যাপারটি যেমন নিগূঢ় তেমনি কল্পনাতীত, কবিও অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া ইঙ্গিতের বেশি করিতে সক্ষম নন। এখানে তেমনি একটি ইঙ্গিতের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মনের কথা যত
উজান তরীর মতো;
পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণপারে নিয়ে চলে,

চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
সেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।[২১]

মনের দোটানা ভাবটি, যাহার ফলে পুরাতন ঘাটের ধারে জোয়ারে ফিরিয়া আসা সম্ভব, এখানে ইঙ্গিতে অঙ্কিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহাই লীলার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি। এবার লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

লীলার সঙ্গে জীবনের গোড়াকার প্রভেদটা এই যে জীবন বর্তমান ও বাস্তবের অঙ্গ, লীলা বাস্তবের অতীত ও চিরন্তনের অংশ। চব্বিশ বৎসর বয়সে যার মৃত্যু হইয়াছে, হাজার বছর পরেও তাহার বয়স চব্বিশ থাকিবে। জীবনের কোনো স্পর্শে আর সে আবিল হইবে না।

তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।[২২]

এ দুয়ের মধ্যে আর একটি গোড়াগুড়ি প্রভেদ এই যে লীলা-রঙ্গমঞ্চের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে একজনের স্থান বাস্তবের মধ্যে আর একজনের স্থান বাস্তবের উর্ধ্বে। সেইজন্যে দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র ; প্রেম আছে অথচ প্রেমের আসক্তি নাই ; আকর্ষণ আছে অথচ ঘরে ফিরিবার চেষ্টা নাই। এ জগতে যেন মাধ্যাকর্ষণের শক্তি নাই, দুজনেই বেশ হাল্কা। সেইজন্যেই এখানকার আবহাওয়ায় মুক্তিটা সহজলভ্য, সামান্য একটুখানি হাত বাড়াইলেই দেখা যায় যে আদৌ দুর্লভ নয়। শুধু তাই নয়। বাস্তবের অঙ্গীভূত রূপে যে ব্যক্তি একসময়ে বন্ধনস্বরূপ ছিল, লীলার জগতে—

২১ শীত, পূরবী ২২ ছবি, বলাকা

সেই তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন—

তখন বড় একটি ভরসা ও আনন্দ পাওয়া যায়। লীলার ক্ষেত্রে মিলন মুক্তির মিলন—কবি সর্বদা সেইদিনের আশাতে আছেন—

সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা।

তখন ঝড় আসিয়া যে গর্জন করে তাহাও মুক্তির আশ্বাসে পূর্ণ—

রাখি যাহা, তাই বোঝা.
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।[২৩]

লীলারসে যে মুক্তি তাহারই জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা—

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত,
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।

যতক্ষণ জীবনে এই লীলারসের উপলব্ধি না ঘটিতেছে ততক্ষণই 'পদধ্বনিতে' শঙ্কা জাগে—কত না অমূলক ভয় পাইয়া বসে। তবু মনের মধ্যে একটুখানি ভরসার মতো থাকে—এ বুঝি তাহারই, আমার দোসরের, আমার লীলাসঙ্গীর পদধ্বনি!

হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাকো মোরে কি খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে।

আসক্তিহীন সম্বন্ধ, বন্ধনহীন প্রেম ও বাস্তবাতীত পরিবেশ এই লীলাতত্ত্বের মূল কথা, রবীন্দ্রনাথের লীলারসসঞ্জাত প্রেমের

২৩ ঝড়,

কবিতাগুলিরও মূল কথা। কাজেই লীলারসিক কবির চূড়ান্ত আশা অতি সামান্য, অতিশয় তুচ্ছ—

"ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।[২৪]

আশা করিতেছি এতক্ষণে লীলাতত্ত্বের একটা কাঠামো গড়িয়া তাহার মধ্যে পূরবী কাব্যখানাকে স্থান করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি। আর একটুখানি চেষ্টা করিলে পূরবী কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতা-গুলিকে কাঠামোর মধ্যে সাজানো সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে হয় না, আমাদের ধারণা যদি যুক্তিসহ হয়, তবে খসড়াতেই পূর্ণরূপের আভাস পাওয়া যাইবে। তবু মনে হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আর একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

সকল কবির মনে লীলারসের প্রভাব সমান প্রকট বা প্রবল নয়। কাহারো মনে বেশি কাহারো কম। এমন হয় কেন? রবীন্দ্রনাথের মনে যেমন প্রবল তেমনি প্রকট, তেমনি তার বৈচিত্র্য। বস্তুত শেষ জীবনের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা ও প্রেমের কবিতার আধিক্য—লীলারস হইতেই উদ্ভূত। আগে শুধাইয়াছি কেন এমন হয়, এখন রবীন্দ্রনাথের বেলায় শুধাইতেছি কেন এমন হইল? অন্যান্য কারণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হইতেছে যে তাঁহার মনের গড়নটাই ইহার অনুকূল। একটি গানে তিনি বলিয়াছেন যে 'মাটির মাঝে বন্দী যে-জল মাটি পায় না তাকে'।—যখন সেই জল বাষ্পরূপে আকাশে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয়, মেঘে পরিণত হইয়া বিচিত্র আকারের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া রঙে আর বাতাসে যখন লীলা শুরু করিয়া দেয়—তখনই তাহার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিবার ভূমিকা সৃষ্টি হয়—অবশেষে ফিরিয়া আসে বর্ষণধারায়। সমাপ্ত হয় তাহার চক্রাবর্তন। কবির মনেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে।

২৪ আশা, পূরবী

বর্তমানের গণ্ডীতে আবদ্ধ মানুষকে যথার্থরূপে তাঁহার পাইবার উপায় নাই। সে মানুষ যখন স্মৃতির মেঘ রূপে মনের আকাশে লীলা শুরু করে—তখনই তাহাকে পাইবার ভূমিকা রচিত হয়—অবশেষে বাণীরূপে নামে কবির কল্পনায়। এমন যে হয় তার কারণ কবির মনের বিশেষ প্রকৃতি। পূরবী কাব্যের পথ ও চাবি কবিতায় নিজ মনের বিশেষ প্রকৃতির বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার-ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।[২৫]

কবির মন পথের মতো উদাসীন, পথের মতো সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখের বাহন হইয়া সুখদুঃখের অতীত, সকলের হইয়াও সকল হইতে বিচ্ছিন্ন।

শুধু শিশু বোঝে মোরে ; আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
শিশু বোঝে মোরে।[২৬]

আবার শিশুতে, লীলারসিক শিশু ভোলানাথে আসিয়া পড়িলাম। পথ সঙ্গ পায় শিশুতে, কবি সঙ্গী পান শিশু ভোলানাথে। পথের ভূমিকা লীলা, কবির ভূমিকা লীলার সাহায্যে।

এবারে চাবি কবিতাটি—

২৫ পথ, পূরবী

২৬ পথ, পূরবী

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানা মতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে 'খুলে দাও' ; উপায় জানি না খুলিবারে।
... ...
দূরে চেয়ে থাকি একা—
মনে করি, যদি কভু পাই তার দেখা
যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদিকালের কোন্ বাণী ;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান।[২৭]

কবি এখানে যাহার অপেক্ষায় আছেন, আহ্বান কবিতায় তাহাকেই ফিরিয়া ফিরিয়া ডাকিয়াছেন। সে চাবি কেহ কুড়াইয়া পাইয়াছে, একদিন আসিয়া অপূর্ব-উন্মুক্ত দ্বার সে খুলিয়া ফেলিবে এই দুর্মর আশা কিছুতেই যায় না। আমার তো মনে হয়, সে চাবি কেহ কখনো পাইবে না, সে চাবি অতলে পড়িয়াছে। 'বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি'।

চিররুদ্ধ যাহার মন, বাস্তবের প্রবেশের পথ যেখানে নিষিদ্ধ

---

২৭ চাবি, পূরবী

সেখানে 'বহু-কক্ষে-ভাগ-করা' হর্ম্যকে লীলার পুত্তলি দিয়া সাজানো ছাড়া আর কি উপায় থাকিতে পারে। বাস্তবের বিকল্প লীলা-পুত্তলি সৃষ্টি করিয়া কবি শেষজীবনে যে নূতন ভুবন গড়িয়াছেন —পূরবীতে তাহার প্রথম নিঃসংশয় পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা"

॥ ১ ॥

জীবনের শেষ দিকে লিখিত পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলীর ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ অভিহিত করিয়াছেন, কাব্যপর্যায়ে ইহাদের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন আর ইহাদের অন্তর্গত রচনাগুলি গদ্য কবিতা নামেই পরিচিত হইয়াছে।[১] ১৯৩৬ সালের পরে এক-আধটা ব্যতিক্রান্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া আর তিনি গদ্য কবিতা লেখেন নাই। মাঝখানে কয়েকটি বৎসর কেন গদ্য কবিতার ফসলে ভরিয়া উঠিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ইহার কারণ যে অনুসন্ধানযোগ্য সে বিষয়ে স্বয়ং কবি অবহিত, আর একাধিক প্রসঙ্গে তাহার আলোচনাও করিয়াছেন। এখন, তিনি ইহার প্রেরণার মূলকে যত দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছেন সেখানেই থামিব, না আরো দূর অতীতে যাইবার আবশ্যক হইবে ইহাই প্রথম আলোচ্য। এ প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

> একদা কোন একটি অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমনকি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোন চিহ্নই ছিল না। তবু যখন

১ পুনশ্চ (প্রকাশকাল) ১৯৩২
শেষ সপ্তক (প্রকাশকাল) ১৯৩৫
পত্রপুট (প্রকাশকাল) ১৯৩৬
শ্যামলী (প্রকাশকাল) ১৯৩৬

তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সেকথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়া ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম— ছন্দের রাজা তুমি, অছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত কর দেখি। সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধকরি সাহস হয় নি বলেই।

কাব্যে ভাষার একটা ওজন আছে সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যাপারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতর অতিমাধুর্য অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিত-পটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপরপক্ষে ভাল চলে এমন কোন তরুণীর চলনে ওজনরক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয় সংযত পদক্ষেপ।

আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতার রস তিনি তার সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে

বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল? এখন আমার প্রশ্ন এই আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে? গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যে সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্র বলতে পারি আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোন রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় মনে করি। কথা উঠতে পারে গদ্যকাব্য কী। আমি বলব, কি ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।[২]

গীতাঞ্জলি কাব্য ইংরাজিতে অনুবাদকালে বাংলা গদ্যকে কাব্যের পদবীদানের ইচ্ছা কবির মনে আসিয়াছিল—আর সেই ইচ্ছার প্রথম পরীক্ষা লিপিকার রচনাগুলিতে। কিন্তু এ পরীক্ষা প্রধানত ছন্দ ও ভাষার টেকনিক সংক্রান্ত। তাঁহার গদ্য কবিতায় মাঝে মাঝে যে অপ্রত্যাশিত নূতন রস পাই, ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে (মূল গীতাঞ্জলিতেও বটে) বা লিপিকার রচনাগুলিতে তাহার একান্ত অভাব। সে রসটা কি কবি অন্যত্র বিবৃত করিয়াছেন।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার

২ গদ্যকাব্য। সাহিত্যের স্বরূপ (২য় সংস্করণ)

হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য-নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতঃই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমশলা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিসটা একান্ত ভাবে ছন্দ অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক, পদ্যই হোক রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণ-বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে: কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতখানি দূরে ছিল, এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে ; কেন না গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।[৩]

সবশেষে কবি যে কথাটি বলিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহাই আসল কথা।

> কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে ; কেন না গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

অতি সুন্দর ব্যখ্যা। কিন্তু গীতাঞ্জলি বা লিপিকায় কোথায় এই প্রাত্যহিক সংসারের ধূলা-বালি! প্রাত্যহিক সংসার তো এসব কাব্যে কাব্যীভূত হয় নাই, বরঞ্চ অতীন্দ্রিয় জগৎটাই যেন প্রাত্যহিক সংসারের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। পথের ধূলাকে পারিজাতের ধূলা বলিয়া মনে হয় কই, বরঞ্চ পারিজাতের ধূলাই পথের ধূলা বলিয়া ভ্রম হয়। আর এ কাজ গীতাঞ্জলির গতানুগতিক ছন্দে ও লিপিকার গতানুগতিক গদ্যেই সম্ভব হইয়াছে। তাই আগে বলিয়াছি যে গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদে ও লিপিকার রচনার যেটুকু পরীক্ষা তাহা ছন্দ ও ভাষার টেকনিক সংক্রান্ত। গদ্য কবিতায় যে নূতন রস আদায় করিতে তিনি চান তাহার রূপ এ দুই পরীক্ষায় নাই। তাহার গুপ্ত প্রেরণা ও ইতিহাস জানিতে হইলে আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। চিত্রা কাব্যে প্রেমের অভিষেক নামে অতি প্রসিদ্ধ একটি কবিতা আছে। চিত্রা কাব্যে তাহার যে রূপ পাই তাহা মূল কবিতার একটি খণ্ডিত অংশ। সমগ্র কবিতাটি অখণ্ডরূপে সাধনা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

> তাতে কেরানি জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, [লোকেন্দ্রনাথ] পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলাম।

---

৩ কাব্য ও ছন্দ। সাহিত্যের স্বরূপ (২য় সং)

তার পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়-কর্তারা মন্তব্য করিতেছেন —"সেই সকল পরিত্যক্ত অংশ কবি বর্জনীয় বিচার করেন না।"[৪]

এখন, পালিত কেন যে ধিক্কার দিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই, তবে বর্জিত অংশ পাঠ করিলে খুব সম্ভব অনুমান করা যাইতে পারে। কবি দাবি করিয়াছেন যে "কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা।" কিন্তু বর্জিত অংশে কেরানি-জীবনের যে ছবি অঙ্কিত তাহাতে কেরানিটি কেরানি মাত্র থাকিয়াই কাব্য হইয়া ওঠে নাই, যে ছন্দে যে-সব অলঙ্কারে সে সজ্জিত হইয়াছে তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাহার ও পৌরাণিক প্রণয়ীদের মধ্যে ভেদ মুছিয়া গিয়াছে। এ-সব চিত্র উচ্চাঙ্গের কাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কবি যে দাবি করিয়াছেন সে জাতের কাব্য নয়। প্রাত্যহিক সংসার তাহার প্রাত্যহিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাব্য হইয়া উঠিবে—তাহা হইল কই? সাজা পোশাকেই মানুষের পরিচয়—কিন্তু এখানে কেরানির আর অর্জুন, পুরূরবা প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সকলেরই যে একই ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির সমান সাজা পোশাক। কেরানি-জীবন কাব্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই কিন্তু কাব্য হইয়া উঠিতে গিয়া সে যদি কার্তিকের রূপ ধারণ করে তবে তাহাকে আর কেরানি বলা চলে না। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে কাব্য এখন সমস্তকেই রসলোকে উত্তীর্ণ করিতে চায়, এমন কি স্বর্গারোহণ করিবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। সত্য কথা। কিন্তু মহাভারতের কুকুর সামান্য কুকুর-রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছে, দিব্য সাজসজ্জায় তাহার কুকুর-রূপ আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। ধর্মরাজ ইচ্ছা করিলেই ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, বা কার্তিকের চিত্রপক্ষ মনোরম ময়ূর বা সরস্বতীর ফেন-শুভ্র হংসরূপ ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিতে পারিতেন। এত সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দীন কুকুর-রূপ বাছিয়া লইয়াছেন

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, গ্রন্থপরিচয় ৪র্থ খণ্ড

—এখানেই মহাভারতের কবির দৃষ্টির সত্যতা। প্রেমের অভিষেকের কেরানি রাজরাজেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া কাব্যস্বর্গে প্রবেশ করিতে অনধিকার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই পালিত তাহাকে বর্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে তিনি অন্যায় করেন নাই। কেরানিকে কেরানি রাখিব তবু কাব্য করিয়া তুলিব, প্রত্যহকে প্রত্যহ রাখিব, তবু কাব্য করিয়া তুলিব, এ প্রেরণার মূল শুধু ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে বা লিপিকায় বা গদ্যকাব্যগুলিতে নয়—ইহার সুদীর্ঘ ইতিহাস চিত্রা কাব্যেও পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে এ সময়টা এ ভাবের অনুকূল ছিল না কবির জীবনে।[৫] কাব্যের সত্য কেবল প্রেরণার উপরে নির্ভর করে না, ছন্দ অলঙ্কার ভাষারীতি প্রভৃতির সহযোগে সত্য হইয়া ওঠে। এই সময় হইতেই কবি এ প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষ ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাষারীতির অভাবে, প্রেরণার সত্য কাব্যের সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। খুব সম্ভব আপন অগোচরে কবির কলম একটি বিশেষ রীতির প্রবাহ আবিষ্কার করার চেষ্টা করিতেছিল—যাহার সার্থকতা ঘটিয়াছে বহুকাল পরে গদ্য-কাব্যগুলিতে। অবশ্য সে সার্থকতাও সামগ্রিক নয়—আংশিক। আমি যতদূর বুঝি গদ্য কবিতা রচনার ইহাই মূলতম প্রেরণা।

এখন কাব্যকে যদি প্রাত্যহিক সংসারের খানিকটা দায়িত্ব বহন করিতে হয় তবে তাহার পোশাকপরিচ্ছদ ও চালচলনের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। পোশাকপরিচ্ছদ বলিতে অলঙ্কার আর চালচলন বলিতে ছন্দ। আর এ দুটির পরিবর্তন ঘটিলেই দেখা যাইবে যে কাব্যের অধিকার অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। অতিপ্রকট ছন্দযুক্ত কাব্যে যাহা বলা সম্ভব নয়, প্রচ্ছন্নছন্দ গদ্য কবিতায় তাহা

৫ চৈতালি কাব্যে ইহার কয়েকটি সার্থক দৃষ্টান্ত আছে।

সহজেই বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের দুই শ্রেণীর কাব্য হইতে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া বক্তব্যকে সমর্থন করা যাইতে পারে।

গদ্য কবিতা ও পদ্য কবিতার (পদে বদ্ধ অর্থে) মধ্যে ইহাই প্রধান পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের মতে। তাঁহার মতের বিস্তারিত আলোচনার আগে এবং তাঁহার কাব্যে এই মতের সার্থকতা বিচারের আগে—কবির প্রাসঙ্গিক মত সবিশদ জানা আবশ্যক।

কবি বলিতেছেন—

> আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙ্গা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু নীচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো। কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।
>
> রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল। তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমশলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে

পোশাকী শাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধঘোমটা টানা সাবধান চাল তার নয়।[৬]

এই সঙ্গে আরো একটু যোগ করা যাইতে পারে।

কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্য রচনা সহজ তাঁরা ওই খোলা দরজার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই।[৭]

কবির আরো একটি মন্তব্য উদ্ধার করি, তার পরে একসঙ্গে দুইটির আলোচনা করিলেই চলিবে। তিনি বলিতেছেন—

তর্ক এই চলেছে গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কিনা। এতদিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে এবং সে দেখার আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার উপরে একান্ত নির্ভর করে কিনা। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালা পুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্প সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি হয়নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোন আকস্মিক কারণে

৬ রবীন্দ্ররচনাবলী (পুনশ্চ) গ্রন্থপরিচয়, ১৬শ খণ্ড

৭ রবীন্দ্ররচনাবলী (পুনশ্চ) গ্রন্থপরিচয়, ১৬শ খণ্ড

নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।[৮]

কবি দাবি করিয়াছেন যে অতি প্রকট ছন্দোবন্ধনের অতি নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি লাভ করিলেই কাব্যের (গদ্য কাব্যের) শক্তি বাড়িয়া যায়, উদাহরণ দিয়াছেন জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনীর। উদাহরণটিকে কবির বিনয়ের উদাহরণরূপেই গ্রহণ করা উচিত, কেন না, মূল কাহিনী ও কবিরচিত ব্রাহ্মণ কবিতাটি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ব্রাহ্মণ কবিতাটি কোন অংশে মূলের চেয়ে হীন নয়।

এবারে কবির বক্তব্যের নির্গলিতরূপ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। পদ্যকে ছন্দ-বন্ধন মুক্ত করিয়া অলঙ্কারের ভার কমাইয়া দিলে "তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়।" কবির মতে তখন কাব্যের যে রূপ দাঁড়ায় তাহাই গদ্যকাব্য আর তাহা জাত্যংশে পুরুষ। এখন ইহা চির প্রসিদ্ধ যে কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যচর্চায় অনেক সময়েই অমিল দাঁড়ায়। যে কাব্যতত্ত্বই কবিরা প্রচার করুন না কেন কাব্যচর্চার বেলা বড় তার মর্যাদা রক্ষা করেন না—কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে কিনা দেখা যাইতে পারে। প্রথমে অলঙ্কার। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতায় অলঙ্কারের ভার কি তাঁহার পদ্য কবিতার চেয়ে হাল্কা? এমন কি সাদা গদ্যের চেয়েও? আমার তো মনে হয় না। কয়েক জোড়া উদাহরণ লওয়া যাক।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—

৮ গদ্যকাব্য—সাহিত্যের স্বরূপ (২য় সংস্করণ)

সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামলশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
"আমি আনন্দিত"।
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।[৯]

সমবিষয়ক আর একটি কবিতা—

আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক-সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্রদিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানী যত, আনন্দের রস
কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে।[১০]

পদ্যকবিতাটির তুলনায় গদ্যকবিতাটিতে যে অলঙ্কারের ভার হাল্কা এমন মনে করিবার কারণ নাই—সংখ্যা গণনাতে হয়তো বেশিই হইবে। কবির মতে গদ্য কবিতায় অলঙ্কারের ভার লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও যে হয় নাই—তাহার কারণ কাব্যজগতে এমন কথা থাকিতে পারে যাহার একমাত্র প্রকাশ ইঙ্গিতেই সম্ভব। অলঙ্কার সেই সব ইঙ্গিতের অন্যতম। ইহা অর্থাৎ অলঙ্কারের বাড়তি বা

৯ পৃথিবী—৩ সংখ্যক পত্রপুট

১০ বসুন্ধরা—সোনার তরী

ঘাটতি দোষও নয় গুণও নয়—কবির স্বভাবের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সেইসব কথাই বলিয়াছেন যাহার সম্যক প্রকাশ ইঙ্গিত ছাড়া সম্ভব নয়।

ভিন্ন রসের আর দুটি উদাহরণ লওয়া যাক।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর' করে ;
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানী।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত—
ওরই মতো কালোকোলো
নাকটা ওই রকম চ্যাপটা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্মি এই গয়লানী মাসির 'পরে,
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে ;
তার ভাঁড রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে—
'দেখি না কী হয়' তারই বিবিধ রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই।[১১]

সমরসের আর একটি দৃষ্টান্ত—

"প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উডাইয়া বেডাইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পডিয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই সব অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মতো এক প্রকার অবুঝ ভালোবাসা, কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, একটা না

১১ ছেলেটা—পুনশ্চ

দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত, শঙ্কিত, শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।[১২]

দুটি ক্ষেত্রেই অলঙ্কারের বোঝা স্বভাবের দাবীতেই হাল্কা, তবে এ রকম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য ও গদ্যকবিতায় খুব বেশি নাই। এমন গল্পও হইতে পারে, যেমন ক্ষুধিত পাষাণ, অলঙ্কার যেখানে ভূষণ নয় অঙ্গ।

আর দুটি সমরসের কবিতার আলোচনা করা যাইতে পারে। বিখ্যাত বন্দীবীর কবিতা ও ঐ বিষয়ক শেষ সপ্তক কাব্যের একটি কবিতা।[১৩] এখন এ দুটি রচনার মধ্যে কাহারো যদি গদ্যকবিতাটি উচ্চতর পর্যায়ের মনে হয় তাহার কারণ অতিপ্রকট ছন্দের বা অলঙ্কার-প্রাচুর্যের অভাব নয়। অতিপ্রকট ছন্দের অভাব শেষোক্ত কবিতার যে Vacuum বা শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে, বাস্তব মালমশলায় তাহা ঠাসিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভাণ্ডারে না রইলো গম, না রইলো যব,
না রইলো জোয়ারি,
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্যক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো করে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

এমন কাঁচা বাস্তব রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন—কবিতাটিকে উচ্চতর পর্যায়ের মনে করিবার ইহাই আসল কারণ। স্বল্পায়ত দ্রুতপদসঞ্চারী কবিতাটি যেন অশ্বারোহী বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, প্রথম সংঘর্ষেই পাঠকের রুচিকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়।

---

১২ ছুটি, গল্পগুচ্ছ

১৩ তেত্রিশ সংখ্যক কবিতা, শেষ সপ্তক

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার অলঙ্কারের ভার পদ্য কবিতা বা গদ্যের চেয়ে লঘু নয়। তবে স্বীকার করিতেই হয় যে বিষয়ের ও রীতির দাবীতে অলঙ্কারের চেহারার অনেক বদল হইয়াছে। ইহার ছন্দ ও ভাষারীতির মতো ইহার অলঙ্কারেরও ভিন্ন জাত। বিবাহের অলঙ্কার আর রণক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রের অলঙ্কার ভিন্ন ধরনের হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক।

॥ ৩ ॥

গদ্যচ্ছন্দ ও পদ্যচ্ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশদ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে পদ্যচ্ছন্দ যেন নাচের চাল আর গদ্যচ্ছন্দ স্বাভাবিক চলন। নাচের চালের জন্য আড়ম্বর চাই, পোশাক চাই, বাজনা চাই, আলো চাই আর স্বাভাবিক চলনে একখানি গ'ড়ে শাড়ীই যথেষ্ট। এই ভাবটিকে আবার তিনি উপমান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দুটি অংশই উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

> নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য; তাতে নাচের তাল নাই লাগলো। তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে। সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমশলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোওয়া বাঁচিয়ে পোশাকী শাড়ীর প্রান্ত তুলে ধরা আধ ঘোমটাটানা সাবধান চাল তার নয়![১৪]

---

১৪ রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬শ খণ্ড—(পুনশ্চ) গ্রন্থপরিচয়

আবার বলিতেছেন—

নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই শানাই বাজনা, সেই মন্ত্রপড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণতঃ যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন অনির্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার, সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল কিন্তু বিবাহটা তো রইলো, যদি না কোন মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক। সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইলো, আবার কোন অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতি দিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে। এমন কি বাম দিক থেকে রুনঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপরে বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগলো।[১৫]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যতদূর বুঝি তাহা এই যে পদ্যচ্ছন্দ নাচের ছন্দের মতো একটি বিশেষ ব্যাপার আর গদ্যচ্ছন্দ পদক্ষেপের মতো স্বাভাবিক। দুয়ে প্রভেদটা ঐখানে। আনুষ্ঠানিক রীতি থেকে মুক্ত বলেই গদ্যচ্ছন্দে "সংসার যাত্রার বৈচিত্র্য সহজরূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে" থাকে। পদ্যচ্ছন্দের চেয়ে গদ্যচ্ছন্দের স্বাধীনতা প্রকাশক্ষমতা ও গতিবিধির আসর অনেক বিস্তৃততর।

---

১৫ কাব্যে গদ্যরীতি, সাহিত্যের স্বরূপ (২য় সং)

একথা সকলে মানিবেন মনে হয় না, কবির আগের আমলের রচনা হইতে মন্তব্য উদ্ধার করিয়াও ইহার প্রতিবাদ করা অসম্ভব নয়। কবি বলিয়াছেন পদ্যচ্ছন্দের "সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে।" অর্থাৎ তিনি ছন্দের স্বাভাবিক পদক্ষেপ চান, সপ্তপদী চতুর্দশপদী পদক্ষেপ চান না। উত্তম। নাচ যতই মনোহর হোক চব্বিশ ঘণ্টা নাচাও যায় না, নাচ দেখাও কঠিন। পদক্ষেপ নিত্যকার, নৃত্য নৈমিত্তিক মাত্র। কিন্তু ছন্দের মধ্যেই কি এমন ছন্দ নাই যাহা পদক্ষেপ জাতের—যেমন পয়ার। আমি তো মনে করি পয়ার শব্দটা পদচার শব্দের অপভ্রংশ—অর্থাৎ উহা ছন্দ সরস্বতীর স্বাভাবিক চলন বা পদক্ষেপ। আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দও ছন্দের পদক্ষেপ ছাড়া আর কি—যদিচ এখানে তালটা নানা বিচিত্রতায় পূর্ণ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ "সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজরূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা নিতে" না পারিয়া থাকিলে তাহা কবির ত্রুটি, ছন্দের ত্রুটি নয়। শেক্সপীয়র ঐ ছন্দে স্থূল সূক্ষ্ম বিচিত্র কোন্ কথাটা না বলিয়াছেন? বায়রন ডনজুয়ান কাব্যের ছন্দে সংসারের স্থূল সূক্ষ্ম বিচিত্র কোন্ কথাটা না বলিয়াছেন? রামায়ণ মহাভারতের সরল অনুষ্টুপ ছন্দে স্থূল সূক্ষ্ম বিচিত্র কোন কথাটা না বলা হইয়াছে? কিন্তু অন্য ছন্দ দূরে যাক এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বশক্তিমত্তার উপরেও কবির ভরসা নাই। তিনি বলিতেছেন—

> —বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক রচনা। সুমিত্রা নামই ঠিক করেছি। ...ইচ্ছা প্রকাশ করছেন যেন আমি নেড়া ছন্দে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম, গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের; কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর, কান্তার ইত্যাদি। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন। গদ্য ক্রমে ক্রমে

জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা, অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়।[১৬]

কিন্তু এই মাত্র যে গদ্যকে তিনি সর্বশক্তিমান মনে করিলেন, পরমুহূর্তেই তাহাকে অস্বীকার করিয়া গদ্যছন্দে আশ্রয় গ্রহণের হেতু পুরা বুঝিতে পারা যায় না। এখানে দুটি রচনার গদ্যরূপ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। গদ্যছন্দ রূপের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের পড়িলে গদ্যকে লঙ্ঘন করিয়া কবির গদ্যছন্দে আশ্রয় গ্রহণ আরও ব্যাখ্যাতীত হইয়া উঠে।

"ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায়—খোলা জানালার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে তারি পাতাগুলো কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে। রোদ্দুর এসে পড়ছে দুপুর বেলা, নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে, কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল, পলাশ, মাদারে চলছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়, অশথগাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করছে—আমার জানালার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা। নদীতে নেবেছে একটা ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি একপাশে একটি চাঁপা গাছ। একটার বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মাঝে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটি মাত্র আছে আরাম-কেদারা, মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বাসন্তী রংএর, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসবো, আর খাবার সময় হলে নীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা, যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাবো। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়,

১৬ পুনশ্চ—গ্রন্থপরিচয়

অবকাশকালে সাহিত্য আলোচনা করে এবং ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে, নাম দিতে পারবো জোড়াসাঁকো—সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই, বেলা, রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসবে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্ছে আমার পাটলরঙের গাইগরু তার বাছুর নিয়ে। শাকসবজীর খেত আছে, বিঘে দুইএর জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়া-দাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন, দই, ছানা, ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট—রান্নাঘর নেই।[১৭]

প্ল্যাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে, আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে। তার মাঝখানে ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই। হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরো দূরে উত্তরের মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিমগাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন; আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে। আমার আবার দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে—উদয়নের দোতলায় বসবার ঘরের পশ্চিম পাশে যে নাবার ঘর ছিল, প্রমোশন হয়ে সেটাই হয়েছে বসবার ঘর, তার পাশের ছাতটুকুতে নাবার ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মস্ত একটা টেবিল পেতে বসেছি—পিছনে দক্ষিণদিকের আকাশ, সামনে উত্তর দিকের। আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি এই দুদিকের খোলা জানালা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছি, কেন এমন দিনে বহু আগেকার দিনের একটা আভাস চিত্ত-আকাশের দিকপ্রান্তে অদৃশ্য কোন রাখালের মতো মূলতানে বাঁশি বাজায়। অর্থাৎ এরকম দিন যেন বর্তমানের কোন দায়কে স্বীকার করে না, এর কাছে জরুরী কিছুই নেই—যে সব দিন একেবারে চলে গেছে এ তারই মতো বর্তমান-ভবিষ্যতের বাঁধনছেঁড়া উদাসী, কারও

১৭ রবীন্দ্ররচনাবলী ষোড়শ খণ্ড। পুনশ্চ—গ্রন্থপরিচয়। তুলনীয় পুনশ্চ কাব্যের বাসা।

কাছে কোন জবাবদিহির ধার ধারে না। কিন্তু এই অতীত বস্তুত কোন দিনই ছিল না—যা ছিল তা বর্তমান, তার প্রত্যেক মুহূর্ত বোঝা পিঠে স্মার বেঁধে চলছিল, তার হিসেব দিতে হয়েছে। 'গতকাল' বলে যে অতীত সে আজই আছে, গতকাল সে ছিলই না। স্বপ্নরূপিণী সে, বর্তমানের বাঁপাশে বসে আছে—মধুর হয়ে উঠতে তার কোনো খরচ নেই। সেই জন্যেই বর্তমানকালের মধ্যে যখন কোন একটা দিনের বিশুদ্ধ সুন্দর চেহারা দেখি তখন বলি সে অতীত কালের সাজ পরে এসেছে—প্রেয়সীকে বলি 'তুমি যেন আমার জন্মান্তরের জানা।' অর্থাৎ, এমনকালের জানা যে কাল সকল কালের অতীত, যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ, যে কাল অনায়ত্ত। আজকের এই যে সোনায়-পান্নায়-ছায়ায়-আলোয় বিজড়িত সুগভীর অবকাশের মধুতে ভরা মধ্যাহ্নটি সুদূরবিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে, এর অনুভূতির মধ্যে একটা বেদনা এই আছে যে, একে পাওয়া যায় না, ছোঁওয়া যায় না, সংগ্রহ করা যায় না, অর্থাৎ এ আছে তবুও নেই। সেই জন্যেই একে দূর অতীতের ভূমিকার মধ্যে দেখি। সেই অতীতের যা মাধুরী তা বিশুদ্ধ, সেই অতীতে যা হারিয়েছে বলে নিশ্বাস ফেলি তার সঙ্গে অমন আরো অনেক হারিয়েছে যা সুন্দর নয়, সুখকর নয়—কিন্তু সেগুলি অতীত নয়, তা বিনষ্ট। যা সুন্দর যা সুখের, তাই চির অতীত। তা কোনদিন মরে না, অথচ তার মধ্যে অস্তিত্বের কোন ভার নেই। আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই, এই মধ্যাহ্নের উপর বিশ্বভারতীর কোন দাবী নেই। এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।[১৮]

কিন্তু এই ছন্দোমুক্তি কাজটা সহজে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের রক্তের মধ্যে ছন্দের বৈদ্যুত। তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া বাক্যের ছন্দোমুক্তি ঘটানো তাঁহার পক্ষে আয়াসসাধ্য ব্যাপার। গদ্য কবিতায় সেই আয়াসের ভাব, ওদেশে যাহাকে Tour de force বলে। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার চরিত্রের প্রকাশ। কিন্তু ওরই মধ্যে যখনই

১৮ পুনশ্চ, গ্রন্থপরিচয়। তুলনীয় পুনশ্চ কাব্যের 'সুন্দর'।

তিনি একটু অসতর্ক হইয়াছেন তখনি ছন্দ-রচনাপ্রবণ কলম লিখিয়া ফেলিয়াছে—

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
... ...
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।

একই ছত্রের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি কাব্যের একটি বিশেষ ঢঙ, গদ্যের নয়। কবি যখন বাসা কবিতাটিতে[১৯] বারে বারে "ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে" ছত্রটিকে জাদুকরের দণ্ডের মতো পাঠকের মনের উপরে বুলাইতে থাকেন, তখন তিনি নিজের অগোচরে কাব্যের ছাঁচকেই অনুসরণ করিতেছেন।[২০] গদ্যকবিতার ছন্দোমুক্তি সম্বন্ধে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে যেখানে বাক্য ছন্দোমুক্ত সেখানে কবির সগোচর মন, আর যেখানে ছন্দ আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে তাঁহার অগোচর মন। সগোচর মন ও অগোচর মনের এই লুকোচুরি বিশেষ কৌতূহলজনক। কাব্যতত্ত্বের খাতিরে কবি বারে বারে ছন্দলঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইলেও ছন্দোলক্ষ্মী অনবধানতার সুযোগে বারে বারে কাব্যের মধ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। তাই বলিয়াছিলাম যে ছন্দোমুক্তি কাজটা সহজে ঘটে নাই। সগোচর ও অগোচর মনের দ্বন্দ্বের মধ্যে কবি অনেক সময়েই মনঃস্থির করিতে পারেন নাই, কোন্ পক্ষকে তিনি অবলম্বন করিবেন। উদাহরণ যোগে বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। বিখ্যাত আফ্রিকা কবিতা।[২১] এই কবিতার তিনটি ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। প্রথমটি পত্রপুট কাব্যের অন্তর্গত।

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে

১৯ পুনশ্চ

২০ এই ছত্রটির ছয় বার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

২১ ষোল সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট

নতুন সৃষ্টিকে বার বার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন-মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী-ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।[২২]

এবারে অন্য একটি পাঠ—

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল তার নূতন সৃষ্টিরে
সেই দিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী-ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।[২৩]

এবারে তৃতীয় পাঠ—

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচী-ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা,
রেখে দিল নির্বাসনে মহা অরণ্যের অন্ধকারে।[২৪]

২২ ২৮ মাঘ, ১৩৪৩

২৩ আশ্বিন, ১৩৪৪,

২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫১ঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অনেক রচনার মতোই আফ্রিকা কবিতাটি প্রচার-ধর্মাশ্রিত কাব্য। আফ্রিকার সঙ্গে এ দেশের কবির মনের যোগাযোগ এত গভীর নয় যে তাহার প্রেরণা কাব্যের উৎসমূলে পৌছিবে। আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগাযোগ। তাহার প্রেরণায় গবেষণা করা যায়, কিম্বা প্রচার-ধর্মাশ্রিত কাব্য

এখন এই পাঠ তিনটির মধ্যে রুচিভেদে লোকে কাব্যোৎকর্ষের তর তম নির্ধারণ করিবেন। সে স্বাধীনতা পাঠকের আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রথমে গদ্যছন্দে লিখিয়া কবি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই, তাই পর পর দুইবার বিষয়টিকে অন্ত্যানুপ্রাসহীন কবিতায় ঢালাই করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয় মনের অস্থিরতাজ্ঞাপক।

পদ্য ও গদ্যচ্ছন্দে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আরো মিলিবে—একটি উদাহরণ দিতেছি।

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তিনিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে।[২৫]

এবারে সরাসরি পদ্য—

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি...[২৬]

রবীন্দ্রনাথ গদ্যচ্ছন্দের অনুকূলে দাবি করিয়াছেন যে ইহাকে

লেখা যায়। এখানে শেষোক্ত ব্যাপারটা ঘটিয়াছে। আর প্রচারকের দৃষ্টি সর্বদর্শী নয় বলিয়াই কবিতাটি রচনা কালে তাঁহার মনে পড়ে নাই যে যাঁহাকে তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন সেই গান্ধীর নিশ্চিত অভ্যুদয় আফ্রিকায় ঘটিয়াছিল।

২৫ চৌত্রিশ সংখ্যক কবিতা, শেষ সপ্তক

২৬ ষোল সংখ্যক কবিতা, প্রান্তিক

অলঙ্কারের ভার হইতে মুক্ত করিতে হইবে আর ইহাকে অতি প্রত্যক্ষ ছন্দের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহার নির্গলিত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, গদ্যচ্ছন্দে অলঙ্কারের ভার কমে নাই, বরঞ্চ অতি প্রত্যক্ষ ছন্দের অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে অধিকতর অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ছন্দোমুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কবি যেন ধনুকে জ্যা আরোপের ন্যায় জোর করিয়া নিজের রুচি ও প্রবণতার বিরুদ্ধে চাপ দিয়া গদ্যচ্ছন্দ রচনা করিয়াছেন। তাই ইহাতে মাঝে মাঝে যে ধ্বনি ওঠে তাহা ঋষির ওঙ্কার বা কবির ঝঙ্কার নয়—নিতান্তই প্রচারকের ধনুক টঙ্কার। গদ্যচ্ছন্দ রবীন্দ্রপ্রতিভার পালোয়ানী প্যাঁচ, তাহার স্বাভাবিক বিবর্তন নয়।[২৭] গদ্যচ্ছন্দের অনুকূলে তাঁহার তৃতীয় দাবি গদ্যকে কাব্য হইতে হইবে। এখানে দ্বিমত হইবার আশঙ্কা নাই। রবীন্দ্র-লেখনীর তুচ্ছতম ছত্রটিও কাব্যরসে আপ্লুত, কাজেই গদ্যকাব্য যে কাব্যরসাশ্রিত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

কবি বলিতেছেন—

> প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটা স্বচ্ছতা আছে তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যচ্ছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য। প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর, তাহলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোপার বাড়ির

২৭ মাঝখানের ঐ কয়টি বৎসর ও চারখানি কাব্য ছাড়া আর তিনি ব্যতিক্রম বাদে গদ্যচ্ছন্দ-প্রবাহকে অনুসরণ করেন নাই। আবার গদ্যচ্ছন্দ রচনা কালেও সমান্তরাল ধারায় তাঁহার পদ্যচ্ছন্দ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

> কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি, সর্দি, জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সেটা সঙ্গীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সঙ্গীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। এই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সঙ্গীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।
>
> আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেব-সাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন।[২৮]

এবারে আবার গোড়াকার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। গদ্যচ্ছন্দ সৃষ্টির যথার্থ প্রেরণা কোথায়? কবি বলেন—

> কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার উপরে একান্ত নির্ভর করে কিনা। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলঙ্করণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে।

এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ স্খলিত অলঙ্কার নয়, আর তাহার মজ্জার মধ্যে ছন্দসরস্বতী প্রবাহিত, কবি নিজেও ছন্দোবর্জন সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই।

তার পরে তিনি বলিতেছেন—

> বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যচ্ছন্দের মধ্যে আছে।

২৮ কাব্যে গদ্যরীতি। সাহিত্যের স্বরূপ (২য় সংস্করণ)

ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবগুচ্ছের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

এটি আলোচনাযোগ্য উক্তি। বৃহতের ভার বহন করিবার শক্তি গদ্যচ্ছন্দের থাকিতে পারে কিন্তু এখনো তাহা প্রমাণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ছন্দোবদ্ধ পদ্য যে বৃহতের ভার বহনে সক্ষম তাহার ভূরি ভূরি প্রাচীন ও অর্বাচীন দৃষ্টান্ত আছে। রামায়ণ-মহাভারতের ছন্দের মতো বহু ভারবাহী ছন্দ আর কোথায়? ও যেন বাসুকির ফণায় পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য বিধৃত, সেটা একটা পৃথিবী না হইতে পারে তবে একটা যে মহাদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের মুক্তপয়ারের ভারবহন ক্ষমতাও অসীম, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যের অধিকাংশই এই ছন্দের আধারে রক্ষিত। কাজেই বৃহতের ভার বহন করিবার ক্ষমতা গদ্যচ্ছন্দের আছে, এই অপ্রমাণিত উক্তি নিরর্থক। গত একশ বছরের মধ্যে বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণশক্তির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কাব্য নাটক কাহিনী নানাশ্রেণীর রচনা লিখিত হইয়াছে, বহু কবি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে, এমন কি অকবির কলমের খোঁচাও ইহাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে নাই। সদ্যোজাত গদ্যচ্ছন্দ সম্বন্ধে এমন কথা বলিবার সময় এখনো আসে নাই—কবির অপ্রমাণিত উক্তিকে নিরর্থক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। আমি যতদূর বুঝি বহুভারক্ষম ছন্দ আবিষ্কারের চেষ্টাতে কিংবা কাব্যের আসর বিস্তৃততর করিবার ইচ্ছাতে গদ্যচ্ছন্দের মূল প্রেরণা নয়। মূল প্রেরণা অন্যত্র—আর তাহা কবি কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

সর্বশেষে এই একটি কথা বলবার আছেঃ কাব্য প্রাত্যহিক সংসার অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটি ছাড়ে না।

এই সর্বশেষ কথাটিই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কথা। মহাভারতকার যে ছন্দে বীরপুরুষগণের, মহাপুরুষগণের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন সেই ছন্দেই স্বর্গারোহণ-কামী কুকুরটির কাহিনী বলিয়াছেন—অন্যছন্দের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বেলাতে গদ্যচ্ছন্দের প্রয়োজন হইয়াছে "সেই নেড়ি কুত্তাটা"র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে। প্রেমের অভিষেক কবিতার কেরানি বর্ণাঢ্য অলঙ্করণের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহাকে সত্য করিয়া তুলিয়া হরিপদ কেরানি রূপে প্রকাশ করিতে প্রয়োজন হইয়াছে গদ্যচ্ছন্দের। গদ্যচ্ছন্দের মধ্যস্থতায় কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে নিঃসন্দেহ।[২৯]

গদ্যচ্ছন্দ আর কিছুই নয়, যুগচ্ছন্দ আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা। প্রত্যেক যুগ একটি বিশেষ ছন্দের অপেক্ষা রাখে। বহু বিধি নিষেধ আচার ও সংস্কারে জড়িত বাঙালী সমাজের প্রাণের কথাটি যতি ও মাত্রায় দৃঢ়পিনদ্ধ পয়ার ছন্দে বেশ প্রকাশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তারপরে এক সময় মহাপ্রভু আসিয়া তাঁহার দিব্যচরণের উত্তাল ছন্দ বাঙালী সমাজে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। তখন আর পয়ার ছন্দে কুলাইল না, ডাক পড়িল লিরিক ছন্দে। পদচারের স্থানে দেখা দিল নৃত্যচার। এমন করিয়া বহু দিন গেল, সে উন্মাদনা মন্দ হইয়া আসিল, দেখা দিল ভারতচন্দ্রের শাণিত অসিতুল্য মার্জিত পয়ার। তাঁহার কাব্য বৈষ্ণব প্রেরণার আমূল প্রতিবাদ। রাধা-কৃষ্ণের গোপন প্রেমের মর্মান্তিক প্যারডি বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়লীলা। তারপর আসিল ইংরাজি ও ইংরাজি শিক্ষার যুগ। কত কালের বাধাবাঁধন বিধিনিষেধ কোটালের বানে ভাসিয়া গেল,

২৯ লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকে কবি যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহারও এই গুণটি আছে। কাব্য ও অপরিমার্জিত বাস্তব এক কটাহে পাক হইয়া দিব্য রসায়নে পরিণত হইয়াছে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের আর কোন একটি রচনায় এতগুলি সুভাষিত নাই। ইহাও আমাদের উক্তির পরিপোষক।

ছিঁড়িয়া গেল পয়ার পায়ের বেড়ী। সেই উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত উল্লসিত যুগ অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে ভাষা পাইল, তারপরে গেল আরো বহুদিন। প্রথম উন্মাদনা স্তিমিত হইয়া আসিল। রবীন্দ্রপ্রতিভার চরিত্রগত লিরিক গুণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের পায়ে অন্ত্যানুপ্রাসের নূপুর পরাইয়া দিল। মধুসূদন খসাইয়া ছিলেন পায়ের বেড়ী, রবীন্দ্রনাথ যোগ করিয়া দিলেন নূপুরের ভার। ইতিমধ্যে সমাজ অনেকটা ভারসাম্য লাভ করিয়াছে। এই অতি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিই যুগচ্ছন্দ আবিষ্কারের চেষ্টা। আবার যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। এমনতর গুরুতর পরিবর্তন আর একবার মাত্র মানবসমাজে আসিয়াছিল; যাযাবর মানুষ যখন প্রাচীন পৌরাণিক যুগে কৃষিজীবী মানুষ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। এবারে কৃষিজীবী হইয়া উঠিতেছে যন্ত্রজীবী। পরিবর্তন অতিশয় গুরুতর। এ যেন সমস্ত মানবসমাজটা উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। গুরুশিষ্য দ্বিজ চণ্ডাল শুচি অস্পৃশ্য একত্র জড়াজড়ি। বিচিত্র ইহার অপ্রত্যাশিত বিন্যাস। পারিজাতের শাখা ও দাঁতন কাঠি, উর্বশী ও উদরী, ব্রহ্ম ও পাতিলেবু, বিষ্ণু ও বোনাস পাশাপাশি শায়িত; ধর্মনীতি, বিবেক, মিথ্যা, চুরি ও কালোবাজারী এমন মিশিয়া গিয়াছে যে নিতান্ত সদিচ্ছাবানেরও নির্বাচনে ভুল হওয়া স্বাভাবিক; এই বিচিত্র জীবন প্রবাহে হরিপদ কেরানির ছেঁড়া ছাতা ও আকবর বাদশার রাজছত্র পাশাপাশি ভাসিয়া যায়, আর কবির কলম নক্ষত্রসন্ধান ছাড়িয়া কোলাব্যাঙ ও নেড়ি কুত্তাটার সংবাদ না লইলে স্বস্তি পায় না। বিচিত্র এই যুগ। এত সমস্ত ধ্যানধারণা ঐতিহ্য ও মূল্য পুটপাকে তপ্ত হইতেছে। এ যুগের বাণীবহ ছন্দ কি, কোথায়? সমস্ত দেশের কবিমনীষীরা যুগচ্ছন্দ সন্ধানে নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই যুগচ্ছন্দ আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা সেই যুগচ্ছন্দের নূতন মহাদেশ নয়, তাহারই প্রথম সোপান স্বরূপ "ওয়েস্ট ইণ্ডিজ" মাত্র।

এ বিষয়ে কিছুকাল আগে যাহা লিখিয়াছিলাম এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নীচে পৃথিবী—উপরে স্বর্গ, মাঝখানে আকাশমণ্ডল বা অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষ স্বর্গ ও মর্ত্যের 'নোম্যান্সল্যাণ্ড।' এখানে স্বর্গের বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং পৃথিবীর ধূলিকণা ও জলের শীকর মিলিত হইয়াছে। এখানে স্বর্গের হাত ও পৃথিবীর হাত মিলিত হইয়া নিরন্তর করমর্দন চলিতেছে। অন্তরীক্ষমণ্ডল স্বর্গও নয়, মর্ত্যও নয়—কিন্তু তবুও যেন উভয়েরই। এই জগতের অধিবাসী ত্রিশঙ্কুরাজ—সে স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যে অক্ষয় 'হাইফেনে'র মতো বিরাজমান—নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সে স্বর্গ-মর্ত্যকে নিত্য সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মর্ত্যকে যদি বলা যায় গদ্য আর স্বর্গকে যদি বলা যায় পদ্য—তবে এই অন্তরীক্ষমণ্ডল হইতেছে গদ্য কবিতার জগৎ—আর রাজা ত্রিশঙ্কু গদ্য কবিতার জগতের আদিমতম অধিবাসী।

স্বর্গ অনাদ্যন্ত কাল হইতে আছে, পৃথিবীও বহুকালের, স্বর্গ স্বস্মৃষ্ট, পৃথিবী কালের গতিকে সৃষ্ট হইয়াছে। পদ্য সৃষ্টিপূর্বকাল হইতেই আছে; বেদ অপৌরুষেয়—সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যই এক হিসাবে অপৌরুষেয়। গদ্য যে শুধু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের তাহা নয়, তাহা মানবের সৃষ্টি, এবং মানবের প্রধান অবলম্বন। তবে গদ্য কবিতার জগৎ কি? তাহার প্রকৃতি কি? অন্তরীক্ষমণ্ডল অপেক্ষাকৃত হালের সৃষ্টি, তাহার নিঃসপত্ন অধিবাসী ত্রিশঙ্কু তো পৌরাণিক আমলের ব্যক্তি।

গদ্য কবিতা হালের সৃষ্টি। হোমার পদ্য লিখিয়াছেন—গদ্য লিখিবার কল্পনাও মহাকাল্পনিক কবিগুরুর মাথায় ছিল না। দান্তে গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখিয়াছেন। গ্যয়টে গদ্য ও পদ্য দুইই লিখিয়াছেন—কিন্তু গদ্যের পরিমাণই যেন অধিক। তাঁহাকে গদ্য কবিতা লিখিবার প্রস্তাব করিলে কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন না, একবার অন্তত ভাবিয়া দেখিতেন। গ্যয়টে আধুনিক মানুষ ছিলেন।

হোমারের কাব্য-স্বর্গের অধিবাসী কে? চিরপ্রফুল্ল কৌতুকময় অমরবৃন্দ। তাঁহার কাব্যে অবশ্য মানুষও আছে—কিন্তু আমাদের মতো দিনমজুর-খাটা মানবকের চেয়ে দেবতাদের সঙ্গেই যেন তাহাদের অধিকতর ঐক্য। সুরানীল সিন্ধুর উপকূলে তাহাদের বাস; স্বর্গপাত্রে অগ্নিবর্ণ মদিরা তাহাদের পানীয়; গুরুভার লৌহচক্র অনায়াসে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের ক্রীড়া; কমল-উন্মীল উষাকালে রাজকুমারী নীল সমুদ্রের কূলে বসিয়া বস্ত্র ধৌত করিলেও তাহাকে মানবী বলিয়া মনে হয় না; হোমারের উদার হাসি স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায় সমস্ত কাব্যখানিকে প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা কি মানব? ইহারা দেবতা-ই। আবার দান্তের De Monarchia-র গদ্যজগৎ অবশ্যই মানবের দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে আধুনিক মানুবের মূলগত একটা পার্থক্য আছে। দান্তের মানুষ লক্ষ্য-সচেতন—যদিচ সে লক্ষ্য মধ্যযুগের মঠ-মন্দিরের অভিমুখী। তাহার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ হইতে পারে—কিন্তু তবুও তাহার অস্তিত্ব আছে। আধুনিকের মতো সে বিভ্রান্ত নয়।

গ্যয়টে গদ্য কবিতা লিখিলে লিখিতে পারিতেন বলিয়াছি। তাঁহার ফাউস্ট প্রথম আধুনিক মানব; সে মহাশক্তিমান কিন্তু মহাবিভ্রান্ত; যদিচ সে পদ্য জগতে বিরাজ করিতেছে কিন্তু তাহাকে গদ্য কবিতার জগতে বেমানান হইত না। তাহার অন্তরের সংশয়-কুয়াসার উপাদানেই যে গদ্য কবিতার জগৎ প্রস্তুত। আগেই বলিয়াছি, অন্তরীক্ষমণ্ডল গদ্য কবিতার জগৎ; ইহার অধিবাসী ত্রিশঙ্কু; আধুনিক মানব গদ্য কবিতার জগতের অধিবাসী; আমরা সকলেই ত্রিশঙ্কু—ত্রিশঙ্কু আর একটিমাত্র নয়—দুইশত কোটি ত্রিশঙ্কু অর্ধ বিশ্বাসের সংশয়-কুয়াসা-বিজড়িত অন্তরীক্ষে পরস্পরের নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দোদুল্যমান। তাহারা না স্বর্গের, না মর্ত্যের; পায়ের তলায় তাহাদের কঠিন মৃত্তিকাও নাই, আবার স্বর্গের অমৃতপাত্রও তাহাদের করায়ত্ত হইল না—তাহারা মর্ত্যের কৃপার পাত্র আর স্বর্গের

কৌতুক। গদ্য কবিতার জগৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পদ্য কাব্য-স্রষ্টার রচনাতেই প্রসঙ্গান্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্নমতন
নভস্তল— * * *
স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী। (নরকবাস)

আধুনিক জগতের আমরা এখান হইতে কি দেখিতেছি?

নিত্য নন্দন আলোক
দূর হতে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে।

হোমারের কাব্যের অধিবাসীদের দেখিয়া, কালিদাসের কাব্যের অধিবাসীদের দেখিয়া—ঠিক এই ভাবটিই কি আমাদের মনে জাগ্রত হয় না? 'সুরা-নীল' সিন্ধুতীরের মানবদের স্বর্ণপাত্রে মদিরাপান কি আমাদের মনে অসূয়া জাগাইয়া দেয় না? আধুনিকী শকুন্তলাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কাঁটায় আঁচলখানা বাধিয়া যাইবার সুযোগ পর্যন্ত নাই, পথ যে পীচ দিয়া বাঁধানো; বাগানের কাঁটা মালির সতর্ক হস্তে উৎপাটিত। রাজচিত্রশালে চতুরিকার কৌশলে আবদ্ধ হইবার অবসর কোথায়? সেখানে যে টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়। একালের দুষ্যন্তগণ 'আনাকরথবর্ত্মণ' নয়—বিরহের প্রচণ্ডতম ধাক্কাও তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বিলাতি হোটেলের চেয়ে দূরতর স্থানে লইয়া যাইতে অক্ষম। তাই আমরা হোমার-কালিদাসের জগতের দিকে 'ঈর্ষা-জর্জরিত নেত্রে' তাকাইয়া থাকি আর মনের ক্ষোভে বলি ওসব 'রিয়াল' নয় ওসব 'এস্কেপিজম্'; যেন একমাত্র আমরাই সত্যের

সংবাদ অবগত। বাস্তব ঘাড়ের উপরে বাঘের মতো আসিয়া পড়িয়াছে কাজেই এখন লড়াইয়ের ভান না করিয়া আর উপায় কি?

আর গদ্য কবিতার জগৎ হইতে মর্ত্যের গদ্যলোকের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—

নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্তপারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

মর্ত্যের প্রাত্যহিক জগতের সংবাদ আছে ছড়ায়, পাঁচালিতে, লোকসঙ্গীতে, লোকসাহিত্যে, ময়মনসিংহ-গীতিকায়—আধুনিকগণ যাহাকে বলে গণ-সাহিত্য। এই মর্ত্যজীবন হইতেও আমরা নির্বাসিত, তাই গণ-সাহিত্যের কোন প্রতিনিধিকে দেখিলেই আমাদের মন প্রবাসীর ব্যাকুলতায় বলিয়া ওঠে—

ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ—ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহু দিন-রজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।"

কালিদাসের কাব্যজগৎ হইতে যেমন আমরা নির্বাসিত, ময়মনসিংহ-গীতিকার লোকসঙ্গীতের রাজ্য হইতেও আমরা তেমনি নির্বাসিত। আমাদের কাছে দুই-ই সমান 'আনরিয়াল'—লোকসঙ্গীতের প্রতি আসক্তি এস্কেপিজ্‌ম্‌-এর এক নূতন প্রকারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কালিদাসের কাব্যের প্রতি আসক্তি

যদি সূক্ষ্ম বিলাস হয়—গণসাহিত্যের আসক্তি স্থূল বিলাস ছাড়া আর কি ? কারণ আমরা এই দুই জগৎ হইতেই সমানভাবে বিচ্ছিন্ন !

আমরা যে জগতের অধিবাসী তাহার নাম বায়ুমণ্ডল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, অর্ধ বিশ্বাস, খণ্ড-দৃষ্টি এবং নাস্তিক্যের উপাদানে ইহা রচিত। নাস্তিকতার এই জগতের যথার্থ নকীব গদ্য কবিতা। পদ্যের অসংশয় ছন্দ এবং গদ্যের নিশ্চিত প্রাঞ্জলতা, পদ্যের ঊর্ধ্বাশয়তা এবং এবং গদ্যের স্বপ্রতিষ্ঠ স্থাণুতা কিছুই ইহাতে নাই। সংশয়সাগরোত্থিত মেঘমালার মতো এই গদ্য কবিতা কোন্ নিরুদ্দিষ্ট শৈলমালার অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। বৃষ্টিতে ইহার পরিণাম, না ঝটিকায় ইহার অবসান, না, নূতন ঊষার ব্রাহ্মমুহূর্তের অনেক আগেই ইহার নিঃশেষ অবলুপ্তি ! এই তো গদ্য কবিতা। কিন্তু শুধু গদ্য কবিতাই বা বলি কেন ? এ যুগের সব কবিতাই কি গদ্য কবিতা নয় ?[৩০]

এখন, প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা কতখানি কাব্যে পরিণত হইয়াছে তাহার উপরেই গদ্যকাব্যের সার্থকতা নির্ভর করিবে। বর্তমান যুগে সেই অপরিমার্জিত বাস্তবতারও একটি বিশেষ রূপ আছে, পূর্ববর্তী যুগের বাস্তবতা হইতে তাহা ভিন্ন। বাস্তবতার এই যুগস্বরূপ এইমাত্র বিবৃত হইয়াছে। এখন এই বিশেষ বাস্তবতাকে কতখানি কাব্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে কবির কলম—তাহাই বিচারের বিষয়।

কোপাই নদীর ক্ষীণমন্দ স্রোতে কবি গদ্যচ্ছন্দের রূপটি দেখিতে পাইয়াছেন—

> কোপাই, আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
> সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার জলে স্থলে,
> যেখানে ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালি।[৩১]

এই কবিতাটিতেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—

৩০ গদ্য কবিতা, বিচিত্র উপল

৩১ কোপাই, পুনশ্চ

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,
তাকে সাধু ভাষা বলে না।

এখন কবির এই দাবি গদ্যকবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য কিনা তাই ভাবি। কোন কোন কবিতায় ভাষা ও ছন্দে গৃহস্থালির সুর স্পষ্ট, বিষয়টাও আটপৌরে। কিন্তু চারখানা গদ্যকাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা, কি বিষয়ে, কি দৃষ্টিতে, কি ভাষা ও ছন্দের বিন্যাসে ভাষার গৃহস্থালির অনেক ঊর্ধ্বে। তাহাদের মধ্যে এমন একটি রাজসিক সমারোহ আছে যে নিতান্ত রাজগৃহস্থের সংসারেও তাহা বেমানান হইত।

রবীন্দ্রকাব্যেই অন্যত্র ভাষার গৃহস্থালি আছে। চৈতালি, ক্ষণিকা ও খেয়া কাব্যের অধিকাংশ কবিতার ভাষায় ও ছন্দে ভাষার গৃহস্থালি, বিষয়েও। লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকের ভাষা ছন্দ ও বিষয়ে ভাষার গৃহস্থালি। এই সব কাব্যের মতো সাধারণভাবে গদ্যকবিতাগুলি ভাষা ও ছন্দের গৃহস্থালিতার দাবি করিতে পারে না। কবির দাবি উহাদের "ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা।" এ ভাষা যে গৃহস্থগণ বলিয়া থাকে তাহাদের নিবাস স্বর্গলোকে সপ্তর্ষিদের পাড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যরূপের মধ্যে এই লক্ষণীয় অসঙ্গতির মূলে আছে কবি ও দার্শনিকের মধ্যে মূলগত অসঙ্গতি। রবীন্দ্রনাথ অসীমের ধনুকে সীমার জ্যা আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি রচনার সময়ে বোধ করি একবার মাত্র এই আয়াসসাধ্য কার্য সম্ভব হইয়াছিল, তার পরে স্খলিতজ্যা ধনুক আর সীমার বন্ধন স্বীকার করে নাই। গদ্যকাব্যের ভাষায় তিনি যখন "গৃহস্থালির সুর" ভাষান্তরে "অপরিমার্জিত বাস্তবতা"র সুর ভাষান্তরে "সীমার জগতে"র সুর ধ্বনিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাহাতে একটা নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র।

পুনশ্চ কাব্যের নাটক শীর্ষক কবিতাটিতে গদ্যের চরিত্রবৈচিত্র্য বিবৃত করিয়াছেন কবি। একটু বিস্তারে শোনা যাক।

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফর্মাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালো মন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দো-শালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে।
সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝঙ্কার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়লো গদ্যবাণীর মহাদেশ।
... ...
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানা রকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

গদ্যের বিচিত্র চরিত্রের বর্ণনা হিসাবে কবির কথা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু কবির গদ্যকলম সম্বন্ধে সত্য কি না সন্দেহ। এপিক লিরিক নাটকীয় নানা মেজাজের গদ্য লিখিতে কবি অভ্যস্ত নন। তাঁহার

পদ্যের মতো তাঁহার গদ্যও প্রধানত লিরিক মেজাজের রচনা। এখানেও সেই সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের মধ্যে পুরাতন অসঙ্গতি।

পুনশ্চ কাব্যের 'নূতন কাল' কবিতাটি বরঞ্চ বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি। নূতন কালের প্রেয়সীর জন্য কবি নূতন কালের ভাষায় কাব্য লিখিলেন।

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমার বাণীর অলঙ্কারে।
… …
যেন গর্ব করে বলতে পারো
আমি তোমাদেরও বটে
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল ;
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

নূতন কালের ভাষায় গান রচিয়া কবির মনের মধ্যে যে অহমিকার কুয়াশা জমিয়া ওঠে, কোন্ নিয়তির নিশ্বাসে তাহা উড়িয়া যায়, কবি দেখিতে পান পুরাতন কালের পটে পুরাতন গানের বেদীর উপরে প্রেয়সীর মূর্তি। আর তিনি নূতনের ভিড়ের ধাক্কায় ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছেন। নূতন কালের বাণীর অলঙ্কার সম্বন্ধে কবির মনে খুব বেশি ভরসা নাই—মাঝখান হইতে গোল বাধায় ঐ তাত্ত্বিকটা, এমন একটা বাণীরূপ আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে কাব্য ও প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতার ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে। তাত্ত্বিক মনে করেন গদ্যচ্ছন্দই কাব্যের সেই মহাযান, যেখানে আদ্বিজচণ্ডাল সকলেরই বসিবার যথেষ্ট জায়গা আছে। অন্য পক্ষে কবি হঠাৎ আবিষ্কার করেন—

তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল ;
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।

কবি ও তাত্ত্বিকের এই অপ্রত্যাশিত লুকোচুরির বিচিত্র ছায়া-তপটারই অপর নাম বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য।

গদ্যকাব্য চারখানাকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রথম দুখানা—পুনশ্চ ও শেষ সপ্তকে কতকগুলি কবিতা আছে যাহাতে প্রত্যহের অপরিমার্জিত বাস্তবতা হইতে কাব্যের সোনার রেশমী সূত্র টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। শেষ দুখানা কাব্য পত্রপুট ও শ্যামলীতে এমন একটিও কবিতা নাই যাহাতে প্রত্যহের অপরিমার্জিত বাস্তবকে কাব্যে শোধন করিয়া লইবার চেষ্টা আছে। গদ্য কবিতা রচনার সময়ে তত্ত্বগত প্রেরণাটা, অর্থাৎ কাব্যে হাওয়া বদল হইয়াছে, তাই কাব্য ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ ঘুচাইয়া দিতে হইবে, এই সঙ্কল্প কবির মনে প্রবল ছিল, তাই পাই গোটাকতক এইজাতের কবিতা প্রথম দুখানা কাব্যে। কিন্তু তার পরেই কবির অন্তর্নিহিত স্বভাব আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্বপ্রেরণাকে বিসর্জন দিয়াছে—এই কারণেই পত্রপুট ও শ্যামলীতে—অপরাধী, বালক, ছেলেটা, একজন লোক, উন্নতি, সাধারণ মেয়ে[৩২] বা পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ ও বাদশাহের হুকুম[৩৩] প্রভৃতির সমরসের কবিতা নাই।

পুনশ্চ কাব্যের বিখ্যাত বাঁশি কবিতাটিকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করি। কবিতাটিতে দুটি আবহাওয়া ; রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় জমিনদারির ও আসমানদারির। নায়ক হরিপদ কেরানি[৩৪] একই সঙ্গে এই দুই জগতের অধিবাসী। এই

৩২ পুনশ্চ ৩৩ শেষ সপ্তক

৩৪ হরিপদ কেরানরিই পূর্বরূপ প্রেমের অভিষেক কবিতার কেরানি তাহার নামও হরিপদ হইতে পারিত।

কবিতায় স্পষ্টতঃ কাব্য ও অপরিমার্জিত বাস্তবতার ব্যবধান ঘুচাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবধান সত্যই ঘুচিয়াছে কি ?

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাই পাঁশ আরো কত কী যে।[৩৫]

এ নিঃসন্দেহ অপরিমার্জিত বাস্তব, কিন্তু কাব্য কি? বিষয়, তাহা পরিমার্জিত বা অপরিমার্জিত যেমনই হোক, সেই বিষয়টা কাব্য

---

৩৫ তুলনীয় :— কাঁঠালের ভূতিপচা, আমানি, মাছের যত আঁশ
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষ রাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙ্গা পাশের বাড়িতে
পাড়া প্রতিবেশী থাকে হুঙ্কার ছাড়িতে।
… … …
কুকুরটা, সর্ব অঙ্গে ক্ষত,
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত। (অনসূয়া—সানাই)

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কয়েকটি কবিতা
এপারে-ওপারে…নবজাতক,
সানাই……সানাই
বাসাবদল……সানাই

নয় ; বিষয়ের সঙ্গে কবির আনন্দ মিশ্রিত হইলে তবেই তাহা কাব্যে পরিণত হয়। উপরের বর্ণনার মধ্যে কবির আনন্দ নাই, কর্তব্যবোধ মাত্র আছে। সেই কর্তব্যের খাতিরে তালিকাবদ্ধ বাস্তবের বর্ণনা লিখিয়াছেন কিন্তু যে আনন্দ সমধারায় এরিয়েল ও ক্যালিবনের উপরে বর্ষিত হয় সে আনন্দ এখানে নাই—তাই ইহা বর্ণনার অধিক নয়। নোংরা গলির মধ্য দিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িলে লোকে যেমন নাকে কাপড় দিয়া দ্রুত পায়ে চলিয়া যায়, খোলা হাওয়ায় গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, এখানে যেন কবির তেমনি কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত দ্রুত পদসঞ্চার ঘটিয়াছে। বাহিরের হাওয়ায় গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বাঁরোয়ায় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

অপরিমার্জিত বাস্তব যে কাব্য হইয়া ওঠে নাই তাহার আরো প্রমাণ আছে—

তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ, মাতালের প্রলাপের মতো।

গলিটা যে ঘোর মিছে বলিয়া ধরা পড়িল তাহার কারণ বাস্তব বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই কিম্বা কাব্য বাস্তবতার স্তর পর্যন্ত নামিতে পারে নাই। দুয়ের ব্যবধান ঘোচে নাই বলিয়াই

ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

ছেঁড়া ছাতা আর রাজছত্রে হরিপদ কেরানি একচ্ছত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই—দুই সমান্তরাল ধারায় ভাসিয়া গেল, হতাশ ভাবে বসিয়া দেখিয়াছে।

কবি যখন আধুনিকাকে কবিতা পড়িয়া শোনাইতেছেন তখনো মনের মধ্যে কোথায় একটুখানি খুঁত খুঁত করিতে থাকে—

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে
'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।'[৩৬]

ক্ষণিকা কাব্যে যখন ঐ ছত্রটি লিখিয়াছিলেন তখন মনে হইয়াছিল।

আপাততঃ এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তখনো জীবনের অধিকাংশ সম্ভাবনারূপে সম্মুখে ছিল—এখন অদূরে ঐ যাত্রাপথের সীমা, নিজের কীর্তিতেও এখন আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না, তাই মাঝে মাঝে কালিদাসের কালের স্মৃতি বহু যুগের পুষ্পরেণু মাখা অজানা পাখির মতো মনের মধ্যে হুশ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে—তখন এক-একবার আক্ষেপ হয়।

তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর, আমি যদি হ'তেম—কী হবে বলে।

বাসা[৩৭] কবিতাটির নামান্তর হইতে পারিত ময়ূরাক্ষী। কবি বলেন—

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে
মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,

৩৬ পত্র, পুনশ্চ

৩৭ বাসা, পুনশ্চ

সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এ ময়ূরাক্ষী নদীর স্থান বাংলা দেশের ভূগোল নয়, মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গা ইহার নামান্তর হইতে পারিত। আর এ বাসা! কল্পবৃক্ষের কাঠকুটার উপাদানে এ বাসা বাঁধা। তাই

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।

কীটের সংসারের[৩৮] দিকে তাকাইয়া কবি বুঝিতে পারেন ঐ অতিক্ষুদ্র সংসারের মধ্যেও অসীমের বিস্তার। একজন লোক[৩৯] ও চৈতালি কাব্যের সামান্য লোক-এ দৃষ্টির কত প্রভেদ। চৈতালির সেই নামগোত্রহীন লোকটাকে সযত্নে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করানো হইয়াছে—আর পুনশ্চ কাব্যের একজন লোক—

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে,
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতেই নেই কোন্ দরকার,
কেবল হাটে চলার পথে
ভাদ্র মাসের সকাল বেলায়
একজন লোক।

সীমার যাবতীয় সংশ্লেষ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া লোকটি অসীমের পটে স্থাপিত হওয়াতে ঐ সামান্য মানুষটা অসামান্যতা লাভ করিয়াছে। চৈতালি কাব্যের সামান্য মানুষের অসামান্যতার কারণ তাহার মধ্যে বিশেষ কালের বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থার পরিচয়।

৩৮ কীটের সংসার, পুনশ্চ

৩৯ একজন লোক, পুনশ্চ

খেলার ক্ষুদ্র জগৎ হইতে খেলনা মনে মনে মুক্তির প্রার্থনা করিতেছে—

'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'[৪০]

খেলনাই হোক আর খেলুড়িই হোক রবীন্দ্রনাথের জগতে সকলেই মনে মনে অসীমের কাঙাল। তবে আবার সীমাকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? সীমা যেন ধনুকের ছিলা, তাহাতে টান পড়িলে তবেই তো তীর অসীমের মুখে ছুটিবে। চিররূপের বাণী[৪১] কবিতাটিতে রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্বের যে মূল কথাটি বলা হইয়াছে তাহাতে জয়ধ্বনি অসীমের।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে
জয়ধ্বনি উঠলো মর্ত্যলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগল মিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণী তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।[৪২]

গানের বাসা[৪৩] ও বাসা কবিতা দুটির বক্তব্য ভিন্ন নয়। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে যে বাসা তাহা গানের উপাদানেই গঠিত, গানের বাসাও তাই, দুই-ই

৪০ খেলনার মুক্তি, পুনশ্চ ৪১ চিররূপের বাণী, পুনশ্চ

৪২ ইংরাজিতে যাহাকে আইডিয়ালিস্টিক সাহিত্য বা শিল্পকলা বলে রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্ব তাহাকেই সমর্থন করে। প্রাণকে (জড়শক্তির লীলারূপে) ও দেহকে অস্বীকার না করিয়াও দেহমুক্ত রূপ ও দেহমুক্ত বাণীর যুগল মিলনের উৎসব ঘোষণা তিনি করিয়াছেন।

৪৩ গানের বাসা, পুনশ্চ

ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই।

মৃন্ময়ী ধূলি রবীন্দ্রনাথের কাছে পবিত্র, কিন্তু যে ধূলি জড়ের জয়ধ্বজা আকাশে উদ্যত করিয়া দেয়, চিন্ময় সত্তার পরিপন্থী বলিয়া তাহাকে তিনি হীন মনে করেন, তখনি তাহার কাছে হইতে পালাইয়া যাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

গদ্যকাব্য চারখানির মধ্যে শেষ সপ্তকের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ভাব কিছু প্রবল, এখানে যেন কালিদাসের কলমটাকে ছাপাইয়া সক্রিয় মল্লিনাথের কলম। কাব্যখানাকে রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার ভাষ্য বলিলে অন্যায় হয় না।[৪৪] কিছু আগে গদ্যকাব্য চারখানির ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সীমা ও অসীমে মিলাইবার উদ্দেশ্যে অপরিমার্জিত বাস্তবকে কাব্যরূপে প্রকাশের বাহন আবিষ্কার প্রচেষ্টাটার যে সূত্রপাত গদ্যকবিতা, তাহার প্রথম সুনিশ্চিত রূপটা পাই পুনশ্চকাব্যে—শেষ সপ্তক কাব্যেও কতকটা পাই তবে বেগটা মন্দীভূত, আর শেষ দুখানা কাব্যে এ প্রচেষ্টার চিহ্ন নাই বলিলেও চলে, সীমা ও অসীমে মিলাইবার দুশ্চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া কবি একান্ত ভাবে অসীমের কাছেই যেন আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে অসীম বলেন তাহাকেই আবার প্রসঙ্গান্তরে দূর বলিয়া থাকেন। তাই দূরের দূরত্ব আর ঘুচিতে চায় না। দূর ও নিকট প্রণয়ী-যুগলের মতো পরস্পরকে ধরিবার আগ্রহে জীবনকে রমণীয়তর করিয়া তোলে!

দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানালার পাশেই বসে বসে ভাবি,

---

৪৪ কবিতা সংখ্যা ১৫, ১৬ ছবির ব্যাখ্যা; ১৭ গানের ব্যাখ্যা; ১৮ শোকের ব্যাখ্যা; ২০, ২৪, ২৫ গদ্য কবিতার ব্যাখ্যা; ৪৩, ৪৫ জন্মদিনের ব্যাখ্যা।

বেশি বয়সে মানুষকে অনেক সময়েই আত্মব্যাখ্যার ভূতে পাইয়া বসে, রবীন্দ্রনাথও সর্বাংশে মুক্ত নন।

দূর বলে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।[৪৫]

এই দূর-ই নানাভাবে জীবনের নানাক্ষেত্রে আপনাকে জানান দেয়—

ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।[৪৬]

জীবনের অমরতার মুহূর্তগুলি যে অমেয়, অসীম কোন এক ক্ষণে তাহা মনে পড়িয়া যায়—

তার সীমা কে বিচার করবে?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না।[৪৭]

পিঠ-পিঠ দুটি কবিতায় "অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা" আমির মধ্যে

৪৫ পনেরো সংখ্যক, শেষ সপ্তক
৪৬ উনিশ সংখ্যক, শেষ সপ্তক
৪৭ একুশ সংখ্যক, শেষ সপ্তক

অপরিমেয় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।[৪৮] আর তখন যে পথিক "এত কালের কাছের জগতে" ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে সেই পথিক, সেই আমি

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।[৪৯]

পত্রপুট কাব্যের তেরো সংখ্যক কবিতাটির নামান্তর হইতে পারিত পত্রপুট। হৃদয় যে বিচিত্র শক্তি যোগে জগতের ও জীবনের রস রং সৌন্দর্য আনন্দ প্রভৃতি আহরণ করে তাহাদের কবি আখ্যা দিয়াছেন "হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট।" ইচ্ছা করিলে ইহাদের হৃদয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাম বলা যাইতে পারে। এই পত্রপুট-গুচ্ছ অসীমের মধ্যে মাধুকরী ব্রত করিয়া ফিরিতেছে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।[৫০]
... ...

কবির পক্ষ হইতে ইহার চেয়ে স্পষ্টতর স্বীকারোক্তি আর কি হইতে পারে। অসীমের স্পর্শগ্রাহিতায় তাঁহার কবিসত্তা গঠিত।

কবিসত্তা অসীমের স্পর্শগ্রাহী বলিয়াই সহজে পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতকে, নিকটের মধ্যে দূরকে, এবং সীমার মধ্যে অসীমকে আবিষ্কার করে। তাই অতি পরিচিত চারুর উপরে ক্লাসিকযুগের চারুপ্রভা নামের ধূপছায়া ছড়াইয়া না দেওয়া অবধি তাহার যথার্থ

---

৪৮ বাইশ ও তেইশ সংখ্যক, শেষ সপ্তক

৪৯ চৌত্রিশ সংখ্যক, শেষ সপ্তক

৫০ তেরো সংখ্যক, পত্রপুট

রূপটি ধরা পড়ে না।[৫১] তাই কাজের দিনের মেয়েটিকে "তিনশ বছর আগেকার কবির জানা সেই বাঙালির মেয়ে"তে পরিণত করিলে তাহার মধ্যে অমেয় সৌন্দর্য ধরা পড়ে।[৫২] আর বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে অভাবিত প্রকাশ হইয়া পড়ে বাংলাদেশের মেয়ের মধ্যে। সেই অভাবিতের মধ্যেই তাহার সত্য, তাই সে বলে

ওগো বাঁশিওয়ালা

সে থাক তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।[৫৩]

কেন? না, অসীমের পটেই যে সত্যের প্রকাশ, সীমার মধ্যে আনিয়া ফেলিলে সত্যভ্রষ্ট হয় সে।

পত্রপুট কাব্যের সেই বাউলটি হাটের মধ্যে গান ধরিয়াছে—

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,

সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।[৫৪]

এই গানেই তো রবীন্দ্র কবিসত্তার গভীরতম আকূতি। যিনি অধরার সন্ধানে ভবের হাটে "জগতে আনন্দযজ্ঞে" আসিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিয়া সকলের টানাটানির অন্ত নাই। কত রকম দাবী। রাজনীতির, সমাজনীতির, শিক্ষানীতির। এই দাবীদার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল, কেন না সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, তাঁহার তাত্ত্বিক সত্তা। সে বলে একবার ঐ অসীমের সঙ্গে সীমাকে মিলাও দেখি। তখন কবিতে আর তাত্ত্বিকে একযোগে সেই ধনুর্ভঙ্গপণে আত্মনিয়োগ করে, সেই অসীমের ধনুকখানার দুই কোটিতে সীমার জ্যা একবার মুহূর্তের জন্য স্পর্শও করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত কোদণ্ড মুক্তির আনন্দে উল্লাসরব করিয়া ওঠে, কবিও কম উল্লসিত হন না, কেন না তিনিও স্বক্ষেত্রে মুক্তি পান, স্বধর্ম মনে পড়ায় তাঁহার অন্তরাত্মা গাহিয়া ওঠে, "হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে।"

৫১ সম্ভাষণ, শ্যামলী ৫২ স্বপ্ন, শ্যামলী

৫৩ বাঁশিওয়ালা, শ্যামলী

৫৪ পাঁচ সংখ্যক, পত্রপুট

সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে সমন্বিত কাব্যরীতিকে অনুসন্ধান করিতেছেন প্রথম যৌবন হইতে। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতা তাহার একটি অসফল নিদর্শন। তারপরে প্রতিভা বিকাশের পর্বে পর্বে প্রত্যহের অপরিমার্জিত বাস্তবতাকে কাব্যে পরিণত করিবার আশায় চৈতালির সরল চতুর্দশপদী ও ক্ষণিকার লোকভাষার ছন্দ প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছেন। তারপরে দীর্ঘকাল অন্যদিকে কবিপ্রতিভা ব্যাপৃত থাকিলেও মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাজ করিতেছিল। লিপিকা এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার একটা চিহ্ন। তারও পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত গদ্যচ্ছন্দ এই পথের শেষ অধ্বঃশিলাখণ্ড। ইহার পরে ব্যতিক্রম বাদে কখনো তিনি আর প্রত্যহের অপরিমার্জিত বাস্তবতাকে কাব্যে পরিণত করিবার সচেতন চেষ্টা করিয়াছেন মনে হয় না। আর গদ্যচ্ছন্দেও সে চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই, কেন না, তাঁহার কবিসত্তার পত্রপুটগুলি কবিপ্রকৃতির বিধানে অসীমের স্পর্শগ্রাহী করিয়াই গঠিত।

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাইতে পারে। গদ্যচ্ছন্দ বা গদ্যকবিতা অর্থাৎ পুনশ্চ আদি চারখানা গ্রন্থে সঞ্চিত রচনাগুলির কি জাত, ইহারা কি গদ্য, না পদ্য, না গদ্যপদ্যতর অপর কোন জাত? ইহারা পুরুষ-বেশী চিত্রাঙ্গদা না নারী-বেশী বৃহন্নলা না বুধপত্নী ইলার ন্যায় কখনো পুরুষ কখনো নারী! কবি নিজে ইহাদের গদ্যের প্রতিবেশী মনে করিলেও সরাসরি গদ্য মনে করেন নাই—শ্লোকসজ্জাই তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। গদ্যকবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি প্রবন্ধে ও কাব্যে বহুত্র আলোচনা করিয়াছেন।[৫৫] কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সংশয় ঘোচে

৫৫ কাব্যে গদ্যরীতি, কাব্য ও ছন্দ, গদ্যকাব্য (সাহিত্যের স্বরূপ ২য় সংস্করণ), কোপাই, নাটক, নতুন কাল, পত্র (পুনশ্চ); চব্বিশ ও পঁচিশ সংখ্যক (শেষ সপ্তক)

নাই—ইহা যে সরাসরি গদ্য নয়, একান্ত ভাবে কাব্যধর্মাশ্রিত বিশেষ এক চালের গদ্য নয়—সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। জীবনের পর্বে পর্বে কবি নানা চালের নানা মেজাজের গদ্যরীতি ব্যবহার করিয়াছেন—গদ্যচ্ছন্দ নামে পরিচিত রচনাগুলি তাহাদেরই অন্যতম, তাহাদের জন্য নূতন কোন শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন আছে মনে হয় না। খুব সম্ভব মনের গভীরে কবি নিজেও নিঃসংশয় নহেন —যদিচ শ্লোকসজ্জা দ্বারা মনের গভীর সংশয়কে তিনি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গদ্যচ্ছন্দের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

> আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।[৫৬]

কবি বলিতে চান যে পূর্ব সংস্কারের প্ররোচনায় লিপিকার রচনাগুলিকে শ্লোকরূপে গ্রথিত না করিয়া অনুচ্ছেদরূপে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাকে তিনি সাহসের অভাব বলিয়াছেন। কিন্তু গদ্যচ্ছন্দ নামে পরিচিত রচনাগুলিকে সরাসরি অনুচ্ছেদ রূপে না সাজাইয়া শ্লোকরূপে সাজানো কি আর এক রকম সাহসের অভাব নয়? লিপিকায় যদি তিনি পাঠকের চোখকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন, এখানে কি তাহার চোখকে ঘুষ দেওয়া হয় নাই? শ্লোক রূপে আত্মপ্রকাশের যোগ্যতা যাহার নাই, শ্লোক রূপে তাহার আত্মপ্রকাশ আর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের রমণীবেশ ধারণ কি একই প্রকার ছলনা নয়! এগুলি গদ্যোচিত অনুচ্ছেদ রূপে সজ্জিত হইলে ইহাদের রসোদ্বোধন ক্ষমতা এতটুকু কমিত না। হইতে পারে যে এই নতুন চালের গদ্যরীতি পড়িতে কোন কোন অসুবিধা ঘটিত। কিন্তু তেমন অনভিজ্ঞ পাঠকের অভ্যাসের অভাবকে খাতির করিয়া চলিতে হইলে চলাই দুষ্কর হইয়া পড়ে। মূঢ়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে শেষ

৫৬ গদ্যকাব্য, সাহিত্যের স্বরূপ ২য় সং

পর্যন্ত কোন্ রসাতলে গিয়া যাত্রা শেষ করিতে হইবে তাহা কে জানে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিবার পরে মধুসূদন যে কারণে ও যে রকমের ভয় পাইয়াছিলেন, গদ্যচ্ছন্দ রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই রকমের ভয় পাইয়াছেন মনে হয়।[৫৭] মধুসূদনের ভীতি সত্ত্বেও চক্ষুষ্মান পাঠক অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষত্ব বুঝিতে ভুল করে নাই, রবীন্দ্রনাথ ভীতি বশত অর্জুনকে বৃহন্নলা না সাজাইলেও লোকে এ গদ্যের নূতন চাল বুঝিতে ভুল করিত না। এখানে কয়েকটি অংশকে গদ্য অনুচ্ছেদে সাজাইতেছি, দেখা যাক তাহাতে রসের ইতর বিশেষ হয় কিনা।

> সমাজের কোন শাসনে নির্বাসনের পালা, দলের কোন্ অবিচারে জাগলো অভিমান। কিছু দূরেই শালিখগুলো করছে বকাবকি, ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি, উড়ে বেড়ায় শিরিষ গাছের ডালে ডালে; ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই। জীবনে ওর কোন্খানে যে গাঁঠ পড়েছে, সেই কথাটাই ভাবি।[৫৮]

শ্লোকরূপে সজ্জিত রচনাটির রূপের সঙ্গে পূর্বপরিচয় না থাকিলে ইহার রস গ্রহণে অসুবিধা হইবার কথা নয়। তবে এমন অসম্ভব নয় পূর্বপরিচয় ক্ষণে ক্ষণে রসের পাত্রে আঘাত করিবে।

> বিষয়টা ঘটেছিল আমারই আমলে পান্তিঘাটায়। আসামি পলিটিকাল, সাতমাস পলাতক। মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল প্রাণ হাতে করে। খুড়ো গেল পুলিশে খবর দিতে। কিছুদিন নিল সে আশ্রয় জেলেনির ঘরে। যখন পড়লো ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো, মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনি। জেলেনিকে দিতে হল জেলে, খুড়ো হল সাব রেজিস্ট্রার।[৫৯]

উপরের অংশ একটা ঘটনার বিবৃতি, বেণীবন্ধ ও পেশোয়াজ ঘুচাইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলে তাহার বক্তব্য আরও ঋজুভাবে প্রকাশিত হইত। আফ্রিকা কবিতাটির বিভিন্ন পাঠ আলোচনা

---

৫৭ কাব্য ও ছন্দ, সাহিত্যের স্বরূপ ২য় সংস্করণ

৫৮ শালিখ, পুনশ্চ

৫৯ খ্যাতি, পুনশ্চ

উপলক্ষ্যে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে গদ্যচ্ছন্দের চূড়ান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কবি সুনিশ্চিত ছিলেন কিনা সন্দেহ! পুনশ্চ গ্রন্থে একাধিক রচনা আছে যাহার গদ্যরূপ ও গদ্যচ্ছন্দ রূপ দুই-ই পাওয়া যায়,[৬০] তন্মধ্যে একটি সবিস্তারে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

> মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিন নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল 'শ্যামজম্বুবনান্ত'কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী বলে উঠেছিল "মা গো, পাহাড় সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি।" তাই মেঘদূতে যে বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়; এমন কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় যে পৃথিবীকে উচ্ছল ঝরণায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে মুখরিত বনবীথিকার সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না। ছোট তার বাসকক্ষ, নিভৃত। কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদীগিরি অরণ্যশ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হল, মন তখন কৈলাসে পৌঁছেচে, তখনই যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল, কেন না সেখানে কেবলই প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে, চলেছে বলেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায়। কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চিরযুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্যপুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা

---

৬০ নাটক, পুনশ্চ, দ্রষ্টব্য পুনশ্চ গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ১৯৯

বাসা	ঐ	ঐ	পৃঃ ২০০
সুন্দর	ঐ	ঐ	পৃঃ ২০১
বিচ্ছেদ	ঐ	ঐ	পৃঃ ২০৩
শিশুতীর্থ	ঐ	ঐ	পৃঃ ২০৬

—সেই হচ্ছে যথার্থ বিরহী। সুর বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু অগীত সংগীত অসীম অব্যক্তির মধ্যে অপেক্ষা করেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিত, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে, যার জন্য অভিসার তিনিও থেমে নেই, সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, প্রতীক্ষার বাঁশি। তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে। তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের ছন্দে। বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে—অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনদিন বাস্তবের মধ্যে ঘটছে না। সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকতো না, কেননা সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির অভিসার চির প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোলুশ্যন বলতে তাই বোঝায়। যাকগে আমার বলবার কথা ছিল, বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন—মেঘ চলছে না, হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মত দিনের মুখ আবৃত করেছে। প্রহর চলছে না, বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে চারিদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ।[৬১]

এখন এই সব দ্বৈতরূপের মধ্যে যদি রসের ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ সাদাগদ্য ও গদ্যছন্দের ইতর বিশেষ নয়, খুব সম্ভব গদ্যছন্দের রচনায় কবি আপনাকে অনেক অধিক পরিমাণে ঢালিয়া দিয়াছেন—পথে ও পথের প্রান্তের পত্রজাতীয় রচনায় স্বভাবতই নিজেকে অকৃপণ হস্তে দান করা সম্ভব হয় নাই। পত্রে লিখিত রচনাটি যদি হয় খসড়া, পুনশ্চে সংগৃহীত রচনাটি পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে একই ছবির পূর্ণাঙ্গরূপ। রেখার কাঠামোর ভেদ নাই, ছায়াতপের আধিক্যে ভেদ ঘটিয়াছে। তাহাতে একটা রীতির উপরে অন্যরীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অনেক রচনাকে, গদ্যছন্দের নীতি

---

৬১ পুনশ্চ গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ২০৩

অনুসরণ করিয়া অনায়াসে শ্লোক রূপে সজ্জিত করা যায়। আগের দিকের অনেক রচনার পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদকে হ্রস্ব ক্রিয়াপদে পরিণত করিলে তাহারাও সহজে শ্লোকবন্ধে সজ্জিত হইবার যোগ্য। পরবর্তী জীবনের রচনা বলিতে বুঝি শেষের কবিতার কতক অংশ, তিনসঙ্গীর অনেক অংশ। আগের দিকের রচনা বলিতে বুঝি কাব্যের উপেক্ষিতা ও ক্ষুধিত পাষাণ। ভালো গদ্যমাত্রেই এক প্রকার প্রচ্ছন্ন ছন্দ আছে, সব সময়ে তাহা কানে ধরা পড়ে না বলিয়া পদবিভাগে সজ্জিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যেখানে ভাবের আবেগ প্রবল হইয়া ওঠে কিম্বা কল্পনার ঐশ্বর্য উচ্ছল হইয়া ওঠে সেখানে প্রচ্ছন্ন ছন্দটাও স্পষ্টতর হয়—তখন আর পদবিভাগে অসুবিধা হইবার কথা নয়। ইহা গদ্য মাত্রেরই সাধারণ নিয়ম। কাজেই এই নিয়মের প্রেরণায় গদ্যচ্ছন্দ সৃষ্টি করিতে গেলে তাবদ্ গদ্যকেই পদবিভাগে সজ্জিত করিতে হয়। তাই নূতন শ্রেণী নির্ণয়ের সার্থকতা আছে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা গদ্যেরই এক বিশেষ ঢঙ, তাঁহার বিচিত্র গদ্যরীতির ইহা একটি অভিনব নিদর্শন। পদবিভাগে সজ্জিত না হইলে এই সহজ কথাটা পাঠকে গোড়া হইতেই স্বীকার করিয়া লইত, যেমন লিপিকার বেলায় করিয়া লইয়াছিল, স্বয়ং কবি লিপিকার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক তুলিবার আগে কাহারো মনে হয় নাই যে ইহা গদ্য ছাড়া আর কিছু। যাই হোক, শ্লোকবন্ধে সজ্জিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাকে আর সাদা গদ্যের ন্যায় অনুচ্ছেদে সাজানো সম্ভব হইবে না, কাজেই আর কোন কারণে না হোক—ঐ চিহ্নটির জন্যেই ইহার জাতিপরিচয় সম্বন্ধে পাঠকের মন কখনো নিঃসংশয় হইতে পারিবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

"মৃত্যুদূত এসেছিল···তব সভা হ'তে"

রবীন্দ্রনাথের প্রান্তিক কাব্যখানির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আগের আর কোন কাব্যে দেখিতে পাই না, অবশ্য পরবর্তী কাব্য আরোগ্য, রোগশয্যায় প্রভৃতি কাব্যেও এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৯৩৭ সালে কবি গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন, সে পীড়া কোন এক মুহূর্তে প্রাণসংশয়কর মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিরাময় হইয়া ওঠেন। প্রান্তিক কাব্য সেই অভিজ্ঞতার ফসল। প্রান্তিক কাব্যের প্রেরণার মূলে এই একটিমাত্র পরম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পূর্ববর্তী আর কোন কাব্য সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। একটিমাত্র অভিজ্ঞতার শিলাখণ্ডে গঠিত বলিয়া কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র ভাষায় সংক্ষিপ্ত, ভাবে সংহত, অন্যান্য কাব্যে যেসব ভাবের অণুপরমাণু শিথিলবন্ধ বলিয়া নৃত্য করিবার সুযোগ পাইয়াছে, দারুণ অভিজ্ঞতার চাপে এখানে তাহা ঘনীভূত অবস্থায় দৃঢ়পিনদ্ধ প্রস্তরখণ্ডে পরিণত। কবিতাগুলির ভার যেন হাতে অনুভূত হইতে থাকে। তুলনায় আরোগ্য- ও রোগশয্যায়-ভুক্ত কবিতাগুলি লঘুভার—যদিচ তাহাদের মূলেও আছে আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যেন অভিজ্ঞতার গভীর খনি হইতে উত্তোলিত মূর্তিটা দেখিতে পাই—এ যেন অভিজ্ঞতার কাঁচামাল, শিল্পকলা ইহার উপরে রাজকীয় মুদ্রা অঙ্কিত করিবার সুযোগ পায় নাই। পরবর্তী কাব্য সেঁজুতিতেও এই একই অভিজ্ঞতা, কালব্যবধানের সুযোগ পাওয়াতে মূল অভিজ্ঞতাকে আর কাঁচা মূর্তিতে দেখা যায় না—শিল্পকলা তাহার মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রান্তিকের ঠাসবুনন কবিতাগুলি যেন বস্তাবন্দী অভিজ্ঞতার চাপ, এমন কি অন্ত্যানুপ্রাসের স্বাভাবিক রন্ধ্র বর্জিত বলিয়া বাতাস খেলিবার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত।[১]

এই কাব্যের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইহা আদ্যন্ত লিখিত। কবি যেন এক নিশ্বাসে নিদারুণ অভিজ্ঞতা বলিয়া ফেলিয়া মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে চান। আবার অল্প সময়ের মধ্যে রচিত বলিয়াই যেন কবিতাগুলি এক ছাঁচে ঢালাই হইবার সুযোগ পাইয়াছে।[২]

১ আঠারোটি কবিতার মধ্যে ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক বছর তিন আগে লিখিত। এ কবিতাগুলিও ঠাসবুনন তবু অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ গতি। ১৯৩৭-এর রোগে অভিজ্ঞতা ইহাদের প্রেরণা নয়। ১৮ সংখ্যক কবিতাটি অবশ্য অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। এই শেষের কবিতাটি অন্ত্যানুপ্রাসের ঘণ্টা বাজাইয়া যেন কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছে।

২ আঠারোটি কবিতার মধ্যে ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক বাদ দিলে বাকি পনেরোটি কবিতার রচনাকাল নিম্নোক্তরূপ।

১ম—২৫।৯।৩৭
২য়, ৩য়—২৯।৯।৩৭
৪র্থ—১।১০।৩৭
৫ম, ৬ষ্ঠ—৪।১০।৩৭
৭ম—৭।১০।৩৭
৮ম—৯।১০।৩৭
৯ম, ১০ম—৮।১২।৩৭
১১শ, ১২শ—১৮।১২।১৭
১৩শ—১৯।১২।৩৭
১৭শ, ১৮শ—২৫।১২।৩৭

কবির স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় রচনার প্রাচুর্য সত্যই বিস্ময়কর।

এখন আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রান্তিকের পনেরোটি কবিতাকে একটি নাতিদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কবিতার পনেরোটি শ্লোক বলিয়া ধরিয়া লইব আর সেইভাবে

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে।

জীবনের আকাশে যে-সব সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছিল তাহা ধীরে অপসারিত হইয়া গেল, "বিধাতার নবনাট্য-ভূমে" যবনিকা উঠিল। "শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী" সঞ্চিত অন্ধকারকে চকিত করিয়া তুলিল; অভিনব জাগরণ অন্ধকারের নাড়িতে জ্যোতির্ধারা প্রবাহিত করিয়া দিল। তারপরে কিছুকাল আলো-আঁধারের অস্পষ্ট বিভ্রম চলিবার পর "অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি।" পুরাতন সম্মোহ কুয়াশার মতো অন্তর্হিত হইল। তখন "নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত।" আর দেখা গেল এতদিন যে দেহখানা বিন্ধ্যগিরির ব্যবধান রচনা করিয়া ভবিষ্যৎকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল সেই দেহ প্রভাতের অবসন্ন মেঘের মতো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তখন—

ধরিয়া লইয়া কবিকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রেরণার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। তবে সে কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগে একটা দরকারী কথা সারিয়া লওয়া আবশ্যক। মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নূতন নয়, তবে ইহার আগে অবধি সে পরিচয় সবক্ষেত্রেই ছিল পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পরিচয় এই প্রথম। অবশ্য ডাকঘর নাটক লিখিবার আগে তাঁহার অনেকগুলি পত্রে মৃত্যুর আসন্নতার কথা আছে, দুরারোগ্য ব্যাধির কথা আছে, তবে যতদূর মনে হয় রোগটা সেখানে মানসিক। শারীরিক ব্যাধি, যাহার পরিণাম মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়—চিরনীরোগ অটুটস্বাস্থ্য কবির জীবনে এই প্রথম। চিররুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ অভিমত নূতন অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে না, নীরোগ ও স্বাস্থ্যবানের ক্ষেত্রেই তাহা নূতন বাণীবহ, কেন না তাহা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এই জন্য তাঁহার প্রান্তিকের মৃত্যুর কবিতা পূর্বতন মৃত্যুবিষয়ক কবিতা হইতে ভিন্ন জাতের। ইহাদের সর্বাঙ্গে জীবন ও মৃত্যু "ডেডলেটার আপিসে"র শীলমোহর মুদ্রিত।

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

॥ ২ ॥

"আজন্মকালের ভিক্ষা ঝুলি" আজ মৃত্যুর প্রসাদবহ্নিতে চরিতার্থ হোক। এতদিনের সঞ্চিত অহমিকারাশি দগ্ধ হইয়া গিয়া সেই আলোকে এ "মর্ত্যের প্রান্তপথ" দীপ্ত হইয়া উঠুক—সেই পথ পূর্ব সমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচল চূড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছে যেন উপলব্ধি ঘটে।

"এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র" ছিন্ন হইয়া গেলে দেখা গেল যে সম্মুখে নিঃসঙ্গের দেশ। সেখানে "মহা একা"—সম্মুখে একাকী কবি। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একাকীর ভয় নাই, লজ্জা নাই। কেন না "বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান।" —আরও বুঝিলেন যে, পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া—

রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

॥ ৪ ॥

"সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে"—যে সত্যের আদিম স্বাক্ষর নিয়া সংসারে আসিয়াছি পাঁচজনের মুখের কথায়, পাঁচজনের হাতের ছাপে তাহা বিলীনপ্রায়। এমন সময়ে "আরতি-শঙ্খের ধ্বনি" বাজিয়া উঠিল—সংসারের ছাপ অকিঞ্চিৎকর মনে হইল—তখন "একাকীর একতারা হাতে" চলিলাম "মৃত্যুস্নান-তীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।" "বুঝি এই যাত্রা মোর পূর্ব-ইতিহাসধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে।"

॥ ৫ ॥

আমার জীবনের অকৃতার্থ অতীত তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনা লইয়া আমাকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। হে

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।

মৃত্যুর ধন মৃত্যুকে ফিরাইয়া দিয়া ভারমুক্ত চিরপথিকের অনুগামী আমি হইব।

॥ ৬ ॥

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে।

চরাচরে মুক্তির যে সহজ রূপটি চিরকাল দীপ্যমান, "তারি বর পেয়েছি অন্তরে মোর", তাই আজ নিখিলের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা অনুভব করিতেছি।

॥ ৭ ॥

কিছু পাই নাই, শূন্য হাতে চলিলাম—"এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে।" "ধন্য এ জীবন মোর।" কিছু পাওয়া আর অনেক না পাওয়া "কল্পনায় বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়" মিলিয়া আমার জীবনের পর্বে পর্বে যে সুগভীর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ অনির্বচনীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। আজ বিদায় বেলায় সেই বিপুল বিস্ময়কে স্বীকার করিব। আর গাহিব,

হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,

বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

॥ ৮ ॥

রঙ্গমঞ্চে যখন সবগুলি বাতি নিবিয়া গেল এতদিনকার বিচিত্র সাজসজ্জার নিরর্থকতা বুঝিতে পারিলাম। সেই সব সাজ খসিয়া পড়িতেই "আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা আমারে করিল স্তব্ধ।"

॥ ৯ ॥

দেখিলাম যে এতদিনকার দেহখানা তাহার সুখদুঃখ অনুভূতিপুঞ্জ লইয়া ভাসিয়া মিলাইয়া গেল। "এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের 'পরে স্থলে জলে।" তখন ঊর্ধ্বে তাকাইয়া জোড় হাতে বলিলাম—হে পূষন, তোমার রশ্মিজাল সংবরণ করিয়াছ, এবার তোমার কল্যাণতম রূপটি প্রকাশ করো—এবারে যেন "দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।"

॥ ১০ ॥

হে প্রলয়ঙ্কর, অকস্মাৎ "মৃত্যুদূত এসেছিল···তব সভা হতে।" তোমার কবিকে সেই সভাতে লইয়া গেল, আশা দিল নূতন রাগরাগিণী ধ্বনিত হইবে তাহার বীণায়—কিন্তু

বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে।

কিন্তু এই শেষ নয়—

আসিবে আরেকদিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে

অনন্তের অর্ঘ্যডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

॥ ১১ ॥

এতকাল কবির আসন ছিল "কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে", এবারে সেই আসন পরিত্যাগ করিবার আহ্বান আসিয়াছে। তাই বলিয়া কবিকে যে নীরব থাকিতে হইবে এমন নয়—গভীরতর শিল্পকলার আভাস তিনি পাইতেছেন।

চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে। গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়।

"আজন্মের বিচ্ছিন্ন ভাবনা" এবারে শিল্পলোকে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে।

॥ ১২ ॥

লোকবচনে এতকাল কবিত্বের পুরস্কার মিলিয়াছে, এবারে তাহার অবসান হোক।

পুরস্কারপ্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে ; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে।

সম্মান নয়, নব জীবনের আহ্বান এখন তোমার ঈপ্সার বিষয় হোক।

॥ ১৩ ॥

একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক।

রূপ সেই দুর্লভসত্তা যেখানে তুমি সূর্যনক্ষত্রের সমকক্ষ! তোমার সম্মুখে অনন্ত পথ।

সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।[৩]

॥ ১৭ ॥

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেলো লুপ্তিগুহা হতে" জাগ্রত জগতের ইতিহাসের মধ্যে ফিরিয়া দেখিলাম যে মানুষের হাতে মানুষের নিদারুণ লাঞ্ছনা চলিতেছে। হে "মহাকালসিংহাসনেসমাসীন বিচারক," তুমি আমাকে সেই শক্তি দান করো যাহাতে আমি শিশুঘাতী নরঘাতী কুৎসিত বীভৎসকে ধিক্‌কৃত করিতে পারি।

॥ ১৮ ॥

খৃষ্ট জন্মদিনে রচিত ১৮ সংখ্যক শেষ কবিতাটি সুপরিচিত ঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

প্রান্তিকের কবিতাগুলির এই সংক্ষিপ্ত খসড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কেন না এগুলি এমন ঠাস-বুনন যে অনেক স্থলে পাঠকের বোধ সুপ্রবেশ্য নয়। সাধারণতঃ সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা ঠাসবুনন হইয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীর তুলনায় প্রান্তিকের শ্লোকগুলি অনেক বেশি দৃঢ়-পিনদ্ধ। এই খসড়াগুলির আরও একটা

৩ ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক কবিতাগুলি কিছুকাল আগে লিখিত, তাই এই ভাব-প্রবাহের সঙ্গে তাহাদের আলোচনা করা হইল না।

সার্থকতা আছে। অনবধানে একটি আধটি ধাপও উল্লঙ্ঘিত হইলে ভাবসূত্র অনুসরণে অসুবিধা হয়—কারণ কাব্যখানি আত্মন্ত যুক্তিশৃঙ্খলাসমন্বিত। এ কাব্য আলোচনায় কেবল রসবোধটাই যথেষ্ট নয়, সতর্ক পদক্ষেপও আবশ্যক।

প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুর সম্বন্ধে কবির যে অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল তাহা অভিনব। প্রান্তিকের কবিতাগুলি লিখিবার কয়েক মাস পরে নববর্ষের ভাষণ দান উপলক্ষে এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যু-গুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্ম-পরিচালনার জন্য শরীর-মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি, একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে জীবনকে নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র করে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে এ কথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।… জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখদুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে, এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে: আমাদের যে শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকেই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানবো।[৪]

৪ রবীন্দ্র-জীবনী ৪র্থ খণ্ড, প্রান্তিক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।"—কথাটা কবির কাছে নূতন নয়। ফাল্গুনী নাটকের রাজা মাথায় একটা পাকা চুল দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় যখন অবসাদগ্রস্ত, কবি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে পাকা চুলের উপরে কারিগর নূতন রঙ ফলাইবে—শাদা তাহারই ভূমিকা। এবারে স্বয়ং কবির বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে "রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।" সত্য হিসাবে ইহা পুরাতন হইলেও অভিজ্ঞতা হিসাবে নূতন। ইহাই—এই অভিজ্ঞতাই, এই রিক্ততাই—প্রান্তিক কাব্যের "সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।" কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন যে রিক্ততা যে মাত্রায় পৌঁছিলে পাত্র পুনরায় নূতন সুধায় পূর্ণ হইয়া উঠিবার যোগ্য হয়—এখনো সে ভূমিকা রচিত হয় নাই কবির জীবনে। তাই মৃত্যু-গুহার বাহিরদ্বারে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাকে জীবনলোকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

জীবন ও মৃত্যুর ছায়ালোক ঘুচিয়া গেলে এক "ছুটির মহাদেশে" কবি উপনীত হইলেন। সেখানকার সমস্ত সংস্কার পরিচিত সংস্কার হইতে ভিন্ন। তবু কিছু দূর পর্যন্ত পরিচিত সংস্কারের ভারে পীড়িত কবির অকৃতার্থ অতীত, অন্যত্র তিনি যাহাকে "পশ্চাতের আমি" বলিয়াছেন, তাঁহাকে অনুসরণ করিল; "পিছু ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার।" মৃতকে অনুসরণকারী শ্মশানযাত্রী দলের মতো এই অকৃতার্থ অতীতটাই জীবনের শেষ চিহ্ন। তাহার মুগ্ধ অনুনয় অতিক্রম করিয়া যেখানে পৌঁছিলেন সেখানে জীবনের পুরাতন মূল্যগুলি লোপ পাইয়াছে—সেখানে "বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টি কাজে আমার আহ্বান।" কবি বুঝিলেন "রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।" কিন্তু এখানেই গোল বাধিল। যে-সৃষ্টিকার্যের সহায়তায় কবির আহ্বান দেখা গেল এখনো তিনি সে যোগ্যতা লাভ করেন নাই—"তাই ফিরাইয়া দিলে।"

সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের কবিত্ব মর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে।[৫]

কবি জীবনে কবি, মৃত্যুতে কবি, মৃত্যুর পরপারবর্তী নূতন সত্তাতে কবি। বহু জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার কবি-রূপটি তাঁহার চিরসঙ্গী। কিন্তু নূতন অস্তিত্বের নূতন তান সাধিবার যোগ্যতা যদি না হইয়া থাকে তবে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে; ফিরিয়া আসিতে হইল সেই তান সাধিবার যোগ্যতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে। কবিত্বের মর্যাদা ইহার অধিক টানিয়া লওয়া সম্ভব নয়—প্রান্তিক কাব্যের অভিজ্ঞতারও এখানেই সীমা। অতঃপর যে জগতে তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন তাহা জিঘাংসায় জঘন্য, সর্বমানবের লাঞ্ছনায় বীভৎস। বিশ্বসৃষ্টিকর্তা যদি নূতন তানের অযোগ্য মনে করিয়া কবিকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে এখানে পুরাতন তান সাধিতে হইবে, হয়তো ইহা নূতন তান সাধিবারই ভূমিকা মাত্র—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।[৬]

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায়, বলাকা কাব্য রচনার

৫ ১০ সংখ্যক, প্রান্তিক

৬ ১৮ সংখ্যক—প্রান্তিক

সময় হইতে, এই সর্বমানবসত্তা সর্বদা উপস্থিত। কখনো আভাসে কখনো অতিভাসে, প্রান্তিক কাব্যে তাহার উদ্ভাসন অতিশয় প্রোজ্জ্বল।

এখানে প্রসঙ্গত সেঁজুতি কাব্যের আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রান্তিক কাব্য প্রকাশের কয়েক মাস পরে সেঁজুতি কাব্য প্রকাশিত হয়। প্রান্তিক কাব্য রচনার সময় কবির মন যেভাবে উদ্বেল তাহারই কতক উপচিয়া পড়িয়া সেঁজুতি কাব্যের কয়েকটি কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। বাকি অধিকাংশ কবিতা প্রান্তিকের অভিজ্ঞতার আগে লিখিত। সে-সব কবিতার অনেক-গুলিরই উৎকর্ষ অসামান্য, কাজেই রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনায় তাহাদের স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, বর্তমান গ্রন্থে আমরা কবিকে জানিতে চেষ্টা করিতেছি, কাব্যকে নয়। সেই উদ্দেশ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, আবার অনেক কবিতা, উৎকর্ষের দাবি যাহাদের তেমন নয়, তাহাদের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। উৎকর্ষের মানে যে-সব কবিতা নীচু অনেক সময়ে তাহাদের মধ্যেই কবির প্রকাশ সমুজ্জ্বল, বাড়ির অবোধ ছেলেটির মধ্যে মাতৃস্নেহের প্রকাশের মতো।

প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুর সহিত কবির যে সম্পর্ক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অপরিণতি তথা অপ্রস্তুতির ভাব আছে, আর সেইজন্যই মৃত্যু যখন কবিকে বিশ্বস্রষ্টার সভাগৃহে লইয়া গেল সেখানে কবির স্থান হইল না, তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এই ভাবটি সেঁজুতি কাব্যে প্রবল হইয়া একপ্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে পরিণত হইয়াছে।

> আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়,
> অজানা তীরের বাসা,
> ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
> দূর নীলিমার ভাষা।

সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি—[৭]

কিম্বা—

চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,[৮]

অথবা—

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোন মায়া ![৮]

এ গীতাঞ্জলির কবির ভাষা নয়, ভাব তো নয়ই। গীতাঞ্জলি কাব্যের নিঃসংশয় আত্মসমর্পণ ও অতলস্পর্শ অধ্যাত্ম-বিশ্বাস এই ভাব হইতে বহু দূরে। গীতাঞ্জলি কাব্যের মধ্যাহ্ন আকাশে যে মহিমময় ভাস্করকে অপ্রচ্ছন্ন দেখা গিয়াছিল আজ সায়াহ্ন আকাশে তাহার উপরে অর্ধবিশ্বাসের স্বচ্ছ মেঘখণ্ড আসিয়া পড়িয়াছে ; কিরণ কিছু ম্লান কিন্তু যেন সান্নিধ্যে সুন্দরতর। কবির শেষ জীবনের কাব্যের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রান্তিকে অস্পষ্টভাবে থাকিয়া সেঁজুতিতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সেঁজুতির জন্মদিন কবিতাটিতে কবি যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই প্রান্তিক কাব্যে আছে, ভাব পূর্বতন, প্রকাশ নূতন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো তাঁহার ব্যষ্টি-জীবনের মধ্যে মানুষের সমষ্টি-জীবনের উপলব্ধি।[৯] এই ভাবটিও কবির শেষ

৭ উৎসর্গ—সেঁজুতি

৮ পত্রোত্তর—সেঁজুতি

৯ প্রান্তিক কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতার সহিত জন্মদিন কবিতার

"শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।"

হইতে আরম্ভ করিয়া

জীবনের কাব্যের একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। বলাকার পর হইতে সর্বমানবের জীবনের স্থূলতর সূত্রটি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবনের সূক্ষ্মতর সূত্রের সহিত ক্রমেই বেশি করিয়া জড়িত হইয়া গিয়াছে। ভাবটি তাঁহার মগ্নচৈতন্যে সর্বদা উপস্থিত বলিয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত স্থানেও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।[১০] সর্বমানবচৈতন্য তাঁহার শেষ জীবনের কাব্যের একটি প্রধান উপাদান। সর্বত্রই যে এই বোধটি কাব্যে অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে তাহা নয়, অনেকস্থলেই উপাদান আপন মৌলিক রূঢ়তাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অনেক স্থলেই ভাবটি প্রোপাগাণ্ডার বর্ম পরিয়া দেখা দিয়াছে, তৎসত্ত্বেও তাহার বহুব্যাপ্ত অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় আছে মনে হয় না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে এই শ্রেণীর সর্বশক্তিমান এক একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—সর্বশক্তিমান এই জন্য, যতদিন তাহা বিসর্জিত হইয়া নূতন ভাবকে বেদীতে আসন না ছাড়িয়া দিতেছে ততদিন কবির মনের উপরে তাহাদের অপরিসীম প্রভাব। একসময় এইপ্রকার সর্বশক্তিমান আইডিয়া ছিল "প্রাচীন ভারত ও তপোবন"; তারপরে আসিয়াছে "ভারতবর্ষ"; শেষ জীবনে সমুপস্থিত "বিশ্বমানব" বা "সর্বমানব" বা "মহামানব"। তাই "গ্রামের মেয়ের কলসি মাথায় ধরা" চলতি ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় "যুদ্ধ লাগলো স্পেনে।" আবার প্রান্তিক কাব্যে কবি যখন বলিতেছেন "মৃত্যুদূত এসেছিল···তব সভা হতে," তখনো মগ্নচৈতন্যের মধ্যে, ভূগর্ভে অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মতো সর্বমানবের দুঃখ উদ্বেলিত হইতে থাকে।

"গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"
পর্যন্ত তুলনা করিলেই মিলটা বুঝিতে পারা যাইবে।

১০ চলতি ছবি, সেঁজুতি

সপ্তদশ অধ্যায়

"মধুময় পৃথিবীর ধূলি"

॥ ১ ॥

১৯৩৭ সালের পীড়াকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম গুরুতর পীড়া বলা যাইতে পারে। অল্প দিনেই পীড়ার কবল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু আর পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন মনে হয় না। রুগ্‌ণ দেহে সুস্থ সতেজ মন বহন করিয়া তাঁহার জীবন চলিতে লাগিল। পরবর্তী কয়েক বছরের কবিতার উপরে একটি অপরাহ্লের ক্লান্তির আবহাওয়া। এমন সময়ে ১৯৪০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কালিম্পঙ যাত্রা করিলেন। সেখানে সাতদিনের মাথায় হঠাৎ পীড়িত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থাতেই কলিকাতায় আনা হইল। ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি শান্তিনিকেতনে নীত হইলেন। রোগশয্যায় কাব্যের কবিতাগুলির সূত্রপাত কলিকাতায়; শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই ধারা শেষ হওয়া মাত্র আরোগ্য কাব্যের সূচনা হইল; মাঝখানে সময়ের ছেদ নাই; বরঞ্চ আরোগ্য কাব্যের দু-একটি কবিতা রোগশয্যায় কাব্যের সময়ের সীমার মধ্যেই রচিত। দুইখানি কাব্যকে একটানা একখানি কাব্য মনে করিলে অন্যায় হয় না। একই অভিজ্ঞতার পূর্ব ও উত্তর অংশ মনে করিয়া রোগশয্যায় কাব্যকে পূর্ব আরোগ্য এবং আরোগ্য কাব্যকে উত্তর রোগশয্যায় বলা চলিতে পারে। বস্তুতঃ দুই কাব্যকে এক অখণ্ড অভিজ্ঞতারূপে স্বীকার না করিয়া লইলে খণ্ড বিচারের ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নয়।

আরো একটি কথা। জীবনের এই শেষ গুরুতর ব্যাধির অভিজ্ঞতা

বহন করিতেছে যে কাব্যদ্বয় তাহার সহিত জীবনের প্রথম গুরুতর ব্যাধির অভিজ্ঞতার ধারক-বাহক কাব্য প্রান্তিকের তুলনা মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ তুলনায় নামিলে দেখা যাইবে যে প্রান্তিক ও শেষোক্ত কাব্যদ্বয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন বৎসরের হইলেও ইতিমধ্যে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবির মনে বিপুল ভাবান্তর ঘটিয়াছে। প্রান্তিক কাব্য পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে কবিকে অনুসরণ করিয়া পাঠক মৃত্যুর রহস্যময় গহন গভীর গুহাটার মধ্য দিয়া চলিয়াছে, চারিদিক গম্‌গম থমথমে ভাব। রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যে মৃত্যু বেশ "সহজ সরল।" প্রান্তিক কাব্যে কবি মৃত্যুকে দেখিয়াছেন তাহার অন্ধকার গুহাটার মধ্যে নামিয়া, একান্তে বিচ্ছিন্ন ভাবে; শেষোক্ত কাব্যদ্বয়ে কবি মৃত্যুকে দেখিয়াছেন জীবনের অঙ্গীভূতরূপে, জগতের আর দশটা বস্তুর দিগন্তের উপরে; শেষের কাব্যে মৃত্যু স্বাভাবিক জীবনের সহচর।

এখন এই প্রভেদের কারণ অনুমান দুঃসাধ্য না হইলেও কঠিন। মৃত্যুর প্রথম অতর্কিত আক্রমণে অভিভূতি অস্বাভাবিক নয়। তার পরে তিন বৎসর কাটিয়াছে জীবন ও মৃত্যুর উপত্যকায়; অস্তগামী সূর্যের আলোয় মৃত্যুর উত্তুঙ্গ শিখরের ছায়া ক্রমেই অধিকতর ছড়াইয়া গিয়াছে; নিত্য সমুন্নত শিখর ও তাহার ছায়া জীবনের সদাজাগ্রত অভিজ্ঞতায় পরিণত হইয়া একদিকে যেমন তাহার প্রাথমিক ভয়াবহতা হারাইয়া ফেলিয়াছে তেমনি জীবনের আর দশটা অভিজ্ঞতার ও জগতের আর দশটা বস্তুর সঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়া নিসর্গের নিয়মে পরিণত হইয়াছে। খণ্ডরূপেই মৃত্যু ভীতিবহ, অখণ্ডরূপে নিতান্ত স্বাভাবিক। রোগশয্যায় ও আরোগ্যেও মৃত্যুর সেই স্বাভাবিক রূপ। একদা গহন গভীর মৃত্যুর সহজ সুন্দর মুখচ্ছবি হেরিয়া কবি যেন বিস্মিত পুলকে আত্মজিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"Where is thy sting, oh Death?" রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দর্শনজাত আনন্দ ইহার মূল

প্রেরণা, তাই বলা সম্ভব হইয়াছে "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।"[১]

এই কবিতাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কবি রুগ্‌ণ অবস্থায় কবিতাগুলি মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছেন, পার্শ্ববর্তীগণ লিখিয়া লইয়াছেন। কবিজীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। বাল্যকাল হইতে তিনি যত কিছু লিখিয়াছেন, কল্পনা ও কাব্যের মধ্যে লেখনী ছাড়া আর কেহ দৌত্য করে নাই, এবারে অপর এক ব্যক্তি উপস্থিত। এই অবাঞ্ছিত অনভ্যস্ত উপস্থিতি কবিতাগুলির বহিরঙ্গ গঠনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বরবধূর রহস্যকক্ষে সহচরীর উপস্থিতি উভয়কেই স্বল্পবাক্, মৃদুভাষী ও কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। এক্ষেত্রেও সেই লক্ষণগুলি বর্তমান। কবিতাগুলি অনাড়ম্বর অলঙ্কারবিরল, প্রায়শ অন্ত্যানুপ্রাসহীন, সংযত ও সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃত ভাষায় যে মন্ত্রগুলির সহিত আমরা পরিচিত তাহাদের সঙ্গে এই কবিতার অনেকগুলির যেন মিল। গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ঘনীভূততম রূপ বিন্দুতে সিন্ধু ধারণ করিতেছে। ভাবের তান বিস্তার রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, ছন্দের হাওয়ায় ভাবের মেঘ বিতানিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এ সব কবিতায় তাহার একেবারেই অভাব। দুঃসহ অভিজ্ঞতার চাপে বাষ্পময়া নীহারিকা এখানে নক্ষত্ররূপে সংহত। সেই নক্ষত্রগুলি দৃশ্যত ক্ষুদ্র হইলেও এক একটির মধ্যে বিরাট জগৎ। সেই নক্ষত্রের সৌন্দর্য যেমন মুগ্ধ করে তেমনি তাহার তাপও অনুভূত হইতে থাকে।

১ প্রান্তিকের বিশেষ রসের অন্তর্গত কয়েকটি কবিতা রোগশয্যায় আছে।

(১) অনিঃশেষপ্রাণ (২) এই মহাবিশ্বতলে (৩) গহন রজনী মাঝে (৪) হে প্রাচীন তমস্বিনী (৫) অসুস্থ শরীরখানা (৬) মধ্য দিনে আধো জাগরণে। আরোগ্য কাব্যে এই শ্রেণীর ব্যতিক্রম নাই। ইহাতে প্রকাশ হয় যে রোগশয্যায় কাব্যে যে গ্লানি ও সংশয় ছিল আরোগ্যের কবি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

প্রান্তিক ও এই দুইখানি কাব্যের মতো এত তাপমাত্রা আর কোন রবীন্দ্রকাব্যে আছে মনে হয় না।

॥ ২ ॥

রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যের mosaic-শিল্পকলা। নানা রঙের, নানা আকারের নানা ধরনের পাথরের টুকরা মিলাইয়া যে সমগ্র বস্তুটি গড়িয়া তোলা হয় তাহাকে বলি mosaic-শিল্প। এই দুইখানি কাব্যও সেই রীতিতে গঠিত। এখানেই প্রান্তিকের সঙ্গে ইহাদের আর একটা পার্থক্য। প্রান্তিকে একই অভিজ্ঞতার সূত্র আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বিলম্বিত, তাহা ছাড়া প্রান্তিক স্বগত উক্তি, কবির নিজের প্রতি নিজের ভাষণ, সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত। রোগীর গৃহে চাপাগলায় ফিস ফিস শব্দ—রোগশয্যায় ও আরোগ্য, সেস্থান বহু ব্যক্তির নিঃশব্দ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, সন্তর্পিত পদধ্বনি সেখানে নিজেই নিজের মুখ চাপিয়া ধরে। প্রান্তিকের সঙ্গে ইহাদের মিলের মধ্যে অমিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই অমিলের একটি কাব্যগঠনরীতির পার্থক্য—প্রান্তিক ঢালাই মেঝে, রোগশয্যায় ও আরোগ্য মোজাইক মেঝে। দূর নিকট কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার খনি হইতেই না মোজাইক কাজের পাথরের টুকরাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। দূর দূরান্তে এতকাল যাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া নিরর্থক অবস্থায় ছিল এখন একটি পরিকল্পনার মধ্যে বিধৃত হইয়া সে-সব অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রোগশয্যায় লিখিত প্রথম কবিতাটিতে প্রাচীন দিনের প্রেমের স্মৃতি মনে পড়িয়া গিয়াছে।

যারা বিহান বেলায় গানের খেয়া
আনলো বেয়ে প্রাণের ঘাটে
আলো-ছায়ার নিত্যপাটে,—
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের তুয়ার ঘিরে ;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।[২]

পুরাতন বিচ্ছিন্ন প্রেমের নামগুলি জপমালায় গ্রথিত হইয়া প্রহর যাপনের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। আবার দেখি যে রোগীর পক্ষে ভোরের চড়ুই পাখীটার যাতায়াত, সামান্য ঘটনা, আগে চোখে পড়িত না, এখন তাহা কেমন মাধুর্য- কেমন তাৎপর্য-পূর্ণ।

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শাসির পরে ঠোকর মার এসে
দেখ কোন খবর আছে নাকি।
... ...
অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে তুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।[৩]

কেননা এখন ঐ সামান্য চড়ুই পাখীটাই কবির কাছে জাগ্রত জীবনের প্রতিনিধি—বৃহৎ জীবনযাত্রার সংবাদ বহন করিয়া তাহার আগমন। আবার রোগকক্ষের নিরর্থক এলোমেলোর মধ্যে শুশ্রূষা-কারিণী নারীর আবির্ভাব যখন একটি সুষমা স্থাপন করে তখন তাহাও অর্থপূর্ণ হইয়া জীবনের একটি বাণীকে প্রকাশ করে।

২ ৩ সংখ্যক কবিতা, রোগশয্যায়
৩ ৬ সংখ্যক, রোগশয্যায়

পুরুষ আপন চারিদিকে জমায় আবর্জনা,
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।[৪]

১৪ সংখ্যক কবিতায় দেখি নিষেধ- ও বহু-বাধা-সঙ্কীর্ণ রোগীর ঘরে নারীর আগমন।

কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কি না;
উদ্বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নাই কেন।
চুপি চুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।[৫]

এই তুচ্ছ ঘটনাগুলিও ক্রমে অর্থে ভরিয়া ওঠে।

একদিন বন্যা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেই মতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি,
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধা-ভরা এই কটা দিন।[৬]

একদিন নিদ্রা ভাঙিয়া দেখিতে পান

কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।

কে সে?

স্পষ্ট জানি না'ই জানি,
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।

৪ ১২ সংখ্যক, রোগশয্যায়
৫ ১৪ সংখ্যক, রোগশয্যায়
৬ ১৪ সংখ্যক, রোগশয্যায়

এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।[৭]

কমলালেবুর ঝুড়ি নানা নামের জপমাল্য গাঁথিয়া তোলে কবির মনে।

আবার যেদিন সকাল বেলায় উঠিয়া ফুলদানে গোলাপ ফুল দেখিতে পান, সেই গোলাপ ধীর পদক্ষেপে কবিকে টানিয়া লইয়া যায় বিশ্বের মহা রহস্যের মাঝখানটিতে।

ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।[৮]

আবার কখনো মনে পড়ে

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে এক গুচ্ছ ধূপ,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ।[৯]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরাগুলি পরস্পরের সান্নিধ্যে কেমন তাৎপর্যের অখণ্ডতা লাভ করিতেছে।

আরোগ্য কাব্যে মোজাইক কাজের পাথরের খণ্ডগুলি আরো বিচিত্র, আরো দূর দূরান্ত হতে সংগৃহীত।

৩ এবং ৪ সংখ্যক কবিতা দুটিতে আছে কবিজীবনের পদ্মাবাসের মধুর স্মৃতি, আছে চন্দননগর ও গাজিপুর বাসের সার্থক ছবির টুকরা। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি ছবির টুকরাগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটি বৃহৎ অর্থের আভাস আনিয়া দেয়। আবার কখনো বা রোগশয্যাশায়ী কবির চোখে [ডাকঘর নাটকের অমলের মত] মানবসমাজের বিচিত্র জীবনযাত্রার ছবি আভাসে জাগিয়া ওঠে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

৭ ১৭ সংখ্যক, রোগশয্যায়

৮ ২১ সংখ্যক, রোগশয্যায়

৯ ৩৩ সংখ্যক, রোগশয্যায়

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
... ...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।[১০]

শত শত সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে জীবনাবসানের সান্ত্বনা খুঁজিয়া পান কবি। মানবপ্রবাহের নিত্য অস্তিত্ব আর সাম্রাজ্যের পতন—দুই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কবিকে সান্ত্বনা দেয়। ব্যষ্টি মানুষ মরণশীল, সমষ্টি অমর। সমষ্টির মধ্যে আত্মোপলব্ধিতেই মৃত্যুঞ্জয়িতা।

১৪ সংখ্যকের ভক্ত কুকুরটা আজ তাহার ঘৃণ্য ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া যেন ধর্মরাজের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, নতুবা কেমন করিয়া সে বুঝাইতে পারে যে "সৃষ্টি মাঝে মানবের সত্য পরিচয়।"

১৯ এবং ২০ সংখ্যক কবিতায় যে 'দিদিমণি' ও 'বিশু দাদা'র উল্লেখ দেখিতে পাই তাহারাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যষ্টিকে। দিদিমণিকে দেখিয়া কবি ভাবেন—সে "রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।" আর বিশুদাদার বীর্যবান দেহ স্মরণ করাইয়া দেয়—"সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান, বলের সম্মান।" কমলালেবুর রসে পূর্ণ পাত্রটিতে দেখিতে পান—

সুনিবিড় অরণ্যবীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।[১১]

এই মোজাইক-শিল্পের উপমাটাকে আরও একটু ঠেলিয়া অগ্রসর

১০ ১০ সংখ্যক, আরোগ্য

১১ ২২ সংখ্যক, আরোগ্য

করিয়া লওয়া গেলে দেখা যাইবে যে কাজটি সুসম্পন্ন করিবার পরে পাথরের টুকরাগুলোই যথেষ্ট নয়—আরো দুটি জিনিস অত্যাবশ্যক, প্রেরণা ও মশলা। ঘর্ষণবেগে ও মশলা সহযোগে পাথরের খণ্ডগুলি স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একই ছাঁচের মধ্যে বিধৃত হইয়া উঠিয়া একটি সমগ্রে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও ঘর্ষণ বা প্রেরণা এবং মশলার আবশ্যক হইয়াছে। সেগুলি কি? মৃত্যুর ভয়াবহতা ও রোগের যন্ত্রণা সেই প্রেরণা। আর সর্বমানবের অনন্ত জীবনপ্রবাহের মধ্যে আত্মোপলব্ধির সংকল্প হইতেছে মশলা—যাহা খণ্ড পাথরের টুকরাকে অখণ্ড মেঝেতে পরিণত করিতেছে, ব্যষ্টিকে সমগ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে রূপান্তরে রক্ষা করিতেছে। এ দুটির অভাব ঘটিলে অভিজ্ঞতার টুকরাগুলি তাহাদের রূপ রঙ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া আলাদা থাকিয়া যাইত, অখণ্ড শিল্পের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত না।

মানুষের মনের নিয়ম এই যে বিপুল দুঃখ আকস্মিক একাগ্রতা আনিয়া দেয়—যাহার ফলে সমগ্র জীবন বেদনার বিদ্যুৎ-আলোকে তাহার সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া ওঠে। অতর্কিত মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া, কিংবা ফাঁসির আসামী মৃত্যুর পূর্বরাত্রে জাগত থাকিয়া একটি স্বনির্দিষ্ট অখণ্ড পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখিতে পায়, ক্ষুদ্র ঘটনা বৃহৎ সমূহ স্থান অধিকার করিয়া একটি অখণ্ড প্যাটার্নের মধ্যে গ্রথিত হইয়া হতভাগ্যের সম্মুখে দেখা দেয়। এতকাল যাহা বিস্মৃত ছিল হঠাৎ তাহারা ডুব ভাঙিয়া উঠিয়া পড়ে, দূরায়িত বলিয়া যাহা ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইত হঠাৎ অভাবিত বিপুল কলেবর ধারণ করে, 'জীবনশেষের শেষ জাগরণে' মানুষ জীবনকে বড় সুন্দর বড় অপ্রত্যাশিত রূপগ্রাহী বলিয়া দেখিতে পায়। ইহা মানুষের মনের একটি সাধারণ নিয়ম। রোগশয্যায় ও আরোগ্যের কবিও এই নিয়মের অন্তর্গত হইয়া জীবনকে দেখিয়াছেন। কাব্য দুইখানির ইহাই প্রেরণা—ইহাই সেই ঘটনাবেগ যাহার ফলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার

খণ্ডগুলি এক ও একত্র হইতে পারিয়াছে। প্রান্তিকের সঙ্গে এখানেও আর একটা প্রভেদ। প্রান্তিকের কবি চৈতন্যপ্রবাহের তলে সহসা নিমজ্জিত হইয়াছেন, পশ্চাতে তাকাইবার মুহূর্ত-মাত্র সুযোগও তিনি পান নাই। পরবর্তী কাব্যদ্বয়ে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আসিয়াছে বলিয়া তিনি আগে পিছে তাকাইবার অবসর পাইয়াছেন। প্রান্তিকের অভিজ্ঞতা যেন আকস্মিক ঝঞ্ঝায় নৌকার অতর্কিত নিমজ্জন ; রোগশয্যায় ও আরোগ্যের অভিজ্ঞতার নৌকা রন্ধ্রপথে জল উঠিয়া ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইয়াছে। অভিজ্ঞতার এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—এই পার্থক্যের উপরেই কাব্যগুলির প্রকৃতির পার্থক্য নির্ভর করিতেছে। শেষোক্ত কাব্যদ্বয়ের যুগলতরণী ধীরে ধীরে তলাইয়াছে—নৌকার খোল যখন নদীর তলা স্পর্শ করিয়াছে তখনো তাহাদের মাস্তুলের চূড়ায় উড্ডীয়মান আত্মোপলব্ধির শুভ্র পতাকা বাতাসে আন্দোলিত হইয়া বিলীয়মান অস্তিত্বের জয়ধ্বনি করিয়াছে।

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা,
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।

... ...

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইতে নিশ্চল।

... ...

আলোকের অন্তরে সে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি, তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।

... ...

এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।[১২]

প্রান্তিক কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা; রোগশয্যায় ও আরোগ্য আশ্বিনের চক্রবাত্যা; একটা প্রস্তুতির সময় দেয় না, আর একটায় সে সুযোগ আছে; একটা মগ্নচৈতন্যের কাব্য, অন্য কাব্য দুটি চৈতন্যলোক হইতে অতিচৈতন্যলোকের বার্তাবাহী। ইহাদের মৌলিক প্রভেদ স্মরণ করাইয়া দিয়া পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রোগে যাঁহারা সেবা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন দৈহিকযন্ত্রণা সহ্য করিবার তাঁর কী অসীম ক্ষমতা। শুধু তাহাই নয়, দুর্জয় যন্ত্রণাকে তিনি হাসি মুখে সহ্য করিতেন, শুশ্রূষাকারীগণ পাছে দুঃখ পায় এই ছিল তাঁহার আশঙ্কা। কিন্তু তাই বলিয়া যন্ত্রণার সত্য তো উপেক্ষণীয় নয়—তাহার প্রকাশ থাক আর নাই থাক তাহার অস্তিত্ব তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সময়ে দেহযন্ত্রণার ভোগ তাঁহার কম হয় নাই কিন্তু তাহা নিরর্থক বা নঙর্থক হয় নাই তাঁহার জীবনে। যন্ত্রণার মর্চে-পড়া কুলুপ নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্বর্ণময় প্রকোষ্ঠ খুলিয়া দিয়াছে তাঁর সম্মুখে। নিজের দৈহিক যন্ত্রণার ইঙ্গিতে বিশ্বসৃষ্টি প্রচেষ্টার তলে যে যন্ত্রণা বর্তমান তাহা কবি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
... ...
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।

১২ ২৮ সং, রোগশয্যায়; ৩২ সং, রোগশয্যায়; ৩২ সং, আরোগ্য; ৩৩ সং, আরোগ্য।

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।[১৩]

বিশ্বের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা বিশ্বসৌন্দর্যকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, মানুষের দৈহিক যন্ত্রণার সার্থকতাও কম নয়—

এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।[১৪]

আবার বিশ্বের আদিম অন্ধকার রোগের বিমিশ্র তমিস্রার দেশের রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

হে প্রাচীন তমস্বিনী,
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়
মনে মনে হেরিতেছি—
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে
কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।[১৫]

আবার—

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,

১৩ ৫ সংখ্যক, রোগশয্যায়
১৪ ৫ সংখ্যক, রোগশয্যায়
১৫ ৯ সংখ্যক, রোগশয্যায়

বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।[১৬]

অপিচ—

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে মনে মনে দেখি,
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।[১৭]

এই শ্রেণীর কবিতা আরও আছে, আরোগ্য কাব্যেই আছে, যদিচ সংখ্যায় কম। এই কবিতাগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে কবি নিজের বেদনার উপর বিশ্বপ্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত চরাচরব্যাপী বেদনাকে অনুভব করিতেছেন। হয়তো এই বোধেই দেহযন্ত্রণার কতক উপশম—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ভার, তাহার প্রচণ্ড ঘর্ষণবেগ তো কম নয়। এখন এই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। এক্ষেত্রে প্রভাবের স্বরূপ আগেই বর্ণনা করিয়াছি। জীবনখানির বিচিত্র প্রস্তরখণ্ডগুলি ঘর্ষণের প্রেরণায় নূতন প্যাটার্ন সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, যন্ত্রণার উদ্যত খড়্গের তলে উপবিষ্ট কবির চোখে দৃষ্টির শেষ ঝলকে জীবনটা আর একবার নূতন রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ৩ ॥

এবারে তৃতীয় উপাদান। মৃত্যু তো জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু কোন্ চরিতার্থতা-বোধ মৃত্যুকে সুসহ করিয়া তোলে? রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে মানুষের ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধিতে ব্যষ্টি-জীবনের চরিতার্থতা ঘোষিত হইয়াছে। পরবর্তী কাব্য জন্মদিনে এই ভাবটি আরও ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইয়া একটি ভক্তরূপ লাভ করিয়াছে।

১৬ ১৫ সংখ্যক, রোগশয্যায়

১৭ ২০ সংখ্যক, রোগশয্যায়

রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যেও এই তত্ত্ব বেশ স্পষ্ট। মানুষের সামাজিক সুখদুঃখের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে নিহিত করা যায়—ইতিহাসের ধারার মধ্যে যদি নিজেকে নিক্ষিপ্ত করা যায় —তবে যেন ব্যষ্টিজীবনের লোপ পাইয়াও লোপ পায় না, রূপান্তরে থাকিয়া যায়—এই কথা যেন তিনি বলিতে চান।

আরোগ্য কাব্যের ২, ৩, ৪, ৯, এবং ১০ সংখ্যক কবিতাগুলি এবং রোগশয্যায় কাব্যের ১১ এবং ৩৮ সংখ্যক কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২ সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, জীবন যে রসে রূপে ধন্য হইয়াছে তাহার কারণ

সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

এ মানব চিরমানব, কোন ব্যষ্টি বা ব্যক্তিবিশেষ নয়।

৯ সংখ্যক কবিতায় মানবজীবনের খণ্ড চিত্রগুলি একটি মহৎ মর্যাদার মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া জীবনসমাপ্তির সান্ত্বনা ঘোষণা করিতেছে। কেন না জীবন হইতে বিদায়ের পালাটা একটা সর্বজনীন নিয়ম।

দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।

তারপরে ১০ সংখ্যক কবিতায় কথাটা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে

যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
... ...
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্দ্রধ্বনি।[১৮]

জীবনের এই মহামন্দ্রধ্বনি নিত্যকাল উচ্চারিত হইতেছে, ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র একতারার ক্ষীণ ধ্বনিকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারাতেই ব্যষ্টি জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু ইহাই যদি রবীন্দ্রনাথের মানবজীবন-সার্থকতার একমাত্র ফলশ্রুতি হয় তবে ইহাকে এক প্রকার জড়বাদ বলা ছাড়া উপায় থাকে না, কিন্তু দেখা যাইবে যে ইহাই একমাত্র পথ বা সমাধান নয়। মানুষের দেহময় সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তার পরিপূরক রূপে তাহার চৈতন্যময় সত্তাও স্বীকৃত হইয়াছে একই সঙ্গে।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ অমৃত-রূপে বিশ্বের প্রকাশ।
... ...
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
সে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

আবার

সে চৈতন্য জ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরেগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সঙ্কীর্ণ সীমানায়,
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।

১৮ ১০ সংখ্যক, আরোগ্য

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে—

কিংবা—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি জানি, তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।

আরো আছে—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্;
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।[১৯]

কোন সন্দেহ থাকে না যে এ 'আমি' ইতিহাসপ্রবাহের অন্তর্গত মানুষ নয়, তদতিরিক্ত, তদ্‌ব্যতীত আর কিছু। অতএব দেখা যাইতেছে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে দুটাই সত্য, ইতিহাস-অন্তর্গত জীবনপ্রবাহও সত্য, আবার আনন্দ ও অমৃতের সঙ্গে অভিন্ন আত্মার বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপও সত্য। অর্থাৎ একদিকে মানুষ ইতিহাসের অন্তর্নিহিতভাবে সীমাবদ্ধ, আবার আর একদিকে বিশুদ্ধ চৈতন্যময়রূপে অসীম, তাহার ব্যষ্টিরূপের সার্থকতা আনন্দ ও অমৃতের সাযুজ্য উপলব্ধিতে, তাহার সমষ্টিরূপের সার্থকতা অনন্তপ্রবাহী ইতিহাসাশ্রয়ী মানবজীবনের সামীপ্য অনুভূতিতে। ইহা একপ্রকার Contradiction বা স্বতোবিরুদ্ধতা নিঃসন্দেহ। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ধর্ম ও লক্ষণ। এই বি-সমের সমন্বয় চেষ্টার ইতিহাসই তো রবীন্দ্রকাব্য।

১৯ ২৫ সং, রোগশয্যায়; ২৮ সং, রোগশয্যায়; ৩২ সং, আরোগ্য; ৩৩ সং, আরোগ্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

"আমি পৃথিবীর কবি (?)"

জন্মদিনে কাব্যের প্রকাশকাল ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ, ইহাই কবিজীবনের শেষ পয়লা বৈশাখ, আবার কবির জীবনকালে প্রকাশিত ইহাই শেষ কাব্য। কবিতাগুলি যে সব রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যের পরে লিখিত এমন নয়, কয়েকটি অবশ্য সে রকম আছে কিন্তু অনেকগুলিই ১৩৪৭ সালের (১৯৪০ সাল) গুরুতর ব্যাধির পূর্বে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যসমূহে নিজের জন্মদিবসাশ্রয়ী অনেকগুলি কবিতা আছে, খুব সম্ভব পূরবী কাব্যের পঁচিশে বৈশাখ কবিতায় এই ধারার সূত্রপাত। জন্মদিনে কাব্যে এই ধারাটি একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে। পূরবী কাব্যে যাহা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত, সেঁজুতি কাব্য তথা জন্মদিনে কাব্যে তাহা ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি ডিঙাইয়া একটি বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। শেষ জীবনের জন্মদিনগুলিতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের নবায়মানতার মধ্যে নবায়মান সর্বমানবকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র প্রবাহ বিশ্বজনীন জীবনের বৃহৎ প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কবি আর তেমন নিঃসঙ্গ নহেন। বিশ্বজনকে উপলব্ধির চেষ্টা, বিশ্বজনের সভার ধ্যান রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের একটি ধ্রুব চিন্তা। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে না বুঝিয়া লইলে তাঁহার শেষ জীবনের চিন্তাচেষ্টা মনন বুঝিতে পারা যাইবে না। জন্মদিনে প্রসঙ্গই বিষয়টি আলোচনার উপযুক্ত অবসর।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ-জীবনের পর্বে পর্বে এই রকম এক একটি ধ্রুব চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কবিজীবনের পঁয়ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ

পর্বটায় ধ্রুব চিন্তা ছিল "প্রাচীন ভারত" ও "তপোবন।" যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। তৎপরবর্তী যুগের ধ্রুব চিন্তা "ভারতবর্ষ" বা "ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ"। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, গোরা উপন্যাস ও ভারততীর্থ কবিতায় ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। এই ধ্রুব চিন্তাটির বিশদ ধারণা না হইলে এই সময়কার রবীন্দ্র সাহিত্যের রসাস্বাদন ও মূল্যনির্ধারণ কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহার শেষজীবনের ধ্রুব চিন্তার বিষয় বিশ্বমানব বা মহামানব।[১]

প্রাচীন ভারত ও তপোবন, ভারতবর্ষ বা ঐতিহাসিক ভারত অপেক্ষাকৃত সরল বিষয়, চেষ্টা করিলে কবির বক্তব্য বুঝিতে পারা কঠিন নয়। শেষ জীবনের বিশ্বমানব বা মহামানব সত্যসত্যই দুর্বোধ্য। কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতচূড়ার ন্যায় দুর্দৃশ্য ও দুরারোহ। তার উপরে আবার কবি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করায় ব্যাপারটা প্রায় প্রহেলিকার স্তরে পৌঁছিয়াছে। তৎসত্ত্বেও বিষয়টি যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কবি জন্মদিনে কাব্যের ৬ সংখ্যক কবিতায় বলিতেছেন—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হ'তে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহুযুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হ'ল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে

১ খুব সম্ভব ধ্রুব চিন্তা তিনটি অসংলগ্ন নয়। কবিকল্পনার তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিবর্তিত হইয়া একটি আর একটিতে পরিণত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন স্মরণযোগ্য। "প্রাচীন ভারত তথা তপোবনে"র মানসসন্তান ১৯০১ সালের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ১৯২১ সালের বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়া কবিমনের দিগনির্ণয় যন্ত্রে একটি নূতন সূচনাকে ইঙ্গিত করিয়াছে।

তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

এ "মহামানব" কে? প্রত্যক্ষতঃ ভগবান বুদ্ধ। কিন্তু তারপরে যখন ঐ মহামানব শব্দটিই আর এক প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
... ...
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।[২]

এখন এই দুই "মহামানব" শব্দ কি একই অর্থ বহন করিতেছে? প্রত্যক্ষতঃ নয়। কিন্তু পরোক্ষতঃও কি তাই? পরোক্ষ সাদৃশ্যের সমর্থনে বলা চলে যে শেষ লেখা কাব্যের ৬ সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত মহামানব শব্দটিতে প্রত্যাশার যে পূর্ণতা, জন্মদিনের ৬ সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত মহামানব শব্দটিতে তাহারই আংশিক রূপ। অর্থাৎ আইডিয়ারূপ মহামানব-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ হইতে বুদ্ধরূপ মহামানব। দুই এক বটে আবার এক নয়। কিন্তু একই শব্দকে ভিন্নার্থে ব্যবহারের এখানেই শেষ নয়।

গীতাঞ্জলির কাব্যে অন্তর্গত ভারততীর্থ কবিতায় যখন কবি বলেন —"এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"—তখন মহামানব শব্দটি আবার ভিন্নার্থ গ্রহণ করে, টানিয়া বুনিয়াও ইহার অর্থকে জন্মদিনে বা শেষ লেখার কবিতার অর্থের কাছে লওয়াও যায় না। আরও আছে। একই শব্দ কবির বক্তব্য ও মেজাজ ভেদে কখনো ঘন কখনো লঘু ছায়াতপ গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছে, কোন একটি বিশেষ অর্থের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক,

২ ৬ সংখ্যক কবিতা, শেষ লেখা।

দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রীগণ যেমন একটি শব্দকে একটি মাত্র অর্থে ব্যবহার করেন কবির পক্ষে বোধ করি তেমনটি সম্ভব নহে। তাই কবির উক্তি হইতে তত্ত্ব নিষ্কাশন কঠিন! এখানে আমরা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত মহামানব শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি।

আমি বলছি আমাদের একদিকে অহং আর একদিকে আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয় কর্ম মামলা মোকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই, সেই আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুইই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলছি যখন আমরা অহংকে একান্ত আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন বিচ্ছেদ ঘটে।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা।
আপনার মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা॥
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে।
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে॥

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর গভীর গুহা গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্তপ্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা—নানা নাম দেই তাকে। অহংএর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে

তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময় সেই অহংএর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে, উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করলো। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্য দিয়ে। এই যে ডাক পড়লো, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়।
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়॥

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।"[৩]

এখানে উল্লিখিত "সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ"—স্পষ্টতঃ পরমাত্মন্ বা ব্রহ্মণ। অন্য অর্থে ইহাকে চালাইবার পথ কবি সযত্নে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই মহামানব, ভারততীর্থের ও জন্মদিনে তথা শেষ লেখার মহামানব হইতে ভিন্ন।

এবারে কবির আর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উক্তি দেখা যাক্।

শরীর ভালো থাকিলে সন্ধ্যায় কবি নানারকম আলোচনা করেন:

জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের কথা উঠায় একদিন বলিলেন—'মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মতো, কী ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, একদল মানুষ এইসব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে। এই যে তোমার মনে, আমার মনে বাজছে—আরও কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে—এর কারণ কি? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই।...আমার চিন্তা এবং অনুভূতিতে টের পাই, একটা বিরাট মানবসত্তা আছে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জুড়ে। সে সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা।...

সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভালোর জন্য একটা তাগিদ আছে। সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে কম বেশি প্রতিবাদ আছে।... বিরাট মানবসত্তার মধ্যে সব কালকে জড়িয়ে অনন্তকাল ধরে যে ভালোর তপস্যা চলেছে, ঐ সব মানুষের মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে চলেছে তারি ক্রিয়া।

কিন্তু সে ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে মানুষ সেই বিরাট মানবসত্তার

৩ মানুষের ধর্ম, র-র—বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪২৪-২৬

পরমলক্ষ্যের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর না হতে পারে—সে চলে যায়, সরে যায়। আমগাছে মুকুলের অজস্রতা ঘটে। কিন্তু সেই অগণ্য মুকুলের মধ্যে যারা ফলের পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়ে ঝরে যায় মরে যায়, তাদের কথা কেউ ভাবে না…।' ইহাই হইতেছে প্রাকৃতিক ঘটনা—প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাহারা উঠিল না—তাহারা গেল অতলে। জগতে দেখা যায় মহৎদেরই লোকে স্মরণ রাখে। এই মহৎ কে? কবি বলিতেছেন—'বহুযুগ ধরে যে মনের সত্তা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নিয়ে রয়েছে তারই পরম লক্ষ্যের দিকে যখন কোন মানুষের মনুষ্যত্বের পরিণতি সার্থক হয়েছে তখন তিনি হয়েছেন মহৎ। তাঁর বিনাশ নেই, তিনি পৌঁছেছেন পরম সত্যে।' এই প্রাকৃত এবং মহতের মধ্যে বহুস্তরে বহু মানবের উদ্ভব হয়। 'সংসারে যাঁরা কিছু ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিম্বা এক একটা বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা জীবজগতের মধ্যে নিশ্চয়ই এক একটি পর্যায়ের এক একটি পঙক্তিতে কেউ এতটুকু বড়ো, কেউ অতটুকু বড়ো হয়েছেন সেটা মনের এবং সেইদিক দিয়ে ইনটেলিজেন্সের একটা ক্রমবিকাশের ফল বলতে পারো। কিন্তু তাঁরাও আমি যে মানবাত্মার কথা বলছি সেই বিরাট আত্মার লক্ষ্যের অন্তর্গত নন।' এই শ্রেণীর প্রতিভাবানদের সম্পর্কে কবি বলিলেন যে কালের বুকে ইহাদের স্মৃতিও মুছিয়া যায়। 'কেন না তাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা সবই কেবলমাত্র জীবলোকের এক একটা দিকের অনন্যসাধারণতার অন্তর্গত।' কবির মতে, 'মানুষের যেটা পরম সার্থকতা সেটা আত্মার অনুভূতিতে। সেই বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যে মানুষের একাত্মতার অনুভূতি এবং উপলব্ধি যত গভীর সেই মানুষ ততটাই সত্য।…যে মানুষ আত্মার রাজ্যে সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতাকে না উপলব্ধি করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন করে ব্যর্থ হয় ফল-না-হওয়া কত ফুল, তাদের সুখদুঃখের পর্ব ক্ষণিকতার মধ্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থেকেই কালের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।' কবির বিশ্বাস এই শ্রেণীর মহামানব বা মহাত্মা যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম, 'তাঁরা ভবিষ্যতের লোকে রচনা করেন তাঁদের আসন, যে আসন থেকে কেউ তাঁদের নামাতে পারে না।…তাঁরা সাময়িক সুখ-দুঃখকে নির্ভয়ে আনন্দে জলাঞ্জলি

দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্থির করেছেন তাঁদের সাধনা।'
কবিজীবনের শেষ পৌষ-উৎসবের এই দুইটি দিন স্মরণীয়।[৪]

এই অংশে ব্যবহৃত মহামানব মানব-আইডিয়ার ঘনীভূত ও পরিপূর্ণতম রূপ কাজেই "কবির বিশ্বাস এই শ্রেণীর মহামানব বা মহাত্মা যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম—।"

এবারে আর একটি অংশ—

'মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এশিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদপ্রধান বলে খর্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী, সত্যকে যে শ্রদ্ধা করে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার নিষ্ঠা আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করছে তাদের।

পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।[৫]

উপরিউক্ত অংশের মহামানব নিশ্চয় পরমাত্মন্ নন—তিনি আইডিয়াল ম্যান, বা ইউনিভার্সাল ম্যান, খুব সম্ভব "ঐ মহামানব আসে" গানের মহামানব। এবারে আরও একটি অংশ—

১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি এখানে কেন এসেছো? আমি বলেছিলুম—য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি। য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে, প্রাণের আলো জ্বলছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানাদিকে প্রকাশ করছে।

---

৪ শেষ সফর—১৯৪০ সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭

৫ পারস্যে, র-র, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২

> সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম—পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসীক তাকেই দেখতে এসেছি। তাকে দেখবার কোন আশা থাকে না, দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এলো তখন আর একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হল।[৬]

এখানে স্পষ্টতঃ মহামানব শব্দটি ব্যবহৃত না হইলেও সেই অর্থেরই ইঙ্গিত করিতেছে। এ মানুষও মনুষ্যের পূর্ণ জাগ্রত মূর্তি।

এবারে এই সব ভিন্নার্থে ব্যবহৃত শব্দ ও উক্তিগুলি নির্গলিত করিলে, যতই প্রচ্ছন্ন হোক না কেন একটা অর্থের আভাস দেখা দিতে থাকে, যদিচ তাহার মধ্যে ছায়াতপের ঘনত্ব ও লঘুত্ব সর্বত্র সমান নহে।

মহামানব বলিতে কখনো তিনি বুঝিয়াছেন পরমাত্মন্, কখনো বুঝিয়াছেন বুদ্ধের মত মহাপুরুষ, কখনো বুঝিয়াছেন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, বুদ্ধের মত মহাপুরুষে যাঁহার আংশিক বিকাশ। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দেশ ও কালের সংস্কার অতিক্রম করে—ইহার মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব আছে, ইহাকেই কখনো কখনো তিনি Universal Man অভিহিত করিয়াছেন। আবার কখনো তিনি ইতিহাসের অন্তর্গত মনুষ্যপ্রবাহকেও মহামানব আখ্যা দিয়াছেন। পারস্যে গ্রন্থে যখন তিনি বলেন যে

> মহামানব জাগেন যুগেযুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধ'রে এশিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে! আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে।

তখন এই মহামানব বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষও নয়, আবার বিশ্বজনীন মানবও নয়—মানবপ্রবাহের একটি রূপ যাহার উপরে মনুষ্যত্বের আলো উজ্জ্বল ভাবে পড়িয়াছে। আবার যখন তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেন—

৬ পারস্যে, র—র, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯

> ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি এখানে কেন এসেছ? আমি বলেছিলুম, য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি। য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে,...তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানাদিকে প্রকাশ করছে।

এ মানুষও ইতিহাসের অন্তর্গত মানবপ্রবাহ—বর্তমানে মনুষ্যত্বের আলোতে সমুজ্জ্বল। তবে আদর্শ মানুষের সঙ্গে ইহার যে একেবারে সম্বন্ধ না আছে তাহা নয়, আদর্শ মানুষ বা পূর্ণ মনুষ্যত্বের আংশিক প্রকাশ ইহার মধ্যে, যেমন বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষের মধ্যে বৃহৎ এক অংশের প্রকাশ।[৭]

এখন, মহামানব বা বিশ্বমানবের যে চারটি ধারায় উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে তিনি সমধিক একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন তাহা বলা সহজ নয়। মন ও মর্জিভেদে চারটির সঙ্গেই তিনি কখনো না কখনো একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন তবে ইতিহাসান্তর্গত মানবপ্রবাহের উপরেই যেন তাঁহার টান অধিক। আরোগ্য কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় এবং জন্মদিনে কাব্যের 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—কবিতা দুটি এই কারণেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সোনার তরীর বসুন্ধরা কবিতাতেও এই টান আছে—কিন্তু এ দুই টানে প্রভেদটাও স্পষ্ট। বসুন্ধরা কবিতার চরাচরব্যাপী ও জন্মজন্মান্তরব্যাপী পটভূমিতে মানুষের স্থান নিতান্ত গৌণ—মানুষ আর সমস্তর মধ্যে, আর সমস্তর মতো একটা উপলক্ষ্যমাত্র। কিন্তু শেষোক্ত কবিতা দুটিতে মানুষ আর উপলক্ষ্য নয়—একক লক্ষ্য। কিন্তু ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়, শেষ জীবনের কাব্য সমূহে এ-হেন প্রমাণ যত্রতত্র।

৭ এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মনুষ্য সন্ধান স্মরণযোগ্য। অনুশীলন, দেবী চৌধুরাণী ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রচেষ্টার চেয়ে কম Real নয়, তবে যে তাহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে না তাহা দেশের দুর্ভাগ্য।

শেষ জীবনে কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বিরাট মানবপ্রবাহের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া তুয়ের ঐক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছে নিজের জীবনকে বিরাট জীবনপ্রবাহের অংশরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে অমরত্বের স্বাদ যেন পাওয়া সম্ভব। এই জন্যেই শেষ জীবনের কাব্যে নিজের কথা, নিজের সুখতুঃখ বিবৃত করিতে বারংবার তিনি বিশ্বজীবনকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর চিন্তার এই সূত্র অনুসরণ করিয়াই যেন তিনি নিজের জন্মদিন ও মানুষের জন্মদিনকে, এক্ষেত্রে পয়লা বৈশাখকে একীভূত করিয়াছেন।[৮]

শুধু জন্মদিনে কাব্যের সীমানার মধ্যে বিষয়টিকে দেখিলে ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না, এই প্রসঙ্গে শেষজীবনের অনেকগুলি কাব্যের সাক্ষ্য তলব করিতে হইবে। দেখা যাইবে যে কেবল নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবনে নয়, সংসারের অন্যান্য ক্ষুদ্র ঘটনার উপরেও বিশ্বমানবের ছায়া পড়িয়া সমস্ত একটা গুরুত্ব, একটা বিরাটত্ব লাভ করিয়াছে। এমন কি কাহিনী শ্রেণীর কবিতার উপরেও বিশ্বমানবজীবনের চলতি মেঘের ছায়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। নববিবাহিত যুবক তাহার বন্ধুর কাছে নবীন প্রেমের রহস্যব্যাখ্যায় উন্মত্ত—এমন সময়ে

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।[৯]

ব্যক্তিগত জীবন যত সামান্যই হোক তাহা স্বতন্ত্র নয়, বিশ্বজীবনের

৮ শেষ জীবনে তিনি পঁচিশে বৈশাখের উৎসবকে পয়লা বৈশাখ পালন করিতেন। ব্যাপারটাকে কেবল ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না, ভিতরে একটা গভীর সত্য ছিল মনে হয়। আমাদের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে পঁচিশে বৈশাখকে পয়লা বৈশাখে মনে মনে আনিয়া ফেলিবার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

৯ অপঘাত, সানাই।

স্রোতে ভাসমান—এ বোধ কবির শেষ বয়সের ধ্রুব চিন্তার অন্তর্গত।

আবার হঠাৎ গাঁয়ের চলতি ছবি আঁকিতে আঁকিতে তাঁহার কলম লিখিয়া ফেলে

যুদ্ধ লাগল স্পেনে ;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নী বাণ হেনে।[১০]

কবি বলেন যে এই খবরেই পৃথিবী মুখর

কিন্তু যাদের নেই কোন সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই-যে লক্ষ-কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।[১১]

একই প্রসঙ্গে নবজাতক কাব্যের নিম্নোক্ত কবিতাগুলি স্মরণীয়। প্রায়শ্চিত্ত, বুদ্ধভক্তি, হিন্দুস্থান, রাজপুতানা, পক্ষীমানব, আহ্বান (কানাডার প্রতি)। সমস্ত কবিতাগুলি বৃহৎ জীবনের ছায়াতপ-পাতে ডোরা কাটা।

এই ছায়াতপ-পাত হইতে তাঁহার জন্মদিনটিও মুক্ত নহে।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।[১২]

আবার যেদিন কঠিন পীড়ার পরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে থাকে কবির প্রথমেই মনে পড়ে

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তি-গুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময় ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরি-গহ্বরের তটে,...[১৩]

জন্মদিনে কাব্যের অনেকগুলি কবিতাই বৃহতের ছায়াপাতে বিচিত্র।

১০ চলতি ছবি, সেঁজুতি

১১ চলতি ছবি, সেঁজুতি

১২ জন্মদিন, সেঁজুতি

১৩ ১৭ সংখ্যক, প্রান্তিক

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়াছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়াছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে।
… … …
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নব জন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।[১৪]

আবার—

কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে ;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী ;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চেতনার ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্র দলে
পরিয়াছি সাজ।[১৫]

এখানে কবি নিজ জন্মদিবসের মুক্তাটিকে সমগ্র মানবসমাজের মতো আবির্ভাবের মুক্তাপঙ্ক্তির সহিত গাঁথিয়া বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন। এই কাব্যের ১৬, ১৮, ২১, ২২ প্রভৃতি কবিতায় বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখকেই নূতন নূতন রূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১৪ ৩ সংখ্যক, জন্মদিনে

১৫ ৫ সংখ্যক, জন্মদিনে

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহার শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।[১৭]

আবার—

নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তূলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।[১৮]

কিন্তু—

মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।[১৯]

অথবা—

সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।[২০]

পুনরায়—

অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা মাঝে
মর্ত্যজীবনের কাজে।[২১]

অপিচ —

সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে

১৭ ১ সংখ্যক, জন্মদিনে।
১৮ ২ সংখ্যক, জন্মদিনে।
১৯ ৯ সংখ্যক, জন্মদিনে।
২০ ১১ সংখ্যক, জন্মদিনে।
২১ ১২ সংখ্যক, জন্মদিনে।

তমসের পরপার,
যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
... ...
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।[২২]

এই সঙ্গে শেষ লেখা কাব্যের প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলির সাক্ষ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।[২৩]

আবার—

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।[২৪]

রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা জড়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাদের অন্ধের যষ্টি নিম্নোক্ত শেষলেখা কাব্যের কবিতা দুটি।

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।[২৫]

২২ ১৩ সংখ্যক, জন্মদিনে।
২৩ ১ম সংখ্যক, শেষ লেখা।
২৪ ৭ম সংখ্যক, শেষ লেখা।
২৫ ১১ সংখ্যক, শেষ লেখা।

এই কবিতাটির সাক্ষ্য নূতন কিছু নয়, জগৎকে কখনোই কবি অস্বীকার করেন নাই। আমরাও এমন কথা বলি না, আমাদের বক্তব্য : জগৎ ও জগৎ-অতীত একবার মাত্র, গীতাঞ্জলি পর্বে তাঁহার কাব্যে মিলিয়াছে—পরবর্তী কালে এই মেলবন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে —কিন্তু কোনটাই অস্বীকৃত হয় নাই।

আবার—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের নিরীশ্বরবাদিতা যাঁহারা প্রমাণ করিতে চান, কিম্বা যাঁহারা ততদূর যাইতে রাজী নন, বলেন যে তিনি দুর্জ্ঞেয়বাদী বা Agnostic, তাঁহাদের কবিতাটির সাক্ষ্য বড় প্রিয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই, দুটি চারটি জেরা করিলেই সাক্ষীকে Hostile ঘোষণা করা তাঁহাদের কর্তব্য হইবে। উপনিষদুক্ত যে ব্রহ্মকে "অবাঙ্‌মনসোগোচর" বলা হইয়াছে, "অপ্রাপ্য মনসাসহ" বলা হইয়াছে—এখানে সেই চির রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় সত্তার আবির্ভাবটাই ঘোষিত হইয়াছে। "প্রথম দিনের" ও "দিবসের শেষ সূর্য" যদি সেই রহস্যভেদ করিতে অক্ষম হয় তবে স্মরণ করা কর্তব্য যে

২৬ ১৩ সংখ্যক কবিতা, শেষ লেখা

উপনিষদের ঋষিগণও সক্ষম হন নাই। বস্তুতঃ জড়বাদ, যাহার সব রহস্যই গণিতে গণনীয়, সেই জড়বাদ হইতে এই কবিতাটির দূরত্ব দুস্তরতম। জড়বাদ যদি কুমেরু হয় এই কবিতাটি চৈতন্যবাদের সুমেরু

এতক্ষণ যে সব কবিতা উদ্ধার করিলাম তাহার আসল উদ্দেশ্য বৃহৎ মানবসমাজের মধ্যে কবিসত্তার আত্মীয়তা উপলব্ধির যে আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছি তাহারই অপর একটি লীলাকে প্রদর্শন, যেখানে তিনি নিজের মধ্যে অব্যক্তকে, বিশ্বচরাচরের মধ্যে অনন্তকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে অনুভব করিতেছেন। এই দুটির মিলন প্রচেষ্টাতেই কবিসত্তার ভারসাম্য, এই দুটির বোধেই বিশেষজ্ঞ পাঠকের রসমুক্তি। কিন্তু ইহাই এই বিষম প্রচেষ্টার সব নহে। আরও কিছু আছে— আর আমার মতে তাহাতেই রবীন্দ্রকাব্যের ফলশ্রুতি।

আমরা আগে অনেকবার বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের কবিমন সীমা ও অসীমের বিপরীত কোটিতে আঘাত করিয়া চলিতে থাকে। এই চলিবার পথটাই রবীন্দ্র-সরণী। শেষ দিকের কাব্যে, আগের দিকের কাব্যের মতোই, দুই কোটিতে আঘাতের চিহ্ন আছে। আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষলেখা কাব্য তিনখানি হইতে কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপার কি আর একবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আরোগ্য কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা 'ওরা কাজ করে' নামে বিখ্যাত। এই কবিতাটি লওয়া যাক। কবিতাটি পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের কবিমন কবিজীবনের শেষে এই কবিতাটিতে সীমার কোটিতে শেষ বার আঘাত করিয়াছে—আর শুধু তাহাই নয়, তাঁহার কবিমন সীমার কোটির এত নিকটে আগে আর কখনো আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, সীমার কোটিকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করিয়াছে কিনা সন্দেহ, সীমার কোটি বলিতে যে প্রাত্যহিক সংসার বোঝায় তাহার সহিত ক্ষণকালের জন্য হইলেও তাঁহার নিবিড়তম আত্মীয়তা ঘটিয়া গিয়াছে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন, গুন গুন স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

সর্বনাম মাত্রে পরিখ্যাত "ওরা" শব্দটি লক্ষণীয়, কেন না তাহার আর কোন পরিচয় নাই। চৈতালি কাব্যের 'সামান্য লোক' কবিতাটিতে অতীতের নেপথ্য হইতে বহির্গত মানুষটির সঙ্গে যে ঐতিহাসিক কৌতূহল বা অতীতের রোমাঞ্চ জড়িত এখানে তাহারও অভাব। নিঃশব্দ নিরাড়ম্বর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ওরা জীবনের জের টানিয়া চলিয়াছে—দুই দিকে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের উপত্যকার মধ্যে পরিচয়হীন জৌলুসহীন প্রাত্যহিক কর্মরত এই ওরা। এই ওরা একেবারেই নিঃসপত্ন, প্রত্যহের ভূমিকার মানুষ ছাড়া ইহাদের আর কোন পরিচয় নাই—কোন বৃহত্তর, মহত্তর ভাবের আভাস ইহাদের উপর পড়িয়া প্রত্যহাতীত কোন মহত্ত্ব বা সান্ত্বনা দান করে নাই ইহাদের। তুলনায় বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে আশা করিয়া অন্য একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করিতেছি।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরই মতন শুচিবসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার 'পরে।[২৭]

এখানেও 'ওদের' কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু এই 'ওরা' আর আরোগ্য কাব্যের 'ওরা'তে কত প্রভেদ। গীতাঞ্জলির ওরার সহকর্মী স্বয়ং ভগবান আর সেই কারণেই তাহাদের উপরে প্রত্যহাতীত জগতের আভাস পড়িয়া সীমার কোটির মানুষকে প্রায় অসীমের কোটিতে টানিয়া উঠাইয়াছে। তুলনায় আরোগ্য কাব্যের 'ওরা' নামগোত্রহীনের দল, তাহারা যেন বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত ফুটনোট। অমনোযোগী পাঠকের চোখে পড়ে না বটে কিন্তু বৃহৎ ঘটনাগুলির মূলীভূত প্রসঙ্গ ঐখানেই। এই দুটি কবিতা সম্পর্কে আর একটি গুরুতর বক্তব্য আছে। গীতাঞ্জলি কাব্যের "ওরা" পাঠকের নিত্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়, শেষোক্ত কবিতার "ওরা" বটে। এই কথা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অনেক কবিতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাঁহার শেষ জীবনের অনেক কবিতা উচ্চতর পদবী হইতে প্রত্যহের ভূমিতে নামিয়া আসিবার ফলে পাঠকের বড় পরিচিত, বড় প্রিয়; পাঠক ও এই সব কবিতা যেন একই জগতের অধিবাসী, একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, দুয়েরই অবস্থান সীমার কোটিতে। তাঁহার শেষ জীবনের কবিতা কাব্যোৎকর্ষের বিচারে মহত্তর না হইতে পারে কিন্তু পাঠকের যে প্রিয়তর তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৭ ১১৯ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি

এবারে জন্মদিনে কাব্যের একটি কবিতা লওয়া যাক। এই কবিতাটির বিষয় আরোগ্য কাব্যের "ওরা কাজ করে" কবিতা হইতে খুব ভিন্ন নয় কিন্তু গোড়ায় একটা মস্ত ভেদ আছে। আরোগ্য কাব্যে অঙ্গাঙ্গী মিলন, সীমার কোটিতে সোৎসাহে নিবিড় আঘাত; আর জন্মদিনে কাব্যে—সীমার কোটির মধ্যে কবিজীবনের সার্থকতা লাভে চরম ব্যর্থ কবির শেষ দীর্ঘনিশ্বাস। ইহা কবির পরাজয়ের স্বীকারোক্তি। তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যহের জগতের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া সঙ্গীত সাধনায় চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নাই—কিন্তু

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে।
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।[২৮]

কবির এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির অর্থ এই যে প্রত্যহের জগৎকে বারে বারে স্পর্শ করিলেও, মনে মনে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার

২৮ ১০ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে

করিলেও 'জীবনে জীবন যোগ করা' তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি সে জগতের অতিথি, অধিবাসী নন। তাই তাঁহার সুরে রহিয়া গেল অপূর্ণতা, রহিয়া গেল সর্বত্রগামিতার অভাব। জীবনশেষে, সীমা-অসীমের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের অবসানে আপন পরাজয় বার্তা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়া কবি আহ্বান করিয়াছেন

> এসো কবি অখ্যাত জনের
> নির্বাক মনের।
> ... .

তিনি আশা পোষণ করিয়াছেন—

> ওগো গুণী
> কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
> তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
> তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
> আমি বারংবার
> তোমারে করিব নমস্কার।

সীমার জগতের কবিকে স্বারাজ্যে আহ্বান করিয়া সীমার জগৎ হইতে, সীমার জগতে কবিজীবনের সার্থকতা লাভের শেষ আশা হইতে কবি চরম বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এবার হাতে রহিল একমাত্র অসীম।

শেষ লেখা কাব্যের শেষ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবি-জীবনের শেষ কবিতা। ১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে বেলা সাড়ে নয়টায় কবিতাটি রচিত। তার পরেই কবির দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ হয়—ক্রমে জ্ঞান লোপ পায়, সে জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। আর কোন কারণে না হইলেও শুধু এই কারণেই অপরিসীম মূল্য। কিন্তু এই মূল্য ছাড়াও অন্য গুরুত্ব আছে কবিতাটির। কবিতাটির অর্থ কি?[২৯]

২৯ অনেকের সঙ্গে কবিতাটি লইয়া আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারা যে অর্থ করেন তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। অব্যবহিত পূর্বে লিখিত, আগের দিনে

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।

এখন প্রশ্ন, এই ছলনাময়ী কে? ইহার যথাযথ উত্তরের উপরেই কবিতাটির অর্থ নির্ভর করিতেছে। "ছলনাময়ী" যে-ই হোক, দেখা যাইতেছে যে তাহার অধিকার চরাচরে প্রসারিত—

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

একদিকে পাইতেছি

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে

পাইতেছি

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

আবার আর একদিকে পাইতেছি

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়

আবার একেবারে শেষে পাইতেছি

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বিকালে, "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে"—কবিতাটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে দুটি কবিতাকে হঠাৎ সমার্থক মনে হয়—কিন্তু ধীর বিচারে তাহার অসম্ভবতা ধরা পড়ে। প্রথম কবিতাটি দুঃখ সম্পর্কিত, পরবর্তীটিকে, দুই কবিতার মধ্যে image ও শব্দের সাম্য সত্ত্বেও সেরূপ মনে করা চলে না।

এই রহস্যময়ী ছলনাময়ী কে?

ভগবান্ অবশ্যই নয়। ভগবানকে স্ত্রীপ্রত্যয়ে ছলনাময়ী বলিতে যাইবেন কেন, ভগবানকে রমণীরূপে কল্পনা রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ নয়। ছলনাময়ী ব্যাধি বা দুঃখ নয়, কেন না সে রকম ক্ষেত্রে "তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়" নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঐ একই কারণে ছলনাময়ী কোন নারী বা লীলাসঙ্গিনী হইতে পারে না। তবে কে সে? আমার মতে বিশ্বপ্রকৃতি অর্থে ছলনাময়ীকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিশ্বপ্রকৃতিকে ছলনাময়ী স্বীকার করিলে "তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়"—অর্থযুক্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু আর একদিকে নিদারুণ অনর্থের আশঙ্কা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বপ্রকৃতিকে কখনো ছলনাময়ীরূপে দেখেন নাই, বরঞ্চ তাহাকে মাতা ও সখীরূপে দেখিয়াছেন; তাঁহার চোখে বিশ্বপ্রকৃতি ভগবানের বিভূতিতে পূর্ণ বলিয়া মাধুর্য-, কল্যাণ- ও সৌন্দর্য-ময়। এতদিনের এতগুলি বাধা অতিক্রম করিয়া ছলনাময়ীকে বিশ্বপ্রকৃতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব? আমি তো উপায়ান্তর দেখি না। অভিধান ও ব্যাকরণের শাসন যদি অস্বীকার না করা যায়, শব্দকে যদি তদর্থে গ্রহণ করিতে হয় তবে ছলনাময়ী একটি মাত্র সত্তার প্রতি অবিচলিত ইঙ্গিত করিতে থাকে—তাহা বিশ্বপ্রকৃতি। কবিজীবনের দীর্ঘ ও অজস্র উক্তির সহিত এই মৃত্যুপূর্ব-স্বীকারোক্তির সঙ্গতি হোক বা না হোক ছলনাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন এই অর্থ স্বীকার করিয়া লইলে দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে অস্বীকার না করিয়াও তাহাকে প্রাকৃত বিশ্বে "বিচিত্র ছলনাজাল" ও "মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ" রচনায় অভিযুক্ত করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন তাহার ছলাকলার

> প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
> তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

কিন্তু এখানে যদি শেষ হইত তবে তো দুর্দশার অন্ত থাকিত না।

কবি বলিতেছেন প্রকৃতির মায়াজালকে যে অতিক্রম করিতে পারে,

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।

আর কি হয়, না

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।[৩০]

প্রাকৃত বিশ্বের ছলনা সহ্য ও অতিক্রম করার দ্বারাই শান্তি লাভের অক্ষয় অধিকার জন্মে।

আমাদের এই ব্যাখ্যা যদি স্বীকৃত হয় তবে দাঁড়ায় এই রবীন্দ্রনাথ সীমাকে স্বীকার করিয়াও সীমার মায়াকে অস্বীকার করেন। মায়াবাদী সীমার কোটিকেই অস্বীকার করে, তাহার জগৎ নির্বিকল্প অসীমের জগৎ। রবীন্দ্রনাথ সীমাকে স্বীকার করেন আবার স্বীকার করেন না। তাঁহার ধারণা হইতেছে যে মানুষের অসীমের এডভেঞ্চারের পথে সীমা একটা অত্যাবশ্যক বাধা। নানারূপ "ছলনাজাল" ও "মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ" পাতিয়া মানুষের অসীমোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে উস্কাইয়া দিতেছে। যে সেই মায়াজাল অতিক্রম করিতে পারে,

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের পথে এই মায়াজাল একান্ত আবশ্যক। ইহা আছে বলিয়াই মানুষ ইহাকে লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা

৩০ উপরিউক্ত তিন ছত্রের যথাযথ গদ্য এইরূপ হইবে মনে হয়: "অনায়াসে তোমার হাতে যে ছলনা সহিতে পেরেছে সে শান্তির অক্ষয় অধিকার পায়।"

করে—সেই চেষ্টার ফলে অতর্কিতে সে অসীমের মুখোমুখি হইয়া পড়ে—ইহাতেই অক্ষয় শান্তি। ইহা অন্তিম নিশ্বাসে ঘোষিত কবির বাণী হইলেও ইহা যেন পূর্বকল্পিত নয়, জীবন-মৃত্যুর চৌকাঠে হুঁচোট খাইয়া এই সত্যটিকে অতর্কিতে তিনি লাভ করিলেন। ইহা যেন সুদীর্ঘ সমগ্র কবি-জীবনের একটা "আফটার-থট্।" অসীমের কোটির অভিযাত্রার পথে এই জন্মে এই পর্যন্তই তাঁহার অভিসার।

উপসংহার

রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ

মুক্তবেণী

রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ নামে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কি ভাবে ও কোন্ ক্রমে প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্মের উপলব্ধি ঘটিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। কলিকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন এই তিন রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ, কিম্বা প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্ম এই তিন মূল উপাদান রবীন্দ্রসাহিত্যের। উপলব্ধির কাল ও গুরুত্ব বিচারে প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্ম এই পর্যায়ে উপাদানগুলি সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। তবে একটু বিশেষ আছে। প্রকৃতির উপলব্ধি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, অপর দুটি সাধনায় আয়ত্ত। এই তিনটি ধারা কি ভাবে একে একে আসিয়া কবির উপলব্ধির বিষয় হইতে লাগিল তারপরে কি ভাবে তিনে এক একে তিন হইয়া মিলিয়া মিশিয়া একবেণীরূপে প্রবাহিত হইল আর এই ত্রিবেণী সঙ্গমের তীরে তীরে কি ভাবে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির তীর্থকাব্যগুলি গড়িয়া উঠিল তাহা আমরা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহাই সব নয়। যুক্তবেণীর পরে আছে মুক্তবেণী। উত্তর ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছে, সেই মিলিত ধারা অনেকটা পথ অব্যাহত গতিতে চলবার পরে সমুদ্রের কাছে আসিয়া আবার বাঁধন আলগা করিয়া দিয়া বেণীমুক্ত পদে সমুদ্রসঙ্গমে ছুটিয়াছে। মানচিত্রের এই ছবি রবীন্দ্র-মানসচিত্রেরই যেন ছবি। রবীন্দ্র-বাণী একদা বেণী সংহার করিয়া কি যেন এক পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল এই ভাবে কাটিল, তারপর আবার আসিল

বেণী খুলিবার সময়। রবীন্দ্র-বাণীর বেণীবন্ধন ও বেণীমোচনের ইতিহাস যেমন মনোরম তেমনি গভীর জিজ্ঞাসার স্থল। প্রথম পরিচ্ছেদে বেণীবন্ধেনর ইতিহাস বলিয়াছি, এক্ষণে বেণীমোচন। বোধ করি দুয়ের মধ্যে শেষেরটাই গভীরতর জিজ্ঞাসার স্থল।

বনফুল কাব্য রচনার সময় হইতে রবীন্দ্র-বাণী ধীর মন্থরগতিতে, ক্ষীণ অপুষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। অনুরাগী ও সুহৃদ্‌বর্গের আশা-কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পুরোগামিগণের স্নেহ-ভরসা উদ্রিক্ত করিয়া, তীরে তীরে দেখা দিতে লাগিল কবিকাহিনী, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য, রাজর্ষি, বউঠাকুরানীর হাটের অর্ধ-রোমান্স; এ দিকে বয়স সাতাশে আসিয়া ঠেকে। কবি হঠাৎ সচেতন হইয়া আক্ষেপ করেন, বয়স সাতাশে ঠেকিল, তেমন কিছুই তো লেখা হইয়া উঠিল না।[১] কবির আক্ষেপ করিবার বিষয় বটে। সাতাশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে কি তাঁহার পরিচয় থাকিত, রবীন্দ্র-প্রতিভার যে বিপুল ফসল পরবর্তীকালে ফলিয়াছে তাহার সূচনাও দেখা দেয় নাই ঐ সব রচনায়, অমরত্বের কি দাবি তিনি করিতে পারিতেন। অথচ ঐ বয়সে অমরত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এমন কবি বিরল নন। শেলি ও কীট্‌স্ যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা নয়—অথচ সাতাশের দু বছর এদিকে, দু বছর ওদিকে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। তবে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই ধীর স্ফুরণের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, সম্ভাবনারূপে বিশাল প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জীবনের বাস্তব রূপের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে নাই। তরুণ গরুড় মহাশূন্যে বৃথা পাখা ঝাপটাইয়া মরিতেছিল, লোকপাল বিষ্ণু তখনও তাহার উপরে ভর করেন নাই। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮

পরিচয়, গায়ে গায়ে সংস্পর্শ, আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায় সংঘর্ষ ঘটিল শিলাইদহের জগতে, যখন নাকি কবি ও সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ মানুষ পরস্পরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এতদিন যে বিরাট প্রতিভা সম্ভাবনারূপে কুঁড়িতে আবদ্ধ ছিল জীবনের উষ্ণস্পর্শে তাহা একরাত্রে যেন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিল।[২] সাধারণ কার্যকারণের সূত্রে বা প্রতিভা বিবর্তনের নিয়মে প্রতিভার এই অকস্মাৎ মধ্যাহ্ন-দীপ্তির ব্যাখ্যা সম্ভবে না। অকস্মাতের মূলে আছে জীবনের আকস্মিক সংঘাত, অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ দুই উল্কাপিণ্ডের পরস্পরের সংঘর্ষে জ্বলিয়া ওঠা। শিলাইদহের জগতে কবি যে দশবৎসরকাল[৩] বাস করিয়াছিলেন কি প্রাচুর্যে, কি বৈচিত্র্যে, কি গুণগত উৎকর্ষে সেই সময়কার রবীন্দ্র-ফসলের তুলনা হয় না পরবর্তী আর-কোনো দশকের ফসলের সঙ্গে। নবজাগ্রত পূর্ণ-উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্র-প্রতিভার কোটালের বন্যা নিছক সাহিত্যগুণের যে উচ্চ সীমারেখাকে এই সময়ে স্পর্শ করিয়াছে, পরবর্তীকালে তাহাকে আর অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।[৪]

২ মানসী কাব্যেও আংশিক পরিণতি লক্ষিত হয়, তাহারও কারণ জীবনের উষ্ণস্পর্শ। কবির গাজিপুর-বাসের অভিজ্ঞতা ও তৎস্থানে লিখিত কবিতাগুলি

৩ ১৮৯১-১৯০১ সাল

৪ এই দশকের বিভিন্ন পর্যায়ের রচনার একটা মোটামুটি তালিকা আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে আশায় এখানে প্রদত্ত হইল—

কাব্য ॥ সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য, ক্ষণিকা, কণিকা

কাব্যনাট্য। চিত্রাঙ্গদা, কাহিনী, মালিনী

ছোটগল্প ॥ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত চুরাশিটি গল্পের চল্লিশটি

প্রহসন ॥ বৈকুণ্ঠের খাতা

গদ্য ॥ পঞ্চভূতের ডায়ারি, ছিন্নপত্রাবলী

কবি কলিকাতায় যে প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন আর শিলাইদহে যে মানুষের পরিচয় পাইলেন, দুয়ে সহজেই মিলাইয়া লইতে পারিলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতিও যেমন সরল অমিশ্র ও স্নিগ্ধ, বাংলাদেশের মানুষও তেমনি, জলের সহিত জল অনায়াসে মিলিয়া গেল। "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।" এ দেশে মানুষ ও প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা নাই, আছে সহৃদয় সহযোগিতা। এই সহযোগিতার ভাবটি কবির বড় ভালো লাগিল, এই সহযোগিতার ভিত্তির উপরে সোনার তরী চিত্রা চৈতালি কাব্য এবং গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি গড়িয়া উঠিল। সে ইতিহাস ও রহস্য বিশদভাবে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে, আর সেই সঙ্গে সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বটি কী অপ্রত্যাশিত রূপলাভ করিয়াছে তাহাও কথিত হইয়াছে।[৫] মানুষে প্রকৃতিতে মিলিত সুরে যখন কবির বীণা ধ্বনিত হইতেছিল সেই সময়ে নূতন একটি সুর গভীরতর একটি সম্ভাবনাকে বহিয়া দেখা দিল। চৈতালি কাব্যে প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত কবিতাগুলি যাহার সূচনা তাহারই বৃহৎ পরিণাম কল্পনা, কথা ও নৈবেদ্য কাব্যে।[৬] এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় কিছু আগে পরে লিখিত কাব্যনাট্যগুলি।[৭]

এইসব নাটকের মূল জিজ্ঞাসা, ধর্ম কি? ইহাও প্রাচীন ভারতে মানস ভ্রমণের এক পরিণাম। এক দিকে লৌকিক ধর্ম, যেমন কুলধর্ম রাজধর্ম ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতি; অন্য দিকে নিত্যধর্ম। সমস্ত কাব্যনাট্যগুলি ধর্মের এই দুই রূপের লীলাস্থল। এখানে দেখিতে পাই যে সীমা ও অসীম লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্মের রূপান্তর লাভ করিয়াছে। আর যেহেতু সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব হয় নাই, নিত্যধর্ম ও লৌকিকধর্মও অসমন্বিত রহিয়া গিয়াছে। সত্যই কি লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্ম অ-সমন্বয়যোগ্য? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ

---

৫ ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি দ্রষ্টব্য

৬ সে ভাষা ভুলিয়া গেছি দ্রষ্টব্য

৭ গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মালিনী

তাহাই মনে করেন আর সেইজন্যই নিত্যধর্ম মানুষকে দুঃখের অতিরিক্ত আর-কোনো প্রতিশ্রুতি দানে অসমর্থ। ধর্ম কি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গান্ধারী যে উত্তর দিতেছেন তাহা কবির মন্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।

ধৃতরাষ্ট্র। কি দিবে তোমারে ধর্ম?
গান্ধারী। দুঃখ নব নব।

আবার—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

দুঃখ ছাড়া আর-কিছু দানের সাধ্য যাহার নাই, তেমন ধর্ম লোকে স্বীকার করিবে কেন বুঝিতে পারা সহজ নয়। তবে কি সুখ ধার্মিকের জন্য নয়? তবে কি সুখ পরকালের ব্যাপার? এ ধর্ম পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের ধর্ম হইতে পারে, উপনিষদ-রসে পুষ্ট মনীষী ইহাকে ধর্ম বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবেন কেন? আসলে, সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব মেটে নাই বলিয়াই তাহাদের রূপান্তর লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্মের দ্বন্দ্বও অব্যাহত রহিয়াছে। দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্র আর যাহাই হোক সুখকর যে নয় তাহা তো সহজবোধ্য। আমার মনে হয় ধর্ম সম্বন্ধে তৎকালে কবির অসম্পূর্ণ ধারণার ইহাই মূলীভূত কারণ।[৮]

৮ তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব পূর্ণতর ও অনেক বাস্তবসম্মত।—

শিষ্য। আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন।

—অনুশীলন, প্রথম অধ্যায়

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ?

কবির মনের যখন এই-রকম অবস্থা তখন আবার নূতন পট-পরিবর্তন ঘটিল তাঁহার জীবনে। শিলাইদহের বাস তুলিয়া স্থায়ীভাবে তিনি জনপদবিরল, নিসর্গের বাহুল্যবিরল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে চলিয়া আসিলেন। এতদিনে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হইবার সুযোগ পাইল। ধর্ম কি, এই পূর্বসূত্রের জের টানিয়া ধর্মস্বরূপের সন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কিন্তু সে পথেও বাধা অল্প নহে। অনেকটা সময় অনেকখানি মনীষা গেল সেই সব বাধা অতিক্রম করিতে।[৯] সাধনার অন্তে যখন তিনি গীতাঞ্জলির আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন সামান্য কয়েকটি বছরের জন্য সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান হইল তাঁহার জীবনে।[১০] নিত্যধর্ম ও লৌকিকধর্মের যে অসমন্বয়ের কথা বলিয়াছি, যে অসমন্বয় হইতে খেয়া কাব্যে দুঃখবাদের সৃষ্টি,[১১] এতদিন পরে তাহারও অবসান ঘটিল। আমরা ১৯১১ সালে আসিয়া পড়িয়াছি, আবার পট উঠিবার সময় আসিল তাঁহার জীবনে। এবারে নূতন তীর্থে নূতন তীরে।

১৯১২ সালে কবি ইংলণ্ড যান আর ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি পর্যটন করিয়া সতেরো মাস পরে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশ তাঁহার যে কবি পরিচয় পাইল কেবল তাহাই নয়, তিনিও পাশ্চাত্যের যে পরিচয়টি পাইলেন আগে তাহা পান নাই।

গুরু। না তো কি ধর্মের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

—অনুশীলন, তৃতীয় অধ্যায়

৯ দ্রষ্টব্য পূর্বোল্লিখিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ', 'শান্তিনিকেতন'

১০ সীমার মাঝে অসীম তুমি দ্রষ্টব্য

১১ ঘরেও নহে পারেও নহে দ্রষ্টব্য

এই পরিচয়ের ফলটি তাঁহার মনের ও কবিপ্রতিভার উপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিল। এই পরিচয়ের মুখ্য ফল দুইটি; গত বিশ বৎসরের চেষ্টায় ও সাধনায় মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে যে একটি সমন্বয়ের ধারা কবির মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল; আর এই শিথিলতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার কল্পনাতে নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিল।

উনবিংশ শতকের মন, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি ধ্রুব সিদ্ধান্তে আসিয়াছিল, তাহাতে কোথাও সামান্য নড়চড় হইবার উপায় ছিল না। ইংলণ্ডের ইতিহাস ভিক্‌টোরীয় সাহিত্যে ও ভিক্‌টোরীয় সমাজ এই ধ্রুবত্বের বাসুকি-শীর্ষে বিধৃত হইয়া পরম নিশ্চিন্ত ছিল। এমন সময়ে ডারবিন ক্রমবিকাশতত্ত্বের বজ্রাঘাত করিলেন। হঠাৎ একদিন প্রভাতে মধ্যভিক্‌টোরীয় শিক্ষিতসমাজ আবিষ্কার করিল যে সমস্তই কেমন নড়বড় করিতেছে। কিন্তু এ আঘাতটাও যে নিদারুণ হয় নাই, তাহার কারণ ভিক্‌টোরীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখনো অটল ছিল। বুয়র সংগ্রামে সেই বনিয়াদে ফাটল দেখা দিল। তার পরে ঘটনার দশকুশি পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুততর হইয়া উঠিল, জাপানের নিকটে রাশিয়ার পরাজয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি। ভিক্‌টোরীয় যুগের পুত্রপৌত্রগণ সত্রাসে আবিষ্কার করিল বাসুকির শীর্ষ নয়, ঘটনার দোলায়মান শীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে নিক্ষিপ্ত পৃথিবী নিরন্তর সদ্যঃপাতিতার মুখে। আমাদের দেশও ধ্রুবত্ব হইতে অধ্রুবত্বে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তবে তাহার প্রকৃতি ও ক্রম ভিন্ন। ডারবিনের তত্ত্বে আমাদের মন বিচলিত হয় নাই, কেননা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন। তাহা ছাড়া জন্মান্তরে বিশ্বাসের ফলে একপ্রকার ক্রমবিকাশবাদ আমরা স্বীকার করিয়া লইতে অভ্যস্ত। আমাদের আঘাত আসিল অন্য দিক হইতে, যে দিক সম্বন্ধে আমরা সব চেয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কোম্পানির শাসন, ইংরাজি শিক্ষা ও সরকারী চাকুরি এই তিনকোণা পৃথিবী ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির।

আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই', আর এই কার্যকারণের মধ্যে যোগসূত্র জানিতাম 'যেমন-তেমন চাকরি ঘি-ভাত', আরও জানিতাম যে কোম্পানির চাকরি একবার হইলে যায় না, আর মাসের পয়লা তারিখে নগদ তঙ্কায় বেতন মেলে। ইহার চেয়ে আর অধিক ধ্রুব কি হইতে পারে। বড়ই নিশ্চিন্ত ছিলাম। তার পরে যখন মনে পড়ে যে সিপাহি বিদ্রোহের পর হইতে হিন্দু ছিল কোম্পানির সুয়োরানী তখন সুখের ষোলো কলা পূর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু জগতে এমন কোন্ চন্দ্র আছে যাহা হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের অতীত। কালক্রমে সুয়োরানীর পুত্রদের নখদন্ত বাহির হইল। বিস্মিত ও ভীত ইংরাজ সরকার মুসলমান-প্রশ্রয়ের নীতি গ্রহণ করিল। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিল বটে কিন্তু ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগিল না। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে অপসৃত হইল, সেই সঙ্গে অবসিত হইল বাঙালির সুখের দিন। এ ১৯১২ সালের কথা। ১৯১২ সাল কবির বিলাত যাত্রার সময় আগেই বলিয়াছি। ঘরের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিল তাহার অনেক চিহ্ন সমকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে, কিন্তু এবারে দীর্ঘকাল বহির্জগতে ভ্রমণ করিয়া যন্ত্রজীবী সভ্যতার যে বাস্তব নিষ্ঠুর ও আত্মঘাতী মূর্তি দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় এক দিকে যেমন বান ডাকিল কবির সাহিত্যপ্রেরণায়, তেমনি সে সাহিত্যে দেখা দিল নূতন অর্থ নূতন দৃষ্টি নূতন দিগন্ত।

কবির ত্রিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যপ্রেরণায় একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল, যখন শিলাইদহে আসিয়া মানবজীবনের সহিত তাঁহার প্রথম সংঘাত ঘটিল। এবারে বৃহত্তর মানবজীবনের সংঘাতে আর-একটা বিস্ফোরণ ঘটিল তাঁহার সাহিত্যপ্রেরণায় যাহার বাস্তব ফলের মূল্য অপরিসীম। পাদটীকায় প্রদত্ত তালিকা হইতে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।[১২] কবিজীবনের তৃতীয় দশকে

১২ কাব্য ॥ বলাকা, ১৯১৬; পলাতকা, ১৯১৮; শিশু ভোলানাথ ১৯২২

লিখিত সাহিত্য ধ্রুববিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত জীবনের রচনা। আর কবিজীবনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে লিখিত সাহিত্য, সত্যকথা বলিতে কি পঞ্চাশের পর হইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ অবধি লিখিত সাহিত্য, আংশিক নাড়া-খাওয়া বিশ্বাসের সৃষ্টি। ভিতরে ভিতরে অপ্রত্যাশিত নাড়া খাইয়া কবি আবিষ্কার করেন যে শিলাইদহের সরল পল্লীর মানুষগুলিই মানুষের একমাত্র রূপ নয়, এমন মানুষও আছে যন্ত্রের কৃপায় যাহার গায়ে বর্ম ও নখরে তীক্ষ্ণতা দেখা দিয়াছে; আবিষ্কার করেন যে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ভগবানের যে লীলার অবাধ আসর সমষ্টিজীবনের মধ্যে আর তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না; আর বিশ্বপ্রকৃতি! তাহার নখদন্ত হইতে রক্ত ঝরিয়া না পড়িলেও তাহার ছলনাও বড় সহজ নয়। সরল বিশ্বাসের সম্মুখে সে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। মোটের উপরে এই তাঁহার নাড়া-খাওয়া মনের চেহারা, আর কবিজীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরের রচনা এই নাড়া-খাওয়া মনের সৃষ্টি। এবারে নাড়া খাইবার বিবরণ ও ইতিহাসটি সবিশেষ দেখা যাক।

> আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে, যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারি যুগ। রেলগাড়ি বল, স্টিমার বল, হোটেল বল আর পাগলা গারদ দল, সমস্তই পিণ্ড-পাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। এখনকার সভ্যতা বলেছে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয়, সেই পিণ্ডই আমার

পূরবী, ১৯২৫। নাটক॥ ফাল্গুনী, ১৯১৬; মুক্তধারা, ১৯২২; নটীর পূজা, ১৯২৬; রক্তকরবী, ১৯২৬। গল্প ও উপন্যাস॥ গল্পসপ্তক, ১৯১৬; পয়লা নম্বর, ১৯২০; ঘরে বাইরে, ১৯১৬; চতুরঙ্গ, ১৯১৬; লিপিকা, ১৯২২। প্রবন্ধাদি॥ জাপান-যাত্রী, ১৯১৯; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৯১৭

এখানে প্রকাশের সাল প্রদত্ত হইল কিন্তু রচনার কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর আগে। যেমন বলাকা ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হইলেও তাহার প্রথমতম রচনাগুলি ১৯১৪ সালে লিখিত। ঐ সালটাই কবি-মনে দিক পরিবর্তনের সুনিশ্চিত সময়, যদিচ ছোটোখাটো লক্ষণ আরও দু-এক বছর আগেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। এইরকম সরকারি ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কী সাম্রাজ্যে কী সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠছে।[১৩]

এই নিষ্ঠুরতার বীভৎসতর রূপ একই রচনার আর-একটু পরেই আছে।—

> আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থরগমনে চলছে বলে যাত্রীরা দুঃখবোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য 'স্টোকার' দল নূতন ব্রতী, তারা পুরাদমে কাজ করতে পেরে উঠছে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরির প্রলোভন দিয়ে স্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন স্টোকার হাতার কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি এবং অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মারা গেল।[১৪]

সভ্যতার পিণ্ডগ্রাস বা হতভাগ্য স্টোকারের মৃত্যু যন্ত্রযুগের অপরিহার্য অঙ্গ কিন্তু কবির পক্ষে এসব যেন নূতন আবিষ্কার, মনটা অতর্কিতে নাড়া খায়। হয়তো এইরকম দু-চারিটা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে মন দু-একবার নড়িয়া উঠিয়া তাল সামলাইয়া লইত, এমন সময়ে আসিল কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার পর হইতে অভাবিতের ধাক্কা বাড়িয়াই চলিল, ফলে নড়িয়া-ওঠা মন আর পূর্বতন ভারসাম্য ফিরিয়া পাইল না।

> আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে—'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব'—বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

১৩, ১৪ বিচিত্র, পথের সঞ্চয়, প্রথম সংস্করণ। ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে লিখিত।

যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে, তখনই তো তার মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক—'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।' আজ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই, তার পশ্চাতে কি অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে! ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এইজন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর। কারণ যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ সে যদি বেদনা পেত, তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্যে মন এক-একসময় এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয় ; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা আছে।[১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়া উপরি-উক্ত রচনা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় মানুষের

১৫ "পাপের মার্জনা", শান্তিনিকেতন, ১৯১৪, ১৩২১ ভাদ্র

সমষ্টিচিন্তা। "মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।" এ এক নূতন উপলব্ধি কবিজীবনে। নীতি হিসাবে ব্যাপারটা তিনি যে না জানিতেন তাহা নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসাবে চোখের উপরে দেখিয়া প্রত্যয় সত্য হইয়া উঠিল। বলাকার অনেকগুলি কবিতা এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি।[১৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সংবাদের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাঁহার মনে, কিন্তু ঐ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই তাঁহার মনে যে পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবারে তাহার বিবরণ শোনা যাক।[১৭]

> ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। হিমালয় রামগড়ে আছি; মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম। খবর পাই নি, প্রমাণ পাই নি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়-কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলেছে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কবিতা একে একে এলো। বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েছে। তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে।
>
> তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এ দেশে আসে নি—আমার চার নম্বর কবিতা লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম। তবু কি এক

১৬ "সর্বনেশে", "আহ্বান", "শঙ্খ", "পাড়ি"; ১১, ১৬, ৩৭, ৪৫ সংখ্যক

১৭ ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্যপরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ

অব্যক্ত কারণে আমার মনের সেই বেদনা এই কবিতাগুলিতে বেরিয়ে এসেছে।

যুরোপের দারুণ যুদ্ধের খবর এলো। দারুণ প্রলয়ের সূচনা হল। যুদ্ধের শঙ্খ বাজল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সর্বজাতিকে সর্বনাশা মহামরণের যজ্ঞে যোগ দিতেই হল। মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধের পর তবু তো শান্তি ও স্বর্গারোহণ-পর্ব এসেছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আর তা হবার নয়। বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ মহাপ্রলয় আসছে, এখন কোথায় শান্তি, কোথায় স্বর্গ ?

তাঁর শঙ্খ রইল পড়ে। একদিন ইংলণ্ডে শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মনীষীর দল যে বিশ্বব্যাপী সাধনার কথা বলেছিলেন তা আজ কিপলিং প্রভৃতির সংকীর্ণ বাণীতে চাপা পড়ে গেছে। ভৌগোলিক ও জাতীয়তার দেবতার কাছে বহু নরবলি চাই। বড় আদর্শ যাঁদের, তাঁদের দুঃখ অপমান ও নির্যাতনের শেষ নেই। কিন্তু তাঁরাই তো ভবিষ্যৎ যুগ তৈরি করছেন। সেই-সব ভবিষ্যৎস্রষ্টার দল এখন যেন চাকভাঙা মৌমাছির দলের মতো নিরাশ্রয় ও পদে পদে অপমানিত। এই যুদ্ধের যোদ্ধাদের চেয়েও এঁরা অনেক বেশি আহত ও ব্যথিত। এঁরা বিধাতার সেই শঙ্খধ্বনি শুনেছেন, মানব-সংস্কৃতির নূতন চাক এঁরা বাঁধতে যাচ্ছেন। এই-সব সাধক নানা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছেন। রোল্যাঁ, বার্‌ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষীরা এই দলের লোক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এঁরা অপমানিত তিরস্কৃত অবরুদ্ধ। এঁদের পিছনে আরও কত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক রয়েছেন যাঁরা আজ ভবঘুরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবু তাঁরা বলছেন— 'ঐ যে প্রভাত আসছে, ঐ তো অরুণোদয় হয়ে এল।' পাখির মতো এঁরা কি জানি কেমন করে আগে হতে নবযুগের প্রভাতের খবর পেয়েছেন। ভোর না হতে ভোরের খবর তাঁদের কাছে এসেছে।

জগতে যুগে যুগে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে বিধাতার এই উদ্বোধন আসে। [সিলভ্যাঁ] লেভি সাহেব বলেন খ্রীস্টের হাজারখানেক কি হাজার দেড়েক বছর পূর্বে আর্যজাতির মধ্যে এই উদ্বোধন একবার এসেছিল। মিশর দেশেও এক সময়ে এই উদ্বোধন দেখা গিয়েছে।

এই দুঃখের দিনেও যদি সেই উদ্বোধন আজ এসে থাকে তবে তাকে প্রণাম করে বলতে হবে—

প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগসার।

মানবের এমন মহাযুগ এমন মহাক্ষণ আর আসে নি।

মন্থনে দুধ থেকে মাখন বেরিয়ে আলাদা হয়ে উঠে আসে। আজও দুঃখের মন্থনে জীর্ণ প্রাচীনতা হতে নবীনের সাধনা উঠে আসবে। সেই নবীনও যদি প্রাচীনের বন্ধনে জীর্ণতার মোহপাশে বদ্ধ হয়ে থাকে তবে জগতে কারা আনবে মুক্তি?

এই জগৎজোড়া সাগরমন্থনের মধ্যে শুধু বিষ দেখলেই চলবে না। এতে অমৃতও উঠেছে। কিন্তু অযোগ্য রাহু-কেতুরা সেই অমৃত দাবি করছে। এখনও প্রাচীন জীর্ণ লুব্ধের দল এই সুধারই ভাগ চায়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ য়ুরোপের লীগ অব নেশন্‌স্। য়ুরোপের সে-সব ঝানু বৃদ্ধ রাজনীতিওয়ালার দল পাকেপ্রকারে যুদ্ধটি বাধিয়ে দিলেন, তাঁরাই বেলজিয়ামের উপর অত্যাচারের কথা জোর গলায় ঘোষণা করে নবীনদের ডাক দিলেন যুদ্ধে নামবার জন্য। এদিকে এঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে অবাধে **poison gas**, বোমা ইত্যাদি তৈরি করেছেন ও নির্বিচারে তা চালাচ্ছেন, আবার মুখে ধর্মের দোহাই দিতেও এঁরা ছাড়ছেন না। কিন্তু এখন আর এই-সব কূটনীতি দিয়ে এঁরা থই পাচ্ছেন না।

এই-সব দারুণ নীচতা ও ভণ্ডামি কত কাল চলবে? এর মধ্যে শিব কি আর আসবেনই না? দেব দৈত্য দুইয়ে মিলে বিশ্বব্যাপী মন্থন কি চিরদিনই চলবে?

তা হতে পারে না। ভালো মন্দ নানা ফলই ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে। মন্থন হয়ে গেলে দেখা যাবে অন্তরে লুকানো সুধা ও বিষ দুই-ই উঠে এসেছে, মণিমাণিক্যের ঐশ্বর্য ও ভস্ম-করা প্রলয়ের আগুন দুই-ই দেখা দিয়েছে। য়ুরোপের ঝানু রাজনীতিওয়ালারা চান, সুবিধামতো জিনিসগুলি বিশেষ বিশেষ দেশের জন্য তুলে রেখে যুদ্ধের নামে যত দুর্গতি তা সারা জগতে যত নিঃসহায় নিরুপায়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু উদার বিশ্বব্যাপী বিধাতার বিধানে এই

ছলচাতুরী কতকাল চলবে? ঝুনো ঝুনো রাজনীতিওয়ালার দল সাম্রাজ্যবাদীর দল চান যে এই মন্থনে বাসুকির লেজের দিকটা সুবিধামতো তাঁরা ধরে থাকবেন আর যত সুবিধার অমৃতটুকু আদায় করে নেবেন। আর হতভাগাদের দিতে চান বাসুকির মুখের দিকটা, যেন তারা মন্থনের বিষেই পুড়ে মরে যায়, অমৃতের ভাগ তারা যেন আর না পায়। যুদ্ধে মরবে হতভাগার দল, কিন্তু তার ঐশ্বর্য পাবে ঐ সব ঝুনোদের দল! ধর্মের যা অধিকার, পাপ এসে চায় তা কেড়ে নিতে। সেবার দৈত্যদের দেবতারা ঠকিয়েছিলেন, এবারে যেন দৈত্যরাই সকলকে ঠকাতে এসেছেন!

১৯১৮ সালে এই মহাযুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু দুঃখের দুর্গতির তো শেষ হল না। দেশে দেশে দুর্গত নিপীড়িতদের দারুণ বেদনা রাজনীতিওয়ালা ঝুনোদের বহু চেষ্টাতেও চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। সেই বেদনা ক্রমাগত আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল।

হঠাৎ বিশেষ কোনো-একদিনের কোনো-এক উত্তেজনার বশে আমার বলাকা লেখা নয়। তা হলে এর মূল্য হয়তো অনেক কম হত। বলাকার ব্যাকুল কবিতাগুলি এক বৈশাখে (১৫ বৈশাখ ১৩২১) আরম্ভ হল, মাঝে এক বৈশাখ গেল, তার পরের বৈশাখে তা শেষ হল। অর্থাৎ দুটি বছর লাগল তা শেষ হতে। এক হিসাবে বলাকার আরম্ভে ও শেষে মিল আছে। এর আরম্ভ ও অবসান দুইই বৈশাখের নবারম্ভের জ্বলন্ত গতিতে। গানের যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে তার অবসান, এই ধ্রুবযোগ রয়েছে বলেই ধুয়ার ধ্রুবত্ব। দেবপরিক্রমা করতে হলেও যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে প্রদক্ষিণ শেষ করতে হয়। বলাকায় যেন একটি প্রদক্ষিণ পুরো সমাপ্ত হয়েছে। অগ্নিময় আরম্ভের সমাপ্তিও অগ্নিতে।

বলাকা-রচনাকালীন মনোভাব কবিকর্তৃক ১৯২১ সালে বিবৃত হইলেও ইহাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন অভিজ্ঞতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই অভিজ্ঞতার টুকরা রূপ তাঁহার রচনায় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে কিন্তু এমন উজ্জ্বল আয়ত রূপ আর কোথাও নাই বলিয়া এখানে সবিস্তারে উদ্ধৃত হইল। এই মনোভাবটি

বলাকা কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতায় সুব্যক্ত হইয়াছে—

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত
এ আমার এ তোমার পাপ।

কাজেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও সকলকে মিলিয়া করিতে হইবে।

মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতকের মন যে উচ্চ-ধারণাকে পোষণ করিতেছিল, ধ্রুব বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথেরও সেই মন, সেই মহত্ত্ব ও ধ্রুবত্ব এবারে ভাঙিয়া পড়িবার মুখে। ইহার পরে ১৯১৬ সালে কবি জাপানে যাত্রা করিলেন। পৃথিবীর বাণিজ্যের ঘাটে ঘাটে বাণিজ্যিক সভ্যতার যে বিকট ও বীভৎস রূপ তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল তাহাতে এহেন সভ্যতার স্রষ্টা মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি রকম পীড়িত হইতে লাগিল, নিম্নে সংগৃহীত অংশগুলি হইতে সহজে ও সাকুল্যে বুঝিতে পারা যাইবে।

এক সময়ে কবি হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের সমর্থন করিয়াছিলেন, এখন জাহাজের কামরার মধ্যে সেই বর্ণাশ্রমধর্মাশ্রয়ী হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন মানবসমাজের আমদরবারে হিন্দু কি অসহায়, কি কৃপার পাত্র।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনোমতে আখ চিবিয়ে চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে—বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতিসহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই—যেখানে বসে খাচ্ছে তার নেহাৎ কাছে ছিবড়ে ফেলছে। এমনি করে চারিদিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই; সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ, বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত করে তুললে

বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।...

...আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতটুকু, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে; কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই...।[১৮]

এবারে উদ্ধৃত অংশগুলির বিস্তার কিছু বেশি। ইচ্ছা করিলেই বিস্তার কমানো যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে কবির কলমে কবির মনোভাব জানিবার অসুবিধা ঘটিত। বাণিজ্যশায়ী সভ্যতার ধারক বাহক মানুষের উপরে উনবিংশ শতকের মনের অবস্থা সহজে বিচলিত হইতে চাহে না কিন্তু অবিচলিত থাকাও কঠিন, প্রমাণগুলা সবই প্রতিকূল। কবির বক্তব্য এই যে বাণিজ্য বিস্তারে সংসার যে কেবল বীভৎস হইয়া উঠিতেছে তাহাই নয়, এই বীভৎসা মানুষের অন্তর্লোকের প্রতিবিম্ব।

আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লী বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে

১৮ জাপান-যাত্রী

[illegible]ালে পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। এক দিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর-এক দিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত ক'রে অধিকার করে নি। কিন্তু তার পরে বাণিজ্যসভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারি দিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে, দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।' তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিক থেকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কলবাহন বাণিজ্য যেখানে গেছে, সেখানেই আপনার

কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটি লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানির আর অন্ত নেই। তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে লোকালয় পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, প্রচ্ছন্ন করে।…

…সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি। সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেই রকম; এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে, এবং লোহার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানবজন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ংকর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে,

তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্য এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের এই প্রথম যুগের দানবজন্তুগুলো টিকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য অমিতাচারকে অধিকদিন সইতে পারে না; তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্যদানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসবে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদরা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম ছাড়া বেশি নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে; তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম

আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্মপ্রণালী সহজ—মানুষের হৃদয়কে সৌন্দর্যবোধকে ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে, সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয়; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড় নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী; আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এবং মানবহৃদয়ের বিরুদ্ধে—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।···

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনোদিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা

ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দদান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য এবং টাকার আয়তন এবং শক্তি এতই বেশি বড় হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠছে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।...

কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধে আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে—এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।[১৯]

উদ্ধৃতি দ্বারা পুঁথি বাড়াইবার আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

১৯ জাপান-যাত্রী

জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কবি প্রাচ্য- ও প্রতীচ্য-খণ্ডের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন আর সর্বত্রই "বিষয়বিষবিকারজীর্ণ" মানুষের অধঃপতন দেখিয়া যুগপৎ শঙ্কিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। শেষ বয়সে লিখিত যাবতীয় ভ্রমণকাহিনী একাধারে মানুষের অধোগতির ও তজ্জনিত কবির দুঃখের বিবরণে পূর্ণ।[২০]

শুধু দেশভ্রমণ নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার রশ্মির সন্ধানে তিনি নানা রাষ্ট্রে গমন করিয়াছেন। আশার ছলনাতেই তিনি মুসোলিনির ইটালিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সম্বিৎ পাইয়া বুঝিলেন আশার ছলনাময়ী বিশেষণ মিথ্যা নয়। এককালে পরাধীন ভারতের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় কবিও বিশ্বাস করিতেন যে এশিয়ার মুখপাত্ররূপে জাপান পৃথিবীর সাম্রাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রগুলিকে সংযত ও সাবধান করিবে। কিন্তু সে আশা ভঙ্গ হইতেও বিলম্ব হইল না। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণে কবি বুঝিলেন, জাপানও আপাতলাভের পন্থাটাই বাছিয়া লইল। সোভিয়েট রাশিয়া মানুষের মুক্তির কর্ণধার হইতে চলিয়াছে, এই আশা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে রাশিয়ায়। কিন্তু অল্পদিন পরেই বলশেভিজমের অন্তর্নিহিত স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারিলেন।[২১]

আশা দুর্মর। শেষকালে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় আচরণ

২০ যাত্রী, ১৩৫৩ সংস্করণ : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি পৃ. ৮৮-৯৬, ১০৬-১০৭; জাভাযাত্রীর পত্র পৃ. ১৭৮-১৭৯, ১৮৬-১৮৮। পারস্যে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, ১৩৫৩ সং, পৃ. ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৫৫।

কিন্তু ইহাই সব নয়। কালান্তর গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধে কবির উত্তেজিত মনোভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে—

লড়াইয়ের মূল, ১৩২১ (১৯১৫); ছোটো ও বড়ো, ১৩২৪ (১৯১৭); স্বাধিকারপ্রমত্ত, ১৩২৪ (১৯১৮); বাতায়নিকের পত্র, ১৩২৬ (১৯১৯); শূদ্রধর্ম, ১৩৩২ (১৯২৫); কালান্তর, ১৩৪০ (১৯৩৩)।

২১ চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ. ১৭৯-১৮০

সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিতে হইল—"ফিনল্যাণ্ড হল চূর্ণ সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

শেষ ভরসা ছিল ইংরাজ, জাতি হিসাবে যাহাকে তিনি সব চেয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু সেই শেষ ভরসাও উজাড় করিয়া দিয়াছেন সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে—

> জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

মানুষ সম্বন্ধে এতটুকু আশাভরসা মনে রাখেন নাই, যদিচ তার পরেই বলিয়া উঠিয়াছেন—

> কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।

এ কি সত্যই বিশ্বাসের বাণী না অন্ধকারে পথ-হারানো মানুষের 'পথ হারাই নি' আত্মস্তোক বাক্য! যে ভাবেই লওয়া যাক, কবি যে বিশ্বাসের প্রত্যন্তে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীর্ণ জীবনমঞ্চের যেখানেই তিনি ভর দিতে চেষ্টা করেন, মাচা মড়্ মড়্ করিয়া ওঠে। কিন্তু ইহাও সব নয়। আরো আছে।

মানুষের আচরণ দেখিয়া বিধাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলে অন্যায় বলা যায় না। যাঁহারা নিছক জড়বাদী তাঁহাদের দায়িত্ব সরল, ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে জড় কার্যকারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা খালাস। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাসী তাঁহারা এত সহজে দায়মুক্ত হইবেন কিরূপে? এই ভগবদ্‌বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তের হৃদয়কেই ভগবৎ-লীলার একমাত্র আসর মনে করেন, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার পদক্ষেপ স্বীকার করেন না বা পদক্ষেপ সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহাদের কর্তব্যও সহজ। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে ভক্ত ও ভগবানের খেলাঘরেই আবদ্ধ রাখেন না, মনে করেন যে বৃহৎ ইতিহাসের উত্থানপতনেও তাঁহারই লীলা তরঙ্গিত,

কবিবর্ণিত সর্বজনীন বীভৎসা ও ব্যভিচারের মধ্যে কি ভাবে ভগবদভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। কার্যকারণের সূত্রে মিলাইয়া ব্যাখ্যা আর যখন সম্ভবে না তখন অস্তিত্বের গভীর কন্দর হইতে অসহায় প্রশ্ন ধ্বনিত হইতে থাকে—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো ?

খুব সম্ভব প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত, না তুমি তাহাদের ভালোবাস নাই। কিংবা এই নৈতিক ব্যভিচারকে বজ্রকণ্ঠে ধিক্কৃত করিবার শক্তির প্রার্থনা জাগে কবির মনে।[২২]

অবশেষে হাতে হাতে প্রতিকার যখন মেলে না তখন—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

কিন্তু এ-সব তো ব্যাখ্যা নয়, বিশ্বাস নয়, ভগবদভিপ্রায়কে স্বীকার নয়—এ সব নৈরাশ্যের যুক্তি, অন্ধকারে উদ্‌ভ্রান্ত শিশুর লক্ষ্যহীন হাত পা-ছোঁড়া। এখানেই শেষ নয়। মানুষের আচরণের ফলে ভগবানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কবির মনে একটা বিক্ষোভের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে সত্য হইলেও কখনো কখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যেও ভগবদভিপ্রায় সম্বন্ধে কবির মনে বিক্ষোভের, বিদ্রোহের, অশান্তির ভাব।

ওর [কবির একমাত্র দৌহিত্রের] একটি ডায়ারি পেয়েছি, অতি অল্প কিছুই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতে

২২ ১৭ সংখ্যক কবিতা, প্রান্তিক

ও যে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[২৩]

আবার আছে--

মৃত্যুকেই আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়—একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই।[২৪]

আরো আছে—

বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে স্থরেন পেরে উঠবে না। এত কষ্টও পাচ্চে। নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে এ কথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপরে।[২৫]

বিশ্ববিধানের উপরে বিদ্রোহী হইয়া ওঠা এবং বিশ্ববিধানের উপরে ধিক্কারের ভাব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। তবু ইহা সত্য। এমন যে সম্ভব হইল তাহার কারণ বৃহৎ ইতিহাসের মাতালের উন্মত্ত আচরণ ও স্খলিতপদ গতি দেখিতে দেখিতে ভগবানে বিশ্বাস না হারাইয়াও ভগবদ্‌বিধানের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে অটলতা সম্বন্ধে কবির যেন সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যেন ধারণা হইয়াছিল মাতালের পা টলিতেছে না, টলিতেছে বিশ্ববিধানটাই।

এতক্ষণ ধরিয়া তথ্যপ্রমাণাদিযোগে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে গীতাঞ্জলির সমকালে মানব, প্রকৃতি ও ভগবৎ-সত্তার ত্রিধারায় যে মিলন ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে তাহা ব্যাহত ও শিথিল হইয়া আলাদা হইয়া গেল। 'মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ' কথাটা যতই উচ্চস্বরে বলুন না কেন বেশ বুঝিতে পারা যায় আগের সে ধ্রুব বিশ্বাস আর নাই। আবার মানুষের উপরে বিশ্বাস শিথিল

২৩ চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, পত্রসংখ্যা ১১১

২৪ চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, পত্রসংখ্যা ১১৪

২৫ চিঠিপত্র ২, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ ১২২

হইবার ফলেই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস না হারাইয়াও তাঁহার সর্বশুভময়তা সম্বন্ধে কেমন যেন সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। আগের মতো দুয়ের মধ্যে আর তেমন প্রেমের সহযোগিতা নাই, এখন কতকটা যেন প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব; আগে তিনে এক হইয়া যে ধারাকে সুপুষ্টভাবে বহিতে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা তিনে তিন, কবির মানসলোকের মানচিত্রখানা বহুস্রোতে বিভক্ত। কেবল আগের প্রেম ও বিশ্বাস অটুট আছে বিশ্বপ্রকৃতির উপরে। তাহাও শেষ পর্যন্ত থাকিবে কি না যথাসময় দেখা যাইবে। এখন পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রজীবনের এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলে তাঁহার শেষ বয়সের কাব্যের রস গ্রহণে অসুবিধা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রবাহে কয়েকটি কূটস্থান আছে, যেগুলি না বুঝিলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাহার বিবর্তন অনুধাবন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কালানুক্রমিক তাহাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, (কবির মতে) "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" রচনার অভিজ্ঞতা; তার পরে শিলাইদহ অঞ্চলে বাস্তব জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়; কিছুকাল পরেই "প্রাচীন ভারতে" মানস ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন; আর সর্বশেষে "বলাকা" কাব্য রচনার অব্যবহিত পূর্বে, সময়ে ও পরে বৃহৎ জগতের অন্তর্গত আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। জীবদেহের পক্ষে যেমন গ্ল্যাণ্ডগুলি, রবীন্দ্রসাহিত্যের পক্ষে তেমনি এই কূটস্থানসমূহ। রবীন্দ্রসাহিত্যের রহস্য ইহাদের মর্মে নিহিত।

শেষোক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ও পরে সীমা ও অসীমের সমন্বয় বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে কবির জীবনে, এ কথা আগে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিশ্লেষের পরে সীমা ও অসীমের ব্যবধান বাড়িতে বাড়িতে এমন দুস্তর হইয়া পড়িয়াছে যে 'শান্তিপারাবারের' নিকটে আসিয়া আর দুই স্থল একসঙ্গে চোখে পড়ে না। শেষ ত্রিশ বছরের কাব্যে সীমাও আছে অসীমও আছে কিন্তু আগের মতো আর একত্র

নাই, সীমার গুণও আছে অসীমের গুণও আছে কিন্তু আর সমন্বিত হইয়া নাই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি এক, রসের ক্ষেত্রে তিনি অনেক—এই ভাবেই আছেন, কিন্তু আগের মতো আর 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' হইয়া নাই। এই দ্বিধা রবীন্দ্রসাহিত্যে তত্ত্বগত মূল্য কমাইয়াছে কি না জানি না, তবে নিশ্চয় জানি এই দ্বিধাভাবের আলো-আঁধারের আনাগোনায় ইহার রসগত মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। মহুয়া কাব্যে 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে সতেরোটি কবিতা আছে, নারী-রূপের সতেরোটি দিগদর্শন।[২৬] কোথাও পড়িয়াছিলাম লেখক এই কবিতাগুচ্ছকে নারীর বিশ্বরূপ দর্শন বলিয়াছেন। তখন কথাটা ভালো লাগিয়াছিল। পরে ভাবিয়া দেখিলাম কাব্য হিসাবে ইহাদের যে মূল্যই হোক নারীর বিশ্বরূপ দর্শনরূপে অর্থাৎ ইহার তত্ত্বমূল্য নিতান্ত সীমাবদ্ধ। নাম্নী কাব্যের সতেরো জনই তরুণী, সুন্দরী, বিরহ-বিভ্রম-বিলাসে চতুরা মুখরা। সুন্দর। কিন্তু ইহাই কি আদ্যাশক্তির সাকুল্য রূপ?[২৭] সীমার জগতে বীভৎস আছে কুশ্রী আছে, নিষ্ঠুর আছে, নিদারুণ আছে, ক্যালিবান আছে, ঘটোৎকচ আছে। আবার মহাকবির হাতে পড়িলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য করুণা মহত্ত্ব, আত্মনিবেদনের সংকল্প। এগুলি স্থূল বস্তুজগতের গুণ নয়, বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব, তৎসত্ত্বেও ইহারা বস্তুর অর্থাৎ সীমার অতীত। রবীন্দ্রনাথ যে বীভৎস কুশ্রী নিষ্ঠুর নিদারুণ প্রভৃতির মধ্যে সৌন্দর্য মহত্ত্ব করুণা প্রভৃতি গুণ উদ্ধার করিতে অক্ষম

২৬ শ্যামলী, কাজলী, হেঁয়ালী, খেয়ালী, কাকলী, পিয়ালী, দিয়ালী, নাগরী, সাগরী, জয়তী, ঝামরী, মূরতী, মালিনী, করুণা, প্রতিমা, নন্দিনী, উষসী।

২৭ যিনি দশমহাবিদ্যার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তিনি সুমহতী কবিকল্পনার অধিকারী। এই দশ জনের মনের মধ্যে যেমন ষোড়শী ও কমলা আছেন, তেমনি ধূমাবতী ও ছিন্নমস্তাও আছেন। আদ্যাশক্তির তত্ত্বমূল্যবিচারে দশমহাবিদ্যা-পরিকল্পনা পূর্ণ, নাম্নী নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

তাহার কারণ একই সঙ্গে এ দুটি, সীমা ও অসীম, তাঁহার ধারণার অতীত। ব্যাস বাল্মীকি শেক্সপীয়র দান্তে হোমার প্রভৃতি কবিতে এ গুণ সুপ্রচুর ও সহজাত।

কালিদাসের মতোই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে সুন্দর করুণ কোমল ললিতগুণাবলীর পক্ষপাতী। এই কারণেই লক্ষ্মী কাব্যে নারীর সাকুল্যরূপ স্থান পায় নাই, ধূমাবতী ছিন্নমস্তা প্রভৃতিতে আদ্যাশক্তির যে রূপের প্রকাশ রবীন্দ্র-কল্পনা তাহার পক্ষপাতী নয়, হয়তো বা এ সব ধারণাই করিতে পারে না।

আরো দুটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা ও ছবি। গদ্যকবিতা সম্বন্ধে আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।[২৮] বনস্পতি বটবৃক্ষ ঝুরি নামাইয়া দেয় মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্র-বনস্পতি গদ্যকবিতা ও ছবি রূপ ঝুরি নামাইয়া দিয়াছে সীমার জগৎকে, প্রত্যহের জগৎকে স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে হয় না। গদ্যকবিতার ঝুরি মৃত্তিকার অতিশয় কাছে নামিয়াও মাটি স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেশ-ব্যবধানে দোদুল্যমান হইয়া আছে। আর ছবিতে তিনি মৌলিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যহের জগৎকে পার হইয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি মগ্নচৈতন্যের রহস্য উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। গদ্যকবিতা সীমার জগৎকে স্পর্শ করে নাই, ছবি সীমার জগৎকে গ্রাহ্য করে নাই, ফলে সীমার জগৎ যেমন ছিল তেমনি আছে, তাহার পরম রহস্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিঃশেষে ধরা পড়ে নাই। তাঁহার ছবি সম্বন্ধে এক সময়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধার করিয়া দিলেই আমার বক্তব্য প্রকাশ পাইবে।

কবির রহস্যলোক অবরোহণের তিনটি ধাপ বর্তমান—গদ্যকবিতা, চিত্র ও শেষ বয়সে লিখিত কয়েকটি গল্প; সবগুলিই তাঁর শেষ বয়সের কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই

২৮ ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা

যে, প্রথম বয়সের রচনাগুলি পর্বে পর্বে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে, আর শেষ বয়সের রচনাগুলি, তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথম বয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলিতে বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে তাহাই, ইহাকে বলিতে পারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্যে উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অবচেতনার গহ্বরে নামিতেও তেমনি অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অননুপ্রেরিতের পক্ষে দুই-ই দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকর হইয়াছে— উচ্চেতনমুখী প্রথম দিকে, আর অবচেতনমুখী শেষ দিকে। শেষোক্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস বর্তমান তাঁহার গদ্যকবিতায়, চিত্রাবলীতে এবং তিন সঙ্গী জাতীয় গল্পে।

তবে সবগুলিতেই অনুপ্রেরণার তেজ সমান প্রবল নহে, গদ্যকবিতায় অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহার দ্বিধা যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই; চিত্রে ল্যাবরেটরি গল্পে প্রবল, তখন সে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্রিলোকদর্শীও বটেন। চেতন উচ্চেতন ও অবচেতন তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গদ্যকবিতায় যে-জাতীয় বিষয়বস্তু তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে তাহা নাই, এমন-কি ছোট গল্পেও বিরল। অভিজ্ঞতার নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের উদ্দেশ্যেই কবিতার গদ্যময় রূপটি তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। "কিনু গোয়ালার গলি" নামে পরিচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক অমিল আছে। তাঁহার পরিচিত সংসারের একান্তে দুর্ভাগ্যের যে আঁস্তাকুড় বর্তমান, সেখানে তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন—

অবচেতন লোকে নামিবার গুহাদ্বারটা যে ঐ আঁস্তাকুড়ের নিকটেই। কিন্তু পূর্বতন সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিবার ফলে সেখানে একবার মাত্র পা ফেলিয়াই তিনি আবার উচ্চেতনলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই কবিতাটির সমাপ্তি তাহার সূত্রপাতকে সমর্থন করে না। এটা যেন উচ্চেতন ও অবচেতন লোকের সীমান্ত।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবচেতন-লোকের বার্তাবাহী। ছবিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনা করিলেও খুবসম্ভব একটা ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যাইবে—কিন্তু মোটের উপরে ইহাদের অবচেতন-বার্তাবাহিতা নিঃসংশয়। রবীন্দ্রচিত্রে নরনারীর স্বাভাবিক রূপ বিরল, যাহা আছে তাহাও যেন গুপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে বিকৃত। স্বাভাবিক গাছপালার চিত্র অল্প হইলেও মানবমূর্তির চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সংখ্যাগৌরবে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ারের রূপ সুপ্রচুর। কিন্তু বোধ করি সংখ্যায় সব চেয়ে অধিক এমন সব জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদ, যাহাদের অনুরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহারা কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়—তাহারা নিছক রূপ। শিল্প-বিচারে Imitation Theory বলিয়া একটা পথ আছে, Imitation বস্তুসাপেক্ষ, তাহা বস্তু-আশ্রয়ী সত্য, কিন্তু এই ছবিগুলির মূলে কোনো বস্তুভিত্তি না থাকায় ইহা কোনো-কিছুর Imitation নয়, কোনো-কিছুর সত্য নয়, ইহা নিছক সত্য। এ যেন এমন কতকগুলি বস্তু যাহাদের ছায়া পড়ে না। কোনো-কিছুর সঙ্গে তুলনা করিবার উপায় না থাকাতে ইহাদের অবাস্তব মনে হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু বস্তু ও তাহার ছায়ার মধ্যে ছায়াটাই কি অধিকতর বাস্তব? ছায়াটাই তো অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। ছায়া লইয়া যাহাদের কারবার, সেই অবাস্তববিলাসীদের জন্যে প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিকে' একটু স্থানও রাখেন নাই। গুরুর এই একদেশদর্শিতার প্রতিবাদেই যেন অ্যারিস্টটলকে Imitation Theory খাড়া করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল।

শিল্পবিচারের Imitation Theory বা Criticism of Life Theory, কোনো থিয়োরিই অবচেতন লোকের শিল্পবিচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত থিয়োরির অনুসারেও বিচারের জন্য একটা অনুরূপ আবশ্যক। এই অনুরূপকেই ম্যাথ্যু আর্নল্ড moral ideas বলিয়াছেন। তাঁহার মতে application of ideas to life দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব প্রমাণ হয়—আর application of ideas to life বলিতে দুটা বস্তু বোঝায়, idea ও life। কিন্তু বস্তু যেখানে দুটা নয়, মাত্র একটা, সেখানে Criticism of Life থিয়োরি সম্পূর্ণ অচল। কারণ এ-সব ছবিতে life ও idea দুটা নাই, মাত্র ideaটাই আছে এবং সে ideaটাও অবচেতন লোকের idea (খুব সম্ভব যেখানে idea ও reality অভিন্ন), যেখানে সাহিত্য ও শিল্প-বিচারের মাপকাঠি অচল। রবীন্দ্রনাথের ছবি এমন এক জগৎ যাহার মাপকাঠি ও কম্পাস এখনও অনাবিষ্কৃত। এখানকার নদী নদীমাত্র, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিবার উপায় নাই ; এখানকার জন্তু-জানোয়ার রূপ মাত্র, তাহার অধিক নয় ; এখানকার স্বল্পসংখ্যক নরনারীও নিছক রূপ, অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইহা নিছক রূপময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জাগতিক রূপ হইতে অরূপ লোকে উত্থিত হইয়াছেন—ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ পরিচয়। জাগতিক রূপে ও অরূপে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার ছবির জগতে কেবল রূপটাই আছে, কোনো অরূপলোকের সঙ্গে তাহাকে equate করা সম্বন্ধযুক্ত করা সম্ভব নহে। ইহা কি তাঁহার প্রতিভার ঐকান্তিক অরূপসাধনার nemesis ?[২৯]

এবারে আমরা কবিজীবনের শেষ দশকে আসিয়া পড়িয়াছি। এই দশকের দুটি প্রধান ঘটনা ১৯৩৭ সাল এবং ১৯৪০ সালের কঠিন পীড়া। এই কঠিন পীড়া ও পীড়াসম্ভূত অভিজ্ঞতা কয়েকখানি কাব্যে

২৯ সোহিনী, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থ

পরিণত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহাদের আলোচনাও হইয়াছে।[৩০] কিন্তু এই উপলক্ষে একটা বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের, বিশেষ শেষ দশকের কোনো কোনো কবিতার সাক্ষ্যে অনেকে বলিতে শুরু করিয়াছেন যে কবি শেষ জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মচিন্তার সূত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ আরো অগ্রসর হইয়া গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে তিনি নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় অভিযোগটি আদৌ সত্য নহে। তবে যে আদৌ এমন কথা উঠিয়াছে তাহার কারণ, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি তিনখানি কাব্যের পরে প্রত্যক্ষ ভগবদ্‌বিষয়ক গানের স্বল্পতা, বক্তাগণের একদেশদর্শন, আর কোনো কোনো কবিতার ভুল অর্থ গ্রহণ।

গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে কবির মুখ্যতঃ ভক্তের সহিত ভগবানের লীলার সম্বন্ধ; আর সে লীলার আসর ভক্তের হৃদয়। ব্যক্তিগত উপলব্ধিবলে কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তার পরে যখন তিনি বৃহৎ ইতিহাসের সম্মুখীন হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে পূর্বতন সিদ্ধান্ত অচলপ্রায়। ব্যক্তি ও ভগবান সম্বন্ধে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হইলেও সাধারণভাবে মানবসমাজ সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করা চলে না। তখন প্রশ্ন ওঠে সমষ্টিবদ্ধ মানবসমাজের সঙ্গে ভগবানের সিম্বন্ধটা কি? অর্থাৎ ভগবৎ-অভিপ্রায় ইতিহাসের মধ্যে কি ভাবে প্রকাশিত হইতেছে? এই যে অনাচার অত্যাচার, বীভৎসা, নিষ্ঠুরতা ক্রমে স্ফীততর হইয়া উঠিতেছে—ইহার সহিত ভগবৎ-অভিপ্রায়ের কি সম্পর্ক? যাহারা ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শয়তানে বিশ্বাস করে তাহাদের কাজ অনেক সরল; এ সব শয়তানের কীর্তি বলিলেই চলে। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে সে পথটা বন্ধ। অথচ ব্যাখ্যার একটা পথেরও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছর,

৩০ মৃত্যুদূত এসেছিল তব সভা হতে, মধুময় পৃথিবীর ধূলি ও আমি পৃথিবীর কবি (?) দ্রষ্টব্য

বিশেষ ভাবে শেষ দশক এই পথটা সন্ধান করিয়া মরিয়াছেন। ভগবানে অবিশ্বাস হইলে ভগব-অভিপ্রায়ের সন্ধান নিশ্চয় তিনি করিতেন না। তাঁহার সমস্যা দ্বিমুখী—এক দিকে ভগবানে বিশ্বাস, অপর দিকে ইতিহাসের ঘটনার উত্থান পতনের মধ্যে ভগবৎ-অভিপ্রায় আবিষ্কারে ব্যর্থতা। এই পর্বে প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতার স্বল্পতার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ সন্ধান তিনি করেন নাই, করিবার প্রয়োজন ছিল না; পরোক্ষ ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন। আমার নিজের ধারণা সমষ্টিবদ্ধ মানুষের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রায় কি ভাবে ব্যক্ত হইতেছে, এ বিষয়ে কবি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই এই অনিশ্চয়তার পীড়া তাঁহার সমকালীন কাব্যের মধ্যে তৃণদলে শিশিরকণার মতো ছড়াইয়া আছে কিংবা এই শিশিরকণার রস শোষণ করিয়াই শেষ জীবনের অনেক কবিতার সৃষ্টি। এ এমন একটা রস যাহা পঞ্চাশ-পূর্ব কাব্যে নাই বলিলেও চলে। শেষ জীবনের কাব্যের এ এক অভিনব সম্পদ্। অনেকে বিষয়টি বোঝেন নাই বলিয়া নিরীশ্বরবাদিতার অভিযোগ আনিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্‌টা। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের নয়, ইতিহাসের প্রত্যেক ক্রান্তিপাতকে ভগবৎ-অভিপ্রায়ের সহিত সমন্বিত করিবার প্রয়াস ভগবৎ-সত্তায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না থাকিলে কখনোই সম্ভব হইত না। ইহার উপরে আছে কোনো কোনো কবিতার ভুল ব্যাখ্যা, বিশেষ কবিজীবনের অন্ত্যম কবিতাটির।[৩১] এ কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিয়াছি।[৩২]

আগে বলিয়াছি যে মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ধ্রুব ধারণা বিচলিত হইয়া গিয়াছে; মানুষের আচরণে ভগবানের মঙ্গলকরতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগিয়াছে; এক ধ্রুব ছিল বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বাস। এই

৩১ "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি", শেষ লেখা, র-র, ২৬ খণ্ড

৩২ আমি পৃথিবীর কবি? দ্রষ্টব্য

কবিতাটিতে সেই বিশ্বাসেও যেন ফাটল ধরিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি সরাসরি অবিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যকে ঐশ্বর্যকে ছলনা ও মায়ার ফাঁদ বলিয়াছেন। কবিতাটির এই অর্থ গৃহীত হইলে একটি কবিতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। বিশ্বপ্রকৃতি সংক্রান্ত তাঁহার সারা জীবনের ধারণা কি কবি শেষ মুহূর্তে পরিত্যাগ করিলেন? যে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল ভগবৎ-উপলব্ধির সহায়, ভগবদ্‌বিভূতিতে মণ্ডিত, অবশেষে সে-ই কি "ছলনাময়ী" প্রতিপন্ন হইল? ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? এই অর্থের সম্ভাবনা কতদূর গড়ায়? জগৎকে অস্বীকার না করিয়াও জাগতিক ব্যাপারকে অস্বীকার করা কি? চিন্তার ক্ষেত্রে যিনি অদ্বৈতবাদী, রসের ক্ষেত্রে যিনি দ্বৈতবাদী, এইভাবে জগৎকে আংশিক অস্বীকার করিয়া শেষ মুহূর্তে কি তিনি দুয়ের ব্যর্থ সমন্বয়ের চেষ্টা পরিহার করিয়া অদ্বৈতের দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গেলেন? সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস সারা জীবন করিবার পর জীবনমৃত্যুর চৌকাঠের উপরে যখন তিনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন, তখনই কি সীমার ছিলার সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অসীমের ধনুর্দণ্ড সতেজে আপন বিজয় ঘোষণা করিল? প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবানের ত্রিধারার মধ্যে যে ব্যবধান ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল অতলে আত্মসমর্পণ করিবার আগে সেই শিথিলপ্রায় যুক্তবেণী অকস্মাৎ খুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ মুক্তবেণী রূপে অকূলে উধাও হইয়া গেল? অন্তরের গভীরে যে অদ্বৈতের আকাঙ্ক্ষা কবি পোষণ করিতেছিলেন, শেষ মুহূর্তের হাত বাড়ানোতে তাহা কি করায়ত্ত হইল? এ সব গভীর ও গুহানিহিত প্রশ্নের উত্তর দানের সাধ্য আমার নাই। তাই প্রাসঙ্গিক সংশয় জাগাইয়া দিয়া এই আলোচনার শেষ করিলাম।

২৪. ১১. ৬১

২৭

পা, টী=পাদটীকা

গ্রন্থনামের ডাইনে সংখ্যা=কবিতা সংখ্যা অথবা খণ্ড-নির্দেশক